মহিউদ্দিন আহমদ

জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি

জাসদের উত্থান পতন
অস্থির সময়ের রাজনীতি

মহিউদ্দিন আহমদ

জাসদের উত্থান পতন: অস্থির সময়ের রাজনীতি

উৎসর্গ

সেই সব জানা-অজানা সাহসী তরুণের উদ্দেশে,
যাঁরা মানুষের মুক্তির জন্য বুঝে কিংবা
না-বুঝে লড়াই করেছেন এবং
জীবন দিয়েছেন অকাতরে

সূচিপত্র

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা	৯
ভূমিকা	১০
পটভূমি	১৫
উত্থান	৬১
বিস্তার	৯২
রূপান্তর	১২০
বিদ্রোহ	১৪৪
অভ্যুত্থান	১৬৮
বিপ্লব	১৮৫
পুনরুত্থান	২২৯
ভাঙন	২৪৩
শেষ কথা	২৬৪
পরিশিষ্ট ১ : স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের প্রচারপত্র : জয় বাংলা	২৬৯
পরিশিষ্ট ২ : ইশতেহার নম্বর এক : জয় বাংলা	২৭৩
পরিশিষ্ট ৩ : সাধারণ নির্বাচন ১৯৭৩	২৭৬
পরিশিষ্ট ৪ : বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার ১২ দফা দাবি	২৭৭
পরিশিষ্ট ৫ : রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ১৫ নভেম্বর ১৯৮১	২৭৮
পরিশিষ্ট ৬ : জাসদের ইতিহাস : পটভূমি, বিকাশ ও ভাঙন	২৭৯
পরিশিষ্ট ৭ : জাসদের বিবর্তন	২৮১
বিভিন্ন সময়ে যাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা হয়েছে	২৮২
গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র	২৮৬

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম সংস্করণের কপি দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়ায় দুই সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে হয়েছিল। ওই অল্প সময়ের মধ্যে কিছু ভুল শনাক্ত করা গিয়েছিল, পাঠকেরাও এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছিলেন।

গত দুই মাসে বইটি অনেক পাঠকের কাছে পৌঁছেছে এবং তাঁরা আরও কিছু ভুল আমার নজরে এনেছেন। এ জন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। বর্তমান সংস্করণে এই ত্রুটিগুলো সংশোধনের চেষ্টা করেছি।

মহিউদ্দিন আহমদ
৮ জানুয়ারি ২০১৫

ভূমিকা

ষাট ও সত্তরের দশকে বাংলাদেশ ছিল রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে টালমাটাল। আমরা অনেকেই এই অস্থির সময়কে দেখেছি, এর নানান কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছি। আমাদের আছে অনেক অর্জন, অনেক ব্যর্থতা; অনেক আনন্দ, অনেক বেদনার স্মৃতি। আমরা এই সময়টাকে ধরে রাখতে চাই, দেখতে চাই নির্মোহ দৃষ্টিতে। আমরা চাই এই সময়ের বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা।

আমার লেখার প্রধান বিষয় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)। ১৯৭২ সালে এই দলটির জন্ম হলেও এর একটা পূর্ব-ইতিহাস আছে। জাসদকে বুঝতে হলে এর পটভূমি জানা দরকার। প্রয়োজন ইতিহাসের মোড়ক উন্মোচনের। ইতিহাস কোনো 'ঠাকুরমার ঝুলি' নয়। বরং এটা হয়ে উঠতে পারে একটা 'প্যানডোরার বাক্স'। এর ডালা খুললে এমন সব সত্য বেরিয়ে আসে, যার মুখোমুখি হতে চাই না আমরা অনেকেই। কেননা, সত্যটা জানাজানি হয়ে গেলে আমাদের অনেকের বর্তমানটা নড়বড়ে হয়ে যেতে পারে। ইতিহাসচর্চার এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ, গুম হয়ে যাওয়া সত্যকে খুঁজে বের করে আনা। কাজটা অত্যন্ত পরিশ্রমের এবং অনেক ক্ষেত্রেই ঝুঁকির।

একাত্তরে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের একটা গৌরবোজ্জ্বল উত্থানপর্ব আছে। তার অনিবার্য ধারাবাহিকতায় আমরা একটা সশস্ত্র প্রতিরোধপর্বের সূচনা দেখতে পাই একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে। এই পর্বের সমাপ্তি ঘটে ১৬ ডিসেম্বর দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। কিন্তু যখন আমরা মুক্তিযুদ্ধের কথা বলি, সে যুদ্ধ তো ১৬ ডিসেম্বরে শেষ হয়ে যায়নি? দেশের মুক্তি হয়েছে, মানুষের মুক্তি হয়নি।

মানুষের মুক্তি, বিশেষ করে তার ইহজাগতিক সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, উন্নতি, প্রবৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য নানাজনের নানা মত, নানা পথ। মত ও পথ অনুযায়ী মানুষ জোটবদ্ধ হয়। তারা সংগঠন গড়ে তোলে। মানুষের এই যূথবদ্ধ প্রয়াসের এক আধুনিক রূপ হলো রাজনৈতিক দল।

রাজনৈতিক দলগুলো আবর্তিত হয় কোনো-না-কোনো মতাদর্শকে ঘিরে। আমাদের দেশে দলগুলো নানা কারণে ব্যক্তিকে মতাদর্শের ওপরে জায়গা দিয়ে একধরনের পীরবাদের জন্ম দিয়েছে। এখানে দলের নেতা ঈশ্বরের সমতুল্য, কিংবা তার চেয়েও বেশি। কেননা, তিনি দৃশ্যমান। এই মনস্তত্ত্ব থেকেই তৈরি হয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি, রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা পায় ব্যক্তির কাল্ট, তিনি যেন হয়ে ওঠেন সব ক্ষমতার উৎস। রাজনীতির এরকম পরিণতি থেকে ইতিহাসকে আলাদা করা কঠিন। এখানে ইতিহাস সময় কিংবা ঘটনাকেন্দ্রিক না হয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়। যেমন আমরা বলি মুজিব আমল, জিয়ার আমল, এরশাদের আমল ইত্যাদি।

আমাদের দেশের ইতিহাসচর্চার একটা বড় সমস্যা হলো নির্মোহ হয়ে উঠতে না-পারা। যে ঘটনাগুলো আমাদের জীবনকালে ঘটেছে এবং আমরা অনেকেই যেসব ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে গেছি বা আছি, সে ঘটনাগুলোকে ঘিরে আমরা একধরনের আবেগ অনুভব করি। এই আবেগের সঙ্গে জড়ানো আছে ভালোবাসা অথবা ঘৃণা। ফলে আমরা যখন কিছু বলি বা লিখি, তখন অনেক সময় ভালোবাসা বা ঘৃণা দ্বারা তাড়িত হই।

আমাদের দেশে ইতিহাস লেখার আরেকটা বড় সমস্যা হলো পর্যাপ্ত সূত্রের অভাব। আমাদের মনে রাখতে হবে, দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটা মোড় পরিবর্তন হয়েছিল ষাটের দশকে। ওই সময় এবং তার পরের অনেক প্রক্রিয়া ও ঘটনার কোনো দালিলিক প্রমাণ নেই। কেননা, সে আন্দোলন সব সময় প্রকাশ্য ছিল না। গোপন প্রক্রিয়ার দালিলিক প্রমাণ সব সময় থাকে না। নিরাপত্তার কারণেই তা রাখা সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে ইতিহাসচর্চার অন্যতম প্রধান সূত্র হচ্ছে ওই সময়ের কুশীলবদের মুখ থেকে শোনা কথা, 'ওরাল হিস্ট্রি' বা কথ্য ইতিহাস। সেখানেও সমস্যা আছে। অনেকেই নিজেকে মনে করেন অপরিহার্য ও অভ্রান্ত। অন্যদের মনে করেন ভ্রান্ত, বিভ্রান্ত অথবা ষড়যন্ত্রকারী। ফলে তাঁদের কথা শুনে যাঁরা লেখেন, তাঁদের লেখা একপেশে হয়ে যায়, যদি না তাঁরা ওই সময়টা বোঝার জন্য সময়ের অন্য চরিত্রগুলোর সঙ্গেও কথাবার্তা বলেন।

আমাদের দেশে অনেকে ইতিহাসের চর্চা করেন গবেষণার জন্য। গবেষকদের মধ্যে একটা সাধারণ ফর্মুলা গ্রহণের ঝোঁক থাকে। প্রথমে একটা প্রস্তাবনা বা হাইপোথিসিস ঠিক করে সেটা প্রমাণের জন্য তাঁরা তাঁদের তথ্য-উপাত্ত সাজান। যদিও হয়তো ওই প্রস্তাবনাটাই সঠিক নয়।

'ওরাল হিস্ট্রির' জন্য মূল সূত্র খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। সবাই সবটা জানেন না। যাঁরা জানেন, তাঁরা বলতে চান না। যাঁরা বলেন, তাঁরাও অনেক সময় নির্মোহভাবে বলেন না। আবার অনেকের যুক্তি, 'এ কথা বলার সময় এখনো হয়নি।'

আমার একটা সুবিধা ছিল, বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার রাজনীতিকদের মধ্যে অনেককেই আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম। সত্তরের দশকের গোড়ায় আমি এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে পড়ি। ওই সময় দলের বেশির ভাগ প্রচারপত্র ও পুস্তিকার খসড়া

তৈরি করার দায়িত্ব পালন করতেন রায়হান ফেরদৌস মধু। বাহাত্তরের মাঝামাঝি তরুণ সাংবাদিকদের জন্য আয়োজিত একটা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিতে তিনি বুদাপেস্ট চলে যান। তখন লেখালেখির দায়িত্ব পড়ে মূলত আমার ওপর। ছাত্রলীগ ও বিএলএফের (মুজিব বাহিনী) সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা থাকার কারণে আমি অনেক কিছু ভেতর থেকে দেখেছি, যা বাইরে থেকে একজন গবেষকের পক্ষে জানা অতটা সহজ নয়। সে সময় আমি জাসদ পরিচালিত দৈনিক *গণকণ্ঠ* পত্রিকার সঙ্গেও সংযুক্ত ছিলাম এবং ওই সময়ের রাজনীতির দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণের একটা সুযোগ আমার হয়েছিল। আমি তখন দলের ভেতরে 'বুলবুল' নামে পরিচিত ছিলাম। এই লেখা তৈরি করার সময় আমি অনেক সূত্র ব্যবহার করলেও এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আমি নিজেও অনেক ঘটনা ও প্রক্রিয়ার সাক্ষী।

স্বল্প পরিসরে ওই সময়ের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তুলে ধরা সম্ভব নয়। অনেক ঘটনাই আমার জানার কথা নয় এবং আমি সেসব বিষয়ে মন্তব্য করা থেকে সচেতনভাবে বিরত থাকতে চেষ্টা করেছি। আমার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, আমি যেটুকু জানি বা অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছি, তা অন্যদের জানানো। সবাই তো সবটা জানেন না। এই বিষয়টা নিয়ে হয়তো আরও অনেকেই লিখবেন। আর এভাবেই ইতিহাস রচনার উপাদান সংগৃহীত হতে থাকবে ভবিষ্যতের গবেষকদের জন্য।

আগেই বলেছি, ইতিহাস লেখা ও পড়ার একটা বড় চ্যালেঞ্জ হলো নির্মোহ হওয়া। লেখক ও পাঠক উভয়কেই নির্মোহ হতে হবে। বদ্ধমূল ধারণা কিংবা রাজনৈতিক মতলব থেকে কেউ যদি লেখেন, সেটা ইতিহাস হবে না। আবার পাঠকেরও তাঁর পূর্বধারণাকে এক পাশে সরিয়ে অজানা তথ্য গ্রহণ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

ষাটের দশকে স্বাধীনতার দুটো উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। এগুলো ছিল মূলধারার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে, অথচ গুরুত্বপূর্ণ। একটি হচ্ছে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ', অন্যটি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র'। বাহাত্তর সালে দৃশ্যপটে আসে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)। ১৯৮২-৮৩ সালের দিকে আমি এ বিষয়ে কিছু লেখালেখির উদ্যোগ নিই। এ নিয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ১৯৮৩ সালের অক্টোবরে আমি ছাত্রলীগের একসময়ের দপ্তর সম্পাদক রেজাউল হক মুশতাককে নিয়ে আওয়ামী লীগের নেতা আবদুর রাজ্জাকের ধানমন্ডির বাসায় যাই। কথাবার্তা বলার সুবিধে হবে, এই ভেবে আমরা তাঁকে নিয়ে মুশতাকের ভূতের গলির বাসায় যাই। আমি আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে চার-পাঁচ ঘণ্টা আলাপ করি। ষাটের দশকের ইতিহাসের একটা অনুদ্ঘাটিত পর্ব আমার সামনে উন্মোচিত হয়। আমি ওই তথ্যগুলো সিরাজুল আলম খান, আ স ম আবদুর রব, মনিরুল ইসলাম ও কাজী আরেফ আহমেদের সঙ্গে যাচাই করে নিই।

পরে আমি 'আনফার্লিং দ্য রেড ফ্ল্যাগ' নামে বড় একটা লেখা তৈরি করি। তখন সেনাপতি এরশাদের জমানা। দেশে নাগরিক অধিকারের ছিটেফোঁটাও নেই।

ইউরোপের উন্নয়ন ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর একটা নেটওয়ার্ক 'বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন গ্রুপ' তখন বেশ সক্রিয়। এই গ্রুপের মধ্যে ছিলেন বার্নার্ড কারভিন (ফরাসি সংস্থা ব্রাদার্স টু অল মেন—বাম ইন্টারন্যাশনাল-এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি), ড্যানিয়েল অ্যাসপ্লান্ড (ঢাকায় সুইডিশ উন্নয়ন সহযোগিতা সংস্থার প্রধান কর্মকর্তা), পিটার মারেস (নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের প্রথম সচিব), ড্যান জোনস (ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক), এন্ড্রু জেনকিনস (উন্নয়ন পরামর্শক ও একসময় ব্র্যাকের স্বেচ্ছাসেবক), ইয়ান ভ্যানডারল্যান (পানিসম্পদ বিশেষজ্ঞ ও পরবর্তী সময়ে নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের প্রথম সচিব) ও তাঁর স্ত্রী ইয়োকা ভ্যানডারল্যান প্রমুখ। ১৯৮৩ সালের দিকে তাঁরা যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে ঢাকার ধানমন্ডিতে 'নিজেরা করি'র অফিস ব্যবহার করতেন। এ ব্যাপারে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'নিজেরা করি'র সমন্বয়কারী খুশী কবিরের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ওই সময় আমি এঁদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হই। পরবর্তী সময়ে ধানমন্ডিতে 'গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার' অফিসে এই যোগাযোগ অব্যাহত থাকে এবং এর ফলে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ঢাকা-১ চ্যাপ্টারের সূচনা হয়। আমি ১৯৮৪ সালের আগস্টে আমস্টার্ডামভিত্তিক সংগঠন এভার্ট ভারমিয়ার স্টিখটিংয়ের কাছে 'আনফার্লিং দ্য রেড ফ্ল্যাগ'-এর পাণ্ডুলিপি পাঠাই। সংগঠনটি মিমিওগ্রাফ আকারে এটি প্রকাশ ও বিতরণ করে। লন্ডনের জেড বুকস-এর সম্পাদক রবার্ট মলটেনের সঙ্গে পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে চিঠি চালাচালিও হয়েছিল। তবে এটি লিখে আমি খুশি হতে পারিনি, স্বচ্ছন্দ বোধ করিনি। লেখাটি সংক্ষিপ্ত আকারে *র‍্যাডিকেল পলিটিক্স ইন বাংলাদেশ* নামে ১৯৮৪ সালে গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার থেকে প্রকাশিত হয়। অনেক পরে সে লেখাটি পরিমার্জিত হয়ে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত *বাংলাপিডিয়ার* ইংরেজি ও বাংলা সংস্করণে যথাক্রমে 'র‍্যাডিকেল পলিটিকস' ও 'বাম রাজনীতি' শিরোনামে স্থান পায়। তার পরও বিভিন্ন সময় আমি বিভিন্নজনের সঙ্গে কথা বলেছি, শোনা কথাগুলো যাচাই করে নেওয়ার প্রয়াস পেয়েছি। যদিও এই প্রয়াস পরবর্তী সময়ে অব্যাহত রাখতে পারিনি।

তবে মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধপরবর্তী অস্থির সময়টি নিয়ে আমি বিভিন্ন সময় বিচ্ছিন্নভাবে লেখা অব্যাহত রেখেছিলাম। অনেক বছর আগে ১৫ আগস্ট দৈনিক *সংবাদ*-এ আমার ঢাকা কলেজের সতীর্থ শেখ কামালকে নিয়ে লিখেছিলাম 'একজন কামালের গল্প'। *যুগান্তর*-এ দুই কিস্তিতে লিখেছিলাম 'মুজিবনামা'। গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার আমার স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থ *এই দেশে একদিন যুদ্ধ হয়েছিল* প্রকাশ করেছিল ২০০৬ সালে। কিন্তু জাসদ নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ বই লিখতে না পারার অতৃপ্তি থেকেই গিয়েছিল।

সম্প্রতি *প্রথম আলোর* সম্পাদক মতিউর রহমানের বিশেষ অনুরোধে আমি জাসদকে নিয়ে আমার অসমাপ্ত কাজটি সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিই। পাণ্ডুলিপির প্রাথমিক খসড়ার ওপর তাঁর পরামর্শ ও মন্তব্য লেখাটি চূড়ান্ত করতে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

ইতিহাস যে পদ্ধতিতে লেখা হয়, তা অনেকটাই প্রাণহীন ও একঘেয়ে। ইতিহাসের মূল উপাদান হলো মানুষ। আমাদের দেশে ইতিহাস রচনায় প্রথাগত পদ্ধতিতে সাধারণত তারকাখ্যাতিসম্পন্ন নেতাদের কথাই বলা হয়। মাঠপর্যায়ে যাঁরা ইতিহাস তৈরি করেন, তাঁরা থাকেন অনুল্লেখিত। তাঁরা বেশির ভাগ সময় ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবেই ব্যবহৃত হন। আমি চেয়েছি তৃণমূলের সেসব সাহসী তরুণকে যতটুকু সম্ভব পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসতে। অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমি দেখেছি, তাঁদের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন তাঁদের নেতাদের চেয়ে অনেকটাই আলাদা, অনেক বেশি মানবিক এবং সত্যের কাছাকাছি।

লেখাটি তৈরি করতে গিয়ে অনেকের কাছ থেকে সমর্থন ও সাহায্য পেয়েছি। আমি প্রথাগত সাক্ষাৎকার নিইনি। যাঁদের আমি চিনি, তাঁদের সঙ্গে দিনের পর দিন আলাপ করে জানার ও বোঝার চেষ্টা করেছি। তাঁদের অকৃপণ সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের নামের একটা তালিকা গ্রন্থের শেষে দেওয়া আছে। কেউ কেউ অতিরঞ্জিত কিংবা ভুল তথ্য দিয়ে আমাকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিলেন। প্রয়াত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি একটি ইংরেজি প্রবাদ ব্যবহার করে বলেছিলেন, 'ভিক্টরি হ্যাজ এ থাউজেন্ড ফাদার্স, বাট ডিফিট ইজ এন অরফেন।' পরাজিতের মানসিকতা ও এক ধরনের অপরাধবোধ থেকে দায়দায়িত্ব অস্বীকার করার প্রবণতা দেখা যায় অনেক রাজনৈতিক নেতার মধ্যে। তাঁরা জেনেশুনে তথ্য গোপন করেন, ভুল তথ্য দেন, অথবা তথ্য দিলেও নাম প্রকাশ করার ব্যাপারে তাঁদের প্রবল আপত্তি। তাঁদের কারও কারও অবলীলায় মিথ্যা কথা বলার পারঙ্গমতা দেখে বিস্মিত হতে হয়। আমাকে তাই অনেক সতর্কতার সঙ্গে তথ্য যাচাই-বাছাই করতে হয়েছে। এই বইয়ে ব্যবহৃত ছবিগুলো বিভিন্ন পত্রিকা, ব্যক্তিগত সংগ্রহ এবং ফেসবুক থেকে নেওয়া।

করপোরাল আবদুল মজিদ, সুমন মাহমুদ, আবু করিম, বাদল খান, খায়রুজ্জামান বাবুল, রেজাউল হক মুশতাক, স্বপন দাশগুপ্ত, আঞ্জুমান আরা বীথি, আকা ফজলুল হক ও মুন্সী ফারুক আহমেদ পুরোনো প্রচারপত্র, ছবি ইত্যাদি জোগান দিয়ে লেখাটি তথ্যবহুল করতে যথাসাধ্য সহায়তা করেছেন। এ ছাড়া কবি সোহরাব হাসান, বজলুল করিম আকন্দ, অধ্যাপক নেহাল করিম, তানিয়া বুলবুল, মো. সাখাওয়াত হোসেন, অধ্যাপক আহসানুল হাবিব, মুহাম্মদ লুৎফুল হক, খন্দকার সাখাওয়াত আলী, মো. কামাল উদ্দিন প্রমুখ আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। প্রথমা প্রকাশনের জাফর আহমদ রাশেদ পাণ্ডুলিপি গোছানো ও ছাপানোর কাজটির তত্ত্বাবধান করেছেন। আমি তাঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

মহিউদ্দিন আহমদ
mohi2005@gmail.com

পটভূমি

পাকিস্তান সম্পর্কে একটা কথা বলা হয়, জাতিবিহীন জাতীয়তাবাদ। ধর্ম ও আঞ্চলিকতার মিশেল দিয়ে ভারতের উত্তর, পশ্চিম ও পুবের মুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলো নিয়ে পাকিস্তান তৈরি হলো। কিন্তু পাকিস্তানি জাতি তৈরি করা গেল না। শুরু থেকেই এটা ছিল এক রাষ্ট্রের ভেতরে দুটো দেশ। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন ও চুয়ান্নর নির্বাচন পাকিস্তানি রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদের কফিনে রীতিমতো পেরেক ঠুকে দিল।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পূর্ব বাংলার রাজনীতি প্রধানত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এর সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটে ছয় দফার মধ্য দিয়ে। ছয় দফা বেশ নাটকীয়ভাবেই রাজনীতিতে চলে আসে এবং ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দেয়।

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের ১৭ দিনের যুদ্ধ রাজনীতির চালচিত্র অনেকটা বদলে দেয়। যুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে একটা জাতীয় সম্মেলন ডাকা হয়। তাতে আইয়ুববিরোধী প্রায় সব রাজনৈতিক দলকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়। সিদ্ধান্ত হয়, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি হিসেবে দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান লাহোর সম্মেলনে যাবেন। লাহোরে কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন, তার একটা বিষয়সূচি বা 'টকিং পয়েন্ট' মুসাবিদা করার জন্য শেখ মুজিব দুজন বাঙালি সিএসপি কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। শেখ মুজিব তাঁদের সঙ্গে আগে থেকেই যোগাযোগ রাখতেন। তাঁরা হলেন রুহুল কুদ্দুস ও আহমেদ ফজলুর রহমান। রুহুল কুদ্দুস সাত দফা কর্মসূচির একটা খসড়া তৈরি করে দেন। পরে পূর্ব পাকিস্তান

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদের সহযোগিতায় এটা পরিমার্জন করে ছয় দফায় আনা হয়।[১]

শেখ মুজিব তাজউদ্দীনকে নিয়ে লাহোর গেলেন। সম্মেলনের সাবজেক্ট কমিটির এক সভায় শেখ মুজিব আলোচ্যসূচিতে ছয় দফা অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। কমিটিতে পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের প্রাধান্য ছিল। তাঁরা ঘোরতর আপত্তি তুললে শেখ মুজিব সভা থেকে ওয়াকআউট করেন।[২]

শেখ মুজিবের সামনে তখনো একটা বড় বাধা ছিল আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটি। তিনি কমিটির সভা ডাকলেন ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে তাঁর বাড়িতে। সভা হলো ১৯৬৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। উপস্থিত অনেক সদস্যই ছয় দফা সমর্থন করতে রাজি ছিলেন না। সভাকক্ষের বাইরে ছাত্রলীগের একসময়ের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল আলম খান দলবল নিয়ে ঘোরাফেরা করছিলেন। সবার হাতেই চেলা কাঠ। কয়েকজন ভয়ে সভাস্থল ছেড়ে চলে গেলেন। যাঁরা রয়ে গেলেন, তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে ছয় দফার পক্ষে হাত তুললেন। ছয় দফা আওয়ামী লীগের কর্মসূচি হলো।[৩]

১৯৬৬ সালের ১৮-১৯ মার্চ ঢাকার হোটেল ইডেন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হলো আওয়ামী লীগের কাউন্সিল মিটিং। এই কাউন্সিল শেখ মুজিবকে সভাপতি ও তাজউদ্দীন আহমদকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করে।[৪] দলে শেখ মুজিবের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু হয় আওয়ামী লীগের নবযাত্রা।

আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে ছয় দফা গৃহীত হওয়ার পর থেকেই সরকার শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে নানা রকমের মামলা দিয়ে হয়রানি করতে থাকে। অবশেষে মে মাসের ৮ তারিখ 'পাকিস্তান দেশ রক্ষা আইনে' শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়। কয়েক দিনের ব্যবধানে আওয়ামী লীগের প্রায় সব প্রধান নেতাকে পুলিশ আটক করে কারাগারে নিয়ে যায়।

আওয়ামী লীগ যখন নেতৃত্বশূন্য, তখন দলের হাল ধরেন প্রথমে মিজানুর রহমান চৌধুরী ও পরে দ্বিতীয় সারির নেতা আমেনা বেগম। তিনি প্রায় একা পুরানা পল্টনে আওয়ামী লীগের অফিস পাহারা দিয়ে রাখতেন। তিনি দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তখন সিরাজুল আলম খান আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নেন। দলের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব না থাকা সত্ত্বেও তাঁর ওপরই প্রকারান্তরে দলের কর্মকাণ্ড সমন্বয়ের ভার পড়ে। সিরাজুল আলম খান ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের

অনেক প্রেস বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তু ঠিক করে দিতেন। ছাত্রলীগের নেতৃত্বের শীর্ষস্থান নিয়ে সে সময় উপদলীয় কোন্দল থাকলেও ছাত্রলীগের বেশির ভাগ কর্মী সিরাজুল আলম খানের অন্ধভক্ত ছিল।[৫]

১৯৬৮ সালের ১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসের ভেতরে 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য' শিরোনামে একটা মামলার বিচার শুরু হয়। মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়, 'আসামি'রা ভারতের দেওয়া অস্ত্র ও অর্থের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং ভারতের স্বীকৃতি নিয়ে একটি স্বাধীন সরকার গঠনের ষড়যন্ত্র করেছিলেন। এটা গণমাধ্যমে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হিসেবে পরিচিতি পায়। মামলায় শেখ মুজিবকে প্রধান আসামি করা হয়।

নভেম্বরে সারা দেশে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে গণ-আন্দোলন নতুন মাত্রা পায়। এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে। অনেকগুলো ছাত্রসংগঠনকে একই কর্মসূচির আওতায় এনে একসঙ্গে কাজ করার প্রক্রিয়াটি শুরু করা সহজ ছিল না। এ সময় সিরাজুল আলম খানের পরামর্শে ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুর রউফ ছাত্র ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলেন। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে ছয় দফার সঙ্গে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অন্যান্য দাবি জুড়ে দিয়ে ১১ দফার রূপরেখা তৈরি করা হয়।[৬] ১১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে সারা বাংলায় ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে গণ-আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং গণ-অভ্যুত্থানের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি গণ-আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান ঘোষণা করলেন, তিনি পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়াবেন না। পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি এক ঘোষণায় আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে সব অভিযুক্তকে মুক্তি দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে অন্য রাজবন্দীদেরও ছেড়ে দেওয়া হয়।

সিরাজুল আলম খান এ সময় রাজনীতিতে শেখ মুজিবের কাল্ট প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে শেখ মুজিবের জন্য আলাদা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। শেখ মুজিবের তখন আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবকে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাতে প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। শেখ মুজিব ছাড়া কারামুক্ত অন্য নেতাদের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ

থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি পল্টন ময়দানে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাঁদের অনেকেই বছরের পর বছর কারাবন্দী ছিলেন।

১৯৭২ সালের মে মাসে ছাত্রলীগ দুই টুকরা হয়ে যায়। একটি অংশের কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বাহাত্তরের ২১, ২২ ও ২৩ জুলাই পল্টন ময়দানে। দ্বিতীয় দিন সকালে সংগঠনের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ। প্রতিবেদনের এক স্থানে উল্লেখ করা হয়, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে ছাত্রলীগের ভেতর একটা নিউক্লিয়াস কাজ করছিল ১৯৬২ সাল থেকেই।' ছাত্রলীগের ভেতরে স্বাধীনতার কথা খোলামেলাভাবে আলোচনা হতো ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনের পর থেকেই। কিন্তু 'নিউক্লিয়াস' শব্দটি বাহাত্তর সালের আগে ছাত্রলীগের কোনো রাজনৈতিক সাহিত্যে উল্লেখ করা হয়নি। এই নিউক্লিয়াস গড়ে উঠেছিল যাঁদের নিয়ে, তাঁদের কেন্দ্রে ছিলেন সিরাজুল আলম খান।

সিরাজুল আলম খান ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে ভর্তি হন। তিনি ফজলুল হক হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী ছাত্রসংগঠন ছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

১৯৬২ সালে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনকে সভাপতি ও শেখ ফজলুল হক মনিকে সাধারণ সম্পাদক করে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। সিরাজুল আলম খান সহসম্পাদক নির্বাচিত হন। শেখ মনি অধিকাংশ সময় আত্মগোপনে থাকতেন অথবা গ্রেপ্তার হয়ে যেতেন। সংগঠনের দায়িত্ব তখন সিরাজুল আলম খানকেই নিতে হতো। ১৯৬৩ সালে ছাত্রলীগের কাউন্সিল অধিবেশনে উপদলীয় কোন্দল স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সভাপতি পদে কে এম ওবায়দুর রহমানের মনোনয়ন মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যায়। সাধারণ সম্পাদক পদে শাহ মোয়াজ্জেমের পছন্দের লোক ছিলেন সিরাজুল আলম খান। অন্যদিকে শেখ মনির সমর্থন ছিল ফেরদৌস আহমেদ কোরেশীর প্রতি। শেখ মনি ছিলেন শেখ মুজিবের বোনের ছেলে। তিনি একজন পরিশ্রমী ছাত্রনেতা ছিলেন বটে, তবে মুজিব পরিবারের সদস্য হওয়ার সুবাদে তাঁর একটা অতিরিক্ত সুবিধা ছিল। কেন্দ্রীয় কমিটিতে কোরেশীর সমর্থক বেশি থাকলেও কাউন্সিলরদের মধ্যে সিরাজুল আলম খান খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। শেষমেশ তিনিই সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন।[৭] শেখ ফজলুল হক মনি ও সিরাজুল আলম খানের মধ্যকার দ্বন্দ্ব পরবর্তী সময়ে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ তৈরি করেছিল, যার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

সিরাজুল আলম খান ছাত্রলীগের ভেতরে একটা গোপন সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার সূচনা করেন। ১৯৬৩ সালের নভেম্বরে তিনি আবদুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমেদকে নিয়ে ছোট একটা সেল বা চক্র তৈরি করেন। রাজ্জাক ছিলেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসম্পাদক। কাজী আরেফ ছিলেন ঢাকা নগর ছাত্রলীগের সভাপতি। এই সেলের তাত্ত্বিক ছিলেন সিরাজুল আলম খান। তাঁরা বিপ্লবী রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন ছিলেন। আঙুল কেটে রক্ত ছুঁয়ে তাঁরা শপথ নেন, যত দিন পূর্ব বাংলা স্বাধীন না হবে, তত দিন তাঁরা ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার পেছনে ছুটবেন না, এমনকি বিয়েও করবেন না। ১৯৬৫ সালে এ গ্রুপে আরও দুজনকে নেওয়া হয়। একজন যশোর ছাত্রলীগের নেতা আবুল কালাম আজাদ, অপরজন চট্টগ্রাম ছাত্রলীগের নেতা এম এ মান্নান। পরে নিষ্ক্রিয়তার কারণে মান্নানকে বাদ দেওয়া হয়। গ্রুপের অন্যদের না জানিয়ে স্কুলপড়ুয়া এক ছাত্রীকে বিয়ে করার অপরাধে আবুল কালাম আজাদও বাদ পড়েন।[৮]

সেলটির নাম দেওয়া হয় 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'। 'বিপ্লবী বাংলা' নামে তাঁরা অনিয়মিত একটা বুলেটিন বের করতেন। ফুলস্কেপ কাগজে হাতে লিখে তারপর সাইক্লোস্টাইলে অনেকগুলো কপি তৈরি করা হতো এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে সেগুলো পৌঁছে দেওয়া হতো। বিপ্লবী পরিষদ প্রতিটি জেলায় তিন বা অধিকসংখ্যক সদস্য নিয়ে সেল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করে। '৬৮ সালে জেলাভিত্তিক সেল গঠনের কাজ শেষ হয়। শেখ মুজিব বিপ্লবী পরিষদের আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু পরিষদের গোপন সাংগঠনিক কাজ সম্বন্ধে '৬৯ সালের ফেব্রুয়ারির আগে পর্যন্ত কিছুই জানতেন না।[৯] পরে এক আলাপচারিতায় আবদুর রাজ্জাক বলেছিলেন :

> এটা সঠিক যে নিউক্লিয়াস হয়েছিল। চিন্তাটা হয়েছিল ৬২ সালে, স্ট্রাকচার হলো ৬৪ সালে। সেই স্ট্রাকচারে তিনজন—সিরাজুল আলম খান, কাজী আরেফ আর আমি ছিলাম হাইকমান্ড। বঙ্গবন্ধুকে সামনে রেখেই আমরা তা করেছিলাম। তবে তাঁকে কিছুটা জানানো হয় ৬৬ সালে। ৬৯ সালে তাঁকে ডিটেইল জানানো হয়। সিরাজ ভাইকে রূপকার—এরকম কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না। আমরা তিনজনই ছিলাম তিন রকম কাজে। সিরাজ ভাই তত্ত্ব, আমি রিক্রুটিং আর আরেফ ছাত্রলীগের মধ্যে আমাদের চিন্তার প্রয়োগ ঘটাতেন।[১০]

জেলা পর্যায়ে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের যোগাযোগ ও কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো যাঁদের মাধ্যমে, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আখতার আহমেদ

(সিলেট), মনোরঞ্জন সাহা (ফরিদপুর), আমির হোসেন (মাদারীপুর), জেড আই খান পান্না (বরিশাল), মনোরঞ্জন দাস, কামরুজ্জামান টুকু ও আখতারুজ্জামান (খুলনা), আলী হোসেন মনি ও আবদুল হাই (যশোর), আবদুল মোমেন (কুষ্টিয়া), মোস্তাফিজুর রহমান পটল (বগুড়া), হারেস সরকার (রংপুর), মাহমুদুর রহমান বেলায়েত (নোয়াখালী), এম এ করিম (রাজশাহী), হাবিবউল্লাহ চৌধুরী (কুমিল্লা), খন্দকার আবদুল বাতেন (টাঙ্গাইল), মাহতাব সরকার (দিনাজপুর), আহমেদ রফিক ও মো. ইকবাল (পাবনা) এবং মাহফুজুর রহমান, সাবের আহমেদ আজগরী, আবুল কালাম আজাদ ও এস এম ইউসুফ (চট্টগ্রাম)। লেখক ও প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত কামরুদ্দিন আহমদ ও অধ্যাপক আহমদ শরীফ বিপ্লবী পরিষদের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং পরামর্শ দিতেন।[১১]

বিপ্লবী পরিষদ অত্যন্ত সচেতনভাবে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি ও জেলা কমিটিগুলোতে সাধারণ সম্পাদকের পদটি নিজেদের আয়ত্তে রাখার চেষ্টা করত। এতে তারা অনেকাংশে সফল হয়। '৬৫ সালে শেখ মনি ছাত্ররাজনীতি থেকে দূরে সরে গেলে ছাত্রলীগের ওপর সিরাজুল আলম খানের প্রায় একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৬ সালে ছয় দফা ঘোষণা করা হলে আওয়ামী লীগের মধ্যে অনেকেই এর বিরোধিতা করেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটিতে ছয় দফা পাস করাতে সিরাজুল আলম খানকে দলবল নিয়ে পেশিশক্তির মহড়া দিতে হয়েছিল। তাঁদের আপসহীন মনোভাবের ফলে '৬৬ সালের ১৮ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে আপসকামী গ্রুপটি পিঠটান দেয়, শুরু হয় মুজিব-তাজউদ্দীনের নেতৃত্বে দলের পথচলা। শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের অন্য নেতারা গ্রেপ্তার হয়ে গেলে সিরাজুল আলম খান ছয় দফাকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ১৯৬৭ সালের ২ মে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পিডিএম) গঠিত হলে ছাত্রলীগের বিরোধিতার কারণে তা বেশি দূর এগোতে পারেনি। ১৯৬৭ সালের ১৯ আগস্ট আওয়ামী লীগ থেকে আপসকামী নেতারা বহিষ্কৃত হন। এ ব্যাপারে দলের ভেতরে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের নেতা এম এ আজিজ এবং বাইরে থেকে সিরাজুল আলম খানের অনুগত ছাত্রলীগের কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। '৬৮ সালের দিকে শেখ মনি রাজনীতিতে আবার সক্রিয় হয়ে উঠলে ছাত্রলীগে উপদলীয় কোন্দল আবার বেড়ে যায়। মনি গ্রুপ মনে করত, স্বাধীনতার বক্তব্য অসময়োচিত। '৬৯ সাল পর্যন্ত তোফায়েল

আহমেদ এবং এম এ মান্নান সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে থাকলেও শেখ মনি রাজনীতিতে আবার সক্রিয় হয়ে উঠলে তাঁরা মনি গ্রুপে চলে যান।[১২]

ষাটের দশকে যাঁরা রাজনীতি করতেন, তাঁরা প্রচণ্ড অর্থকষ্টে ভুগতেন। ওই সময় যাঁরা আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগের রাজনীতি করতেন, তাঁদের একটা বড় অংশ এসেছিলেন অসচ্ছল পরিবার থেকে। পরিবারের ভরণপোষণের জন্য শেখ মুজিব আলফা ইনস্যুরেন্স কোম্পানির ব্যবস্থাপক হিসেবে একটা চাকরি নেন। এ কোম্পানির মালিক ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের বিশিষ্ট ধনী ও বাইশ পরিবারের একজন ইউসুফ হারুন। ১৯৬৬ সালে জেলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এ চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি তাজউদ্দীনকেও এ কোম্পানিতে একটি চাকরি জোগাড় করে দেন। কাজী আরেফ পুরান ঢাকার পোগোজ স্কুলে বিজ্ঞানশিক্ষকের চাকরি নেন। সিরাজুল আলম খান কেরানীগঞ্জের আঁটি স্কুলের একটা ঘরে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কোচিং করিয়ে টাকা রোজগার করতেন। আবদুর রাজ্জাকও আঁটি স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। তাঁরা সবাই নিজেদের জন্য যতটুকু সম্ভব কম খরচ করে সংগঠনের কাজে বাকি টাকা খরচ করতেন। সাংগঠনিক কাজের চাপে একসময় সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাক শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে দেন। কিন্তু কাজী আরেফ পোগোজ স্কুলে তাঁর চাকরিটা বজায় রাখেন এবং অন্য দুজনকে টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন। প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি, অমানুষিক পরিশ্রম এবং বোহেমিয়ান জীবনযাপনের কারণে আড়ালে-আবডালে অনেকেই সিরাজুল আলম খানকে 'কাপালিক' নামে ডাকতে শুরু করেন।[১৩]

ছাত্রলীগের যেসব কর্মী সিরাজুল আলম খানের প্রতি অনুগত ছিলেন, তাঁরা এ সময় সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে থাকেন। কিন্তু মূল দর্শন ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ। 'অগ্নিযুগের' বিপ্লবীরা তখন তাঁদের আদর্শ। বাঘা যতীন, সূর্য সেন, প্রীতিলতা, সুভাষ বোস তাঁদের আইডল। একই সময় চে গুয়েভারা, ফিদেল কাস্ত্রো তাঁদের মনোজগতে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিতে থাকেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভক্তির পর তখন যেসব রাজনৈতিক দল এ দেশে রুশ ও চীনা পার্টির লাইন অনুসরণ করত, সিরাজ গ্রুপের কর্মীরা তাদের ব্যাপারে ছিলেন নিরাসক্ত ও হতাশ। যেকোনো আন্দোলনে শ্রমিক-কৃষকের দাবি ও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতা নিয়ে তাঁদের ভাবাবেগ ছিল না। একমাত্র লক্ষ্য ছিল পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করা। তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, শেখ মুজিবের নেতৃত্বেই এটা সম্ভব হবে। তবে স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র মিশিয়ে একটা অগোছালো রাজনীতির প্রচার শুরু হলে তাঁরা মনি গ্রুপের আক্রমণের

লক্ষ্যে পরিণত হন। উনসত্তরের গণ-আন্দোলনে এ দ্বন্দ্ব চাপা পড়ে থাকলেও সত্তরের শুরু থেকেই তা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিভিন্ন কলেজে ছাত্রসংসদের নির্বাচন উপলক্ষে এ দ্বন্দ্ব খোলাখুলিভাবে প্রকাশ পায়।[১৪]

সিরাজ গ্রুপের সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট, তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক সাহিত্য পাঠের একটা অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। অন্যান্য কমিউনিস্ট পার্টি বা গ্রুপের মতো তাঁরা কোনো নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত দর্শনের অনুসারী ছিলেন না। দলের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা এবং ভিন্নমত পোষণ করার মতো অনুকূল পরিবেশ ছিল। একই বিষয় নিয়ে পাঁচজন পাঁচ রকম মন্তব্য বা বিশ্লেষণ করলেও এ নিয়ে কোনো জোর-জবরদস্তি ছিল না। জিন্নাহ ও গান্ধীকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা চলত। সুভাষ বোসের প্রতি একটা আলাদা পক্ষপাত ছিল। প্রথাগত কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর বলয়ের বাইরে গিয়ে একটা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলার জন্য ফিদেল কাস্ত্রো ও চে গুয়েভারার প্রতি আলাদা রকমের সমীহ ছিল। দলের মধ্যে শেখ মুজিবকে প্রায় দেবতার কাছাকাছি আসনে বসানো হয়েছিল। এর সঙ্গে সিরাজুল আলম খানেরও একটা বিপ্লবী ভাবমূর্তি তৈরি হচ্ছিল ধীরে ধীরে। তিনি তাঁর অনুসারী ও ভক্তদের কাছে হয়ে উঠলেন 'বাংলার কাস্ত্রো'। একবার এক সংবাদ সম্মেলনে শেখ মুজিব সিরাজুল আলম খানকে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'এই হলো আমার কাস্ত্রো।'

যেকোনো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে দেশ-বন্দনা অনেক সময় মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তখন খারাপ বা নেতিবাচক কোনো কিছু ধরা পড়ে না। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রয়োজনে আইকন বা বীর খোঁজার একটা সচেতন প্রয়াস থাকে। শেখ মুজিব এরকম একজন প্রতীকে পরিণত হলেন।

সিরাজ গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা যাঁর যাঁর মতো স্লোগান তৈরি করতেন। সভায় কিংবা মিছিলে কোনোটা জনপ্রিয় হতো, কোনোটা হতো না। একধরনের স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল। তবে সবকিছুই একজন বা কয়েকজন নেতা মিলে সৃষ্টি করেছেন, এমনটা দাবি করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটির কথা উল্লেখ করা যায়।

১৯৬৮ সালের কথা। ছাত্রসংসদের নির্বাচনী প্রচার উপলক্ষে ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগ নভেম্বর মাসে চার পাতার একটা প্রচারপত্র প্রকাশ করে। এর নাম ছিল 'প্রতিধ্বনি', সম্পাদক আমিনুর রহমান। শেষের পাতায় দুটো লেখা ছিল, দুই কলামে। প্রথম কলামে ছিল ছাত্রসংসদের পক্ষ থেকে একটা বিবৃতি। শিরোনাম ছিল 'কর্মমুখর অতীতের স্বাক্ষর'। এতে বিগত ছাত্রসংসদের কর্মকাণ্ডের একটা ফিরিস্তি ছিল। দ্বিতীয় কলামে ছিল ছয় দফা কর্মসূচির বর্ণনা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান প্রস্তাবিত
পূর্ব বাংলার "মুক্তি সনদ"

৬-দফা

ঢাকা কলেজ শাখা ছাত্রলীগ প্রকাশিত বুলেটিন 'প্রতিধ্বনি'র শেষ পৃষ্ঠায় 'বঙ্গবন্ধু' শব্দের প্রথম ব্যবহার, নভেম্বর ১৯৬৮

শিরোনাম ছিল : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রস্তাবিত পূর্ব বাংলার 'মুক্তি সনদ' ছয় দফা। 'বঙ্গবন্ধু' দুই শব্দে আলাদা করে ছাপা হয়েছিল। শেখ মুজিবের জন্য এই উপাধির আবিষ্কর্তা ছিলেন ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের নেতা এবং ওই সময়ে ঢাকা নগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল হক মুশতাক। তাঁর চিন্তা ছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মতো একটা জুতসই কিছু শেখ মুজিবের জন্য খুঁজে বের করা। এই ভাবনা থেকেই বঙ্গবন্ধু শব্দের উৎপত্তি।[১৫] বিষয়টি একসময় সিরাজুল আলম খানের কানে যায়। তিনি এটা 'অনুমোদন' করেন। ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি সদ্য কারামুক্ত শেখ মুজিবকে রেসকোর্স ময়দানে (পরবর্তী সময়ে যার নাম হয় সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে যে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল, সেই সভায় তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' হিসেবে ঘোষণা দেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' ঘোষণা দেওয়ার ব্যাপারে ছাত্র ইউনিয়নের উভয় গ্রুপেরই আপত্তি ছিল। সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা এবং ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) সাধারণ সম্পাদক সামসুদ্দোহা এ নিয়ে এতটাই ক্ষুব্ধ ছিলেন যে, তিনি ওই সভায় মঞ্চের ওপর বসেননি। মঞ্চে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সঙ্গে সিরাজুল আলম খানও উপস্থিত ছিলেন। রাজনীতিতে শেখ মুজিবের একচেটিয়া ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার পথে 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। এটা পরবর্তী সময়ে তাঁর নামের অপরিহার্য অংশ হয়ে যায়। শেখ মুজিবের নামের আগে বঙ্গবন্ধু না বললে কেউ কেউ প্রচণ্ড রকম ক্ষুব্ধ হতেন। এখনো হন।

আগরতলা মামলা বাতিল হয়ে যাওয়ার পর সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে কথা বলে শেখ মুজিব স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের ব্যাপারে অবহিত হন। তিনি উৎসাহ বোধ করেন, তবে বিষয়টা নিয়ে হইচই করতে নিষেধ করেন। ওই সময় ছাত্রলীগের মধ্যে সমাজতন্ত্র নিয়ে আলাপ-আলোচনা হতো প্রকাশ্যেই। অবশ্য সমাজতন্ত্রের বিরোধীরা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগে বেশ শক্তিশালী অবস্থানে ছিলেন। শহীদ মিনারে '৬৭ সালে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের এক যৌথ সভায় ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক' বলে স্লোগান দেওয়ায় ছাত্রলীগের একদল কর্মী তাঁদের ওপর চড়াও হন এবং কয়েকজনকে আহত করেন। এমনকি ছাত্রলীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও মাঝেমধ্যে সমাজতন্ত্র নিয়ে ব্যঙ্গ করতেন। ছাত্রলীগের নেতা নূরে আলম সিদ্দিকীর একটি প্রিয় স্লোগান ছিল, 'হো হো মাও মাও—চীনে যাও ব্যাঙ খাও'।

১৯৬৯ সালের ২৭ জুন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রলীগের মধ্যে ছয় দফাপন্থী এবং ছয় দফাবিরোধীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তখন প্রকাশ্য। এর সঙ্গে আরেকটি মাত্রা যুক্ত হলো, সমাজতন্ত্রের পক্ষ ও বিপক্ষ শক্তি। ছয় দফা ও সমাজতন্ত্রের পক্ষের উপদলের নেপথ্যে ছিলেন সিরাজুল আলম খান। অন্য গ্রুপটিকে সমর্থন করতেন শেখ ফজলুল হক মনি। সিরাজ গ্রুপ থেকে ছাত্রলীগের সভাপতি পদে তোফায়েল আহমেদের নাম প্রস্তাব করা হয়। এগারো দফা আন্দোলনে কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য তোফায়েলের জনপ্রিয়তা তখন আকাশচুম্বী। সিরাজ গ্রুপের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষ গ্রুপের নূরে আলম সিদ্দিকীকে সাধারণ সম্পাদকের পদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। নূরে আলম এতে রাজি হননি। খসরু, মন্টু, সেলিম, মহিউদ্দীন, ফজলুর রহমান ও রেজা শাজাহানের নেতৃত্বে সিরাজ গ্রুপের শক্তির মহড়া চলে। অন্য গ্রুপের নূরে আলম সিদ্দিকী ও আল মুজাহিদী শেখ ফজলুল হক মনির আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি। নূরে আলম সিদ্দিকী, আল মুজাহিদী ও তাঁদের সমর্থকেরা অবস্থা বেগতিক দেখে সম্মেলনের স্থান ত্যাগ করেন। তোফায়েলকে সভাপতি এবং আ স ম আবদুর রবকে সাধারণ সম্পাদক করে ছাত্রলীগের নতুন কমিটি গঠন করা হয়। শেখ মনি নূরে আলমকে সমর্থন করায় বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়েন। ছয় দফার বিরোধীরা পরে আল মুজাহিদীকে সভাপতি ও আবদুল মান্নানকে সাধারণ সম্পাদক করে আরেকটি কমিটি তৈরি করে। পরে এই গ্রুপের নাম হয় 'বাংলা ছাত্রলীগ'। এই কমিটির তেমন কোনো সমর্থন ছাত্রদের মধ্যে ছিল না। এর অল্প কিছুদিন পর বাংলা ছাত্রলীগ আতাউর রহমান খানের জাতীয় লীগের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে। শেখ মনিও অনুতপ্ত হয়ে একদিন সকালে নাশতার টেবিলে শেখ মুজিবের কাছে মাফ চান।[১৬]

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সংখ্যালঘুর কোনো স্থান থাকে না। এ দেশেও তা-ই হলো। 'তোমার আমার ঠিকানা/ পদ্মা-মেঘনা-যমুনা'—এই স্লোগান উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের সময় খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। একই সময় 'পাঞ্জাব না বাংলা/ বাংলা বাংলা' এবং 'পিন্ডি না ঢাকা/ ঢাকা ঢাকা' স্লোগানগুলো স্বাদেশিকতার ধারণাকে আরও সঞ্জীবিত করে। ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন) কর্মীরা ওই সময় একটা স্লোগান দিতেন, 'তোমার আমার ঠিকানা/ খেতখামার আর কারখানা'। কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদের জোয়ারে এই স্লোগানটি তেমন সুবিধা করতে পারেনি। তবে উগ্র জাতীয়তাবাদের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল আরও কতগুলো স্লোগানে। 'বাঙালির প্রধান শত্রু

অবাঙালি'—এই কথাটাই বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছিল ওই স্লোগানগুলোর মধ্য দিয়ে। ফলে একধরনের বাঙালি বর্ণবাদ ফুটে উঠছিল। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে তখন যেসব স্লোগান দেওয়া হতো, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'জাগো জাগো/ বাঙালি জাগো', 'তুমি কে আমি কে/ বাঙালি বাঙালি' ইত্যাদি। উগ্র জাতীয়তাবাদ কত আক্রমণাত্মক হয়, তার আলামতও দেখা যাচ্ছিল। একপর্যায়ে এমন স্লোগানও দেওয়া হতো, 'একটা-দুইটা মাউরা ধর/ সকাল-বিকাল নাশতা কর'। এই উগ্র ধারায় বাঙালি ছাড়া অপর ভাষাভাষী সাধারণ মানুষকে শত্রু হিসেবে দেখা হতো। একধরনের উন্মাদনা সৃষ্টি করতে এসব স্লোগান ছিল খুবই কার্যকর। ফলে তরুণ সমাজে ছাত্রলীগের প্রভাব দ্রুত বাড়তে থাকে। পূর্ব বাংলায় ১১৯টি কলেজের মধ্যে দেখা গেল ১০৯টি কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগ জয়লাভ করেছে।[১৭]

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বেগবান করার সবচেয়ে মোক্ষম স্লোগানটি তৈরি হয় এ সময়। এটা কোনো সংগঠিত বা সমন্বিত চেষ্টার ফলে তৈরি হয়নি। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এ স্লোগানের জন্ম। তবে এটাকে পরবর্তী সময়ে সচেতনভাবে লালন করা হয় এবং স্লোগানটি প্রথম প্রকাশ্যে উচ্চারিত হওয়ার প্রায় নয় মাস পর শেখ মুজিব স্বকণ্ঠে এ স্লোগান দেন। স্লোগানটির পটভূমি ছিল এরকম :

১৯৬৯ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস পালন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে তিন দিনব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করে। প্রথম দিন, অর্থাৎ ১৫ সেপ্টেম্বর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনে একটা সাধারণ ছাত্র সভা ডাকা হয়। সভা শুরু হলে জিন্নাহ হলের (পরবর্তী নাম সূর্য সেন হল) ছাত্র আফতাব উদ্দিন আহমদ সবাইকে চমকে দিয়ে চিৎকার দিয়ে বলেন, 'জয় বাংলা'। ইকবাল হলের (পরবর্তী নাম সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ছাত্র চিশতি শাহ হেলালুর রহমান সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার দেন 'জয় বাংলা' বলে। এভাবে তাঁরা কয়েকবার স্লোগানটা দেন। ব্যাপারটা আকস্মিকভাবে ঘটে যায়। যেহেতু এটা একটা নতুন স্লোগান, তাই সবাই একটু হকচকিত হয়ে চুপচাপ থাকেন। বিষয়টা এভাবেই চাপা পড়ে থাকে।[১৮] সত্তরের ১১ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগ জনসভার আয়োজন করেছিল। প্রধান বক্তা ছিলেন শেখ মুজিব। মঞ্চের সামনের দিকে 'জয় বাংলা' লেখা একটা ব্যানার ঝোলানো ছিল। 'বিজ্ঞাপনী'র কর্ণধার কামাল আহমেদ এটা ডিজাইন করে দিয়েছিলেন। মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে সিরাজুল আলম খান বেশ কয়েকবার এই স্লোগান দেন।[১৯] এই প্রথম ঢাকার একটি জনসভায় প্রকাশ্যে

‘জয় বাংলা’ স্লোগান উচ্চারিত হলো এবং উপস্থিত জনতা তাৎক্ষণিকভাবে তাতে সাড়া দিল। তবে মঞ্চ থেকে আওয়ামী লীগের কোনো নেতা ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেননি।

ধীরে ধীরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান জনপ্রিয় হতে থাকে। ছাত্রলীগের সিরাজপন্থী কর্মীরা একে অপরকে সম্ভাষণ জানাতে শব্দটি ব্যবহার করতে শুরু করেন। ওই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সত্তরের ৬ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদগুলোর নির্বাচনের সময় এ স্লোগানের ব্যবহার ছিল চোখে পড়ার মতো। ৭ জুন রেসকোর্স মাঠে আওয়ামী লীগ একটা জনসভা করে। ওই সভায় শেখ মুজিব প্রথমবারের মতো ‘জয় বাংলা’ স্লোগানটি দেন। বক্তৃতার শেষে তিনি ‘জয় সিন্ধু’, ‘জয় পাঞ্জাব’, ‘জয় বেলুচিস্তান’, ‘জয় সীমান্ত প্রদেশ’, ‘জয় পাকিস্তান’ উচ্চারণ করে তারপর বললেন ‘জয় বাংলা’। এর আগে ‘জিয়ে সিন্ধ’ স্লোগানটি দিয়ে সিন্ধুর জাতীয়তাবাদী নেতা জি এম সৈয়দ পাকিস্তানি শাসকদের কোপানলে পড়েছিলেন। ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা ওই সময় ‘জয় বাংলা’র পাল্টা হিসেবে ‘জয় এগারো দফা’ ও ‘জয় সর্বহারা’ স্লোগান দিলেও ‘জয় বাংলা’র জোয়ারে সব ভেসে যায়।

সিরাজুল আলম খান এ সময় শ্রমিক এলাকাগুলো, বিশেষ করে আদমজী, পোস্তগোলা ও তেজগাঁও শিল্প এলাকায় ব্যাপক গণসংযোগ করেন। তাঁকে সাহায্য করেন ছাত্রলীগের একদল কর্মী। ওই সময় তিনি প্রতিষ্ঠিত শ্রমিকনেতা মওলানা সাইদুর রহমান, আবদুল মান্নান, রুহুল আমিন ভূঁইয়া ও মোহাম্মদ শাজাহানের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। শ্রমিকদের মধ্যে আওয়ামী লীগের একটা প্রভাববলয় গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৬৯ সালের ১১ অক্টোবর তিনি জাতীয় শ্রমিক লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। সত্তরের আগস্ট মাসে শ্রমিক লীগ আদমজী জুট মিলের সিবিএ নির্বাচনে জয়ী হয়। সাইদুল হক সাদু সভাপতি নির্বাচিত হন।

সত্তরের ১৮-১৯ মার্চ ইকবাল হলের মাঠে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সিরাজ গ্রুপ শেখ শহীদুল ইসলামকে সভাপতি ও শাজাহান সিরাজকে সাধারণ সম্পাদক করতে চেয়েছিল। পক্ষান্তরে নূরে আলম সিদ্দিকী যেকোনো মূল্যে সভাপতি হতে চাইলেন। স্বপনকুমার চৌধুরী সাংগঠনিক সম্পাদক পদে একজন জোরালো প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু একজন ‘হিন্দু’ এত উঁচু পদ পাবেন, ছাত্রলীগের ভেতরে সে ধরনের পরিবেশ ছিল না। শেষমেশ

একটা আপস হয়। নূরে আলম সিদ্দিকী সভাপতি হলেন এবং বেশির ভাগ পদ পেয়ে গেল সিরাজ গ্রুপ।

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ দেশে সামরিক আইন জারি হওয়ার পর থেকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ছিল। ১ জানুয়ারি ১৯৭০ থেকে শুরু হলো প্রকাশ্য রাজনীতি। পল্টন ময়দানে জনসভা করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে আগে থেকেই অনুমতি নিতে হতো। রোববার ছুটির দিনে মাঠের চাহিদা থাকত বেশি। ১১ জানুয়ারি, রোববার ছিল আওয়ামী লীগের জনসভা। সভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন, আওয়ামী লীগ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করলে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ হয়ে যাবে। খুব বেশি কৃষকের এই পরিমাণ জমি ছিল না। খাজনাও ছিল সামান্য। তবু এই ঘোষণার একটা লোকপ্রিয় দিক ছিল।

পরের রোববার ১৮ জানুয়ারি ছিল জামায়াতে ইসলামীর জনসভা। আগেই ছাত্রলীগের সিরাজ গ্রুপের একটা সিদ্ধান্ত ছিল, জামায়াতকে নির্বিঘ্নে সভা করতে দেওয়া হবে না। সভা শুরু হলে বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে গগনবিদারী স্লোগান উঠল—'জয় বাংলা'। জামায়াতের কর্মীরা সম্ভবত আগে থেকে আঁচ করেছিলেন, সভায় গোলমাল হতে পারে। তাঁরা মঞ্চের নিচে অনেক লাঠিসোঁটা জমা করে রেখেছিলেন। প্রতিপক্ষও প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। এলোপাতাড়ি স্লোগান, চিৎকার ও হই-হুল্লোড়ে সভা পণ্ড হয়ে গেল। পরদিন *ইত্তেফাক*-এ জনসভার খবর ছাপা হয়েছিল এভাবে :

> রাজনৈতিক আচরণ-সংক্রান্ত ৬০ নং সামরিক বিধির কতিপয় সুস্পষ্ট বিধান লঙ্ঘন করিয়া প্রকাশ্য জনসভায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অশালীন ভাষায় যথেচ্ছ আক্রমণ চালাইতে থাকিলে যখন সভায় আপত্তি উত্থাপিত হয়, তখন নিরীহ শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর লাঠিসোঁটা লইয়া জামায়াতে ইসলামীর তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও ক্রুদ্ধ জনতার মধ্যে দুই ঘণ্টাব্যাপী খণ্ডযুদ্ধে চারশ জন আহত হইয়া ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালে নীত হন।[২০]

পরের রোববার ২৫ জানুয়ারি ছিল পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির (পিডিপি) জনসভা। ছাত্রলীগের সিরাজ গ্রুপ আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নুরুল আমিনকে সভা করতে দেওয়া হবে না। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণের জন্য তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনকে দায়ী করা হতো। এ জন্য তাঁর ওপর মানুষের প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ঘৃণা ছিল। নুরুল আমিনের সভাপতিত্বে সভার কাজ

শুরু হতে না-হতেই 'জয় বাংলা' স্লোগানে পল্টন ময়দান প্রকম্পিত হলো। কেউ কেউ শেখ মুজিবের ছবিসহ ক্যালেন্ডার নিয়ে মঞ্চে উঠে পড়লেন। পুরো পরিবেশটাই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল। একপর্যায়ে পিডিপির নেতারা মঞ্চ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন।

১৯৭০ সালের জুনের ৫-৬ তারিখে মতিঝিলের হোটেল ইডেনে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে ছাত্রলীগের সমাজতন্ত্রপন্থী গ্রুপটি একটা শোডাউনের পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনার একটা উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি ছিল ৭ জুন পল্টনে একটা র‍্যালি করা। এ উপলক্ষে 'জয় বাংলা বাহিনী' নামে একটা দল তৈরি করে কুচকাওয়াজের মহড়া দেওয়া হয়। এর আগে সার্জেন্ট জহুরুল হকের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে ছাত্রলীগের সিরাজ গ্রুপ 'জহুর বাহিনী' তৈরি করে। এটাই পরে 'জয় বাংলা বাহিনী' নামে পরিচিতি পায়। কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী ছেলেদের জন্য সাদা শার্ট-প্যান্ট ও সাদা জুতা এবং মেয়েদের জন্য একই রঙের শাড়ি অথবা সালোয়ার-কামিজ নির্ধারণ করা হয়। মাথায় পরার জন্য একটা টুপি তৈরির ব্যবস্থা হয়। টুপিটা ছিল অনেকটা নেতাজি সুভাষ বসুর সামরিক পোশাকের সঙ্গে ব্যবহৃত টুপির মতো। টুপির রং ছিল ওপরের দিকে গাঢ় সবুজ এবং নিচে লাল রঙের একটা মোটা ফিতার মতো পট্টি। টুপির সামনে গোল করে বসানো হলুদ রঙের মাঝে 'জয় বাংলা' লেখা, যা টুপির সঙ্গে সেফটিপিন দিয়ে আটকানো। কাপড় দিয়ে কয়েক হাজার টুপি তৈরি হয় নিউ মার্কেটের ১ নম্বর গেটের পশ্চিম দিকে এক দরজির দোকানে। ওই দোকানের মালিক ছিলেন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি কে এম ওবায়দুর রহমানের ভাই হাবিবুর রহমান। তিনিই টুপিগুলো তৈরি করিয়ে দেন। কুচকাওয়াজের মহড়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলের খেলার মাঠে। অনুষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করার জন্য একটা বাদনদল সংযোজন করা হয়। ৬ জুন সন্ধ্যায় সিদ্ধান্ত হয় জয় বাংলা বাহিনীর একটা পতাকা তৈরির, যাতে থাকবে গাঢ় সবুজ জমিনের ঠিক মাঝখানে একটা লাল বৃত্ত। ইকবাল হলের ১১৮ নম্বর কক্ষে পতাকা তৈরির কাজসহ ৭ জুনের জয় বাংলা বাহিনীর কুচকাওয়াজের সব পরিকল্পনা সমন্বয় করছিলেন মনিরুল ইসলাম।[২১] তিনি তখন ছাত্রলীগের সহসভাপতি। সিরাজুল আলম খান ও কাজী আরেফ তাঁকে দিয়ে ছাত্রলীগের ভেতরে অনেক কাজ করাতেন।

পতাকার জন্য প্রয়োজন হলো গাঢ় সবুজ আর লাল রঙের কাপড়। মনিরুল ইসলাম ছাত্রলীগের নেতা রফিকুল ইসলামকে কাপড় জোগাড়

করতে বললেন। রফিকুল ইসলাম ছাত্রলীগের মধ্যে 'লিটল কমরেড' নামে পরিচিত ছিলেন। রফিক জগন্নাথ কলেজের ছাত্র নজরুল ইসলামকে নিয়ে নবাবপুর চষে বেড়ালেন, কিন্তু কালচে সবুজ রঙের কাপড় পেলেন না। অগত্যা তাঁরা এলেন নিউ মার্কেটে। নিউ মার্কেট সাপ্তাহিক ছুটির কারণে বন্ধ ছিল। ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। নিউ মার্কেটের অ্যাপোলো ফেব্রিকসের মালিক লস্কর সাহেবের ছেলে ইকবাল ছিলেন রফিকের বন্ধু। রফিক তাঁদের বাসায় গিয়ে সবকিছু খুলে বললেন। ইকবালের বাবা দোকানের চাবি দিয়ে দিলেন। ইকবালকে নিয়ে রফিক আর নজরুল আবার নিউ মার্কেটে এলেন, দোকান খুলে পছন্দের কাপড় পেয়ে গেলেন। কাপড় নিয়ে তাঁরা সোজা গেলেন বলাকা বিল্ডিংয়ের তিনতলায় ছাত্রলীগের অফিসের পাশে একটা দরজির দোকানে। দোকানের নাম পাক ফ্যাশন টেইলার্স।[২২] ওই দোকানের অবাঙালি দরজি মোহাম্মদ হোসেন, নাসির উল্লাহ ও আবদুল খালেক মোহাম্মদী পতাকাটা সেলাই করে দেন।[২৩] সেলাই শেষ হলে তাঁরা চলে আসেন ইকবাল হলের ১১৬ নম্বর কক্ষে। এই কক্ষে থাকতেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ।

পতাকা তৈরির সময় কাজী আরেফ আহমেদ, মনিরুল ইসলাম, আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজসহ ছাত্রলীগের অনেক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন। তখন একজন ঊর্ধ্বতন কারও অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। সিরাজুল আলম খান ইকবাল হলের তিনতলার একটি কক্ষে প্রায়ই থাকতেন। তাঁকে সেখানেই পাওয়া গেল। সবকিছু শুনে তিনি বললেন, 'যে নাম দিয়েই পতাকা প্রদর্শন করো না কেন, তাকে ভবিষ্যতের স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা হিসেবেই মনে করা হবে। এটা নিয়ে প্রতিপক্ষের অপপ্রচার হবে। পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনকে অনেকেই যুক্ত বাংলার কথা বলে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের বিরুদ্ধে ঠেলে দিতে পারে।' অনেক আলোচনার পর তিনি লাল বৃত্তের মাঝখানে বাংলাদেশের একটা মানচিত্র এঁকে দেওয়ার পরামর্শ দেন। সোনার বাংলার প্রতীক হিসেবে মানচিত্রের রং যেন সোনালি হয়—এই ছিল তাঁর মত।[২৪] একজন শিল্পীর দরকার হলো মানচিত্র আঁকার জন্য। সে সমস্যারও সমাধান হলো। সলিমুল্লাহ হল শাখা ছাত্রলীগের সম্মেলন উপলক্ষে ব্যানার-ফেস্টুন আঁকার জন্য কুমিল্লা ছাত্রলীগের নেতা শিবনারায়ণ দাস তখন সেখানে ছিলেন। মনিরুল ইসলামের নির্দেশে বাংলা বিভাগের ছাত্র ফজলুর রহমান বাবুল এক দৌড়ে সলিমুল্লাহ হলে গিয়ে সুমন মাহমুদের কামরা থেকে শিবনারায়ণকে বগলদাবা করে নিয়ে

এলেন।[২৫] মানচিত্র তো আঁকা হবে, রং-তুলি কই? কামরুল আলম খান খসরু ছুটলেন নিউ মার্কেটে। কাঁচাবাজারের মধ্যে একটা রঙের দোকান ছিল। দোকানের ভেতরে দোকানি ঘুমিয়ে ছিলেন। খসরু তাঁকে ডেকে তুললেন। রং নিয়ে আসা হলো। সেই রং দিয়ে আঁকা হলো বাংলাদেশের মানচিত্র।[২৬]

৭ জুন সকালে বৃষ্টি ছিল। পল্টনে জয় বাংলা বাহিনীর কুচকাওয়াজ হলো। সবার সামনে আ স ম আবদুর রব। তিনি জয় বাংলা বাহিনীর প্রধান। তাঁর পেছনেই বাহিনীর উপপ্রধান খসরু। রব একটা কাঠিতে প্যাঁচানো পতাকাটি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শেখ মুজিবের হাতে দিলেন। কুচকাওয়াজ থেকে সামরিক কায়দায় তাঁকে সালাম জানানো হলো, শেখ মুজিব কপালের কাছে হাত তুলে সালামের জবাব দিলেন। শেখ মুজিব পতাকাটা খুলে একটু দেখলেন, তারপর পাশে দাঁড়ানো একজনের হাতে সেটা দিয়ে দিলেন।[২৭]

বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ব্যাপারে শেখ মুজিবের নিজস্ব চিন্তাভাবনা ছিল। ১৯৬২-৬৩ সালে শেখ মুজিব ভারতের সাহায্য নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন। এ জন্য তিনি আগরতলা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তাঁর চেষ্টা সফল হয়নি। আগরতলা থেকে তিনি খালি হাতে ফিরে এসেছিলেন।[২৮] বিষয়টা কিন্তু পুরোপুরি চাপা পড়ে যায়নি।

জেলে তাঁর সহবন্দী ছিলেন বরিশালের চিত্তরঞ্জন সুতার। তাঁদের মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। সুতার অন্যদের সঙ্গে ’৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে জেল থেকে ছাড়া পান। এরপর তিনি কলকাতায় চলে যান। কলকাতার ভবানীপুরে রাজেন্দ্রপ্রসাদ রোডে তিনি ভুজঙ্গভূষণ রায় নাম নিয়ে একটি তিনতলা বাড়ি ভাড়া নেন এবং সেখানে সপরিবারে বসবাস করতে থাকেন। সুতারের সঙ্গে শেখ মুজিব যাতে সহজেই যোগাযোগ করতে পারেন, সে জন্য একজন বার্তাবাহকের খুবই প্রয়োজন ছিল। গোয়েন্দাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে কাজটি করার জন্য প্রয়োজন ছিল একজন বিশ্বস্ত লোকের। সিরাজুল আলম খান রাজশাহীর ডা. আবু হেনাকে একদিন শেখ মুজিবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আবু হেনা ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করেছিলেন। ঠিক হলো, আবু হেনা বার্তাবাহকের কাজটি করবেন অতি গোপনে। ’৬৯ সালের শেষ দিকে শেখ মুজিব আবু হেনার মাধ্যমে সুতারের কাছে একটা চিরকুট পাঠান। চিরকুটে বাংলাদেশের কিছু তরুণকে সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার উল্লেখ ছিল। কাজী আরেফ আহমেদের তত্ত্বাবধানে অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য ছাত্রলীগের সদস্যদের মধ্য থেকে বাছাই করে ৬০ জনের একটা তালিকাও তৈরি করা হয়েছিল। সত্তর সালের আগস্ট মাসে এই প্রশিক্ষণ হওয়ার কথা ছিল।[২৯]

ছাত্রলীগের ভেতর যে মেরুকরণ ঘটছিল, তার একটা বিস্ফোরণ হয় '৭০ সালের আগস্ট মাসে। ঢাকায় ৪২ নং বলাকা বিল্ডিংয়ের ছাত্রলীগের অফিসে তখন কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভা চলছিল। কেন্দ্রীয় কমিটিতে সিরাজপন্থীদের মুখপাত্র ছিলেন স্বপন কুমার চৌধুরী। ২১ আগস্ট রাতে সভা চলার সময় তিনি 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ' শিরোনামে একটা প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করেন। এ নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা ও বিতণ্ডা হয়। স্বপন ভোটাভুটির দাবি জানান। কেন্দ্রীয় কমিটির ৪৫ জন সদস্যের মধ্যে ৩৬ জন ছিলেন প্রস্তাবের পক্ষে। সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী এই প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধিতা করেন।[৩০] অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি সভা মুলতবি করে দেন। তখন সবাই মিলে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে শেখ মুজিবের বাসায় যান। শেখ মুজিব সব শুনে বিব্রত বোধ করেন। তিনি তখন নির্বাচন নিয়েই ভাবছিলেন। ছাত্রলীগের সহসম্পাদক বদিউল আলম বললেন, 'আমরা মেজরিটি ভোটে প্রস্তাব পাস করেছি।' উত্তেজিত তরুণ তুর্কিদের শান্ত হওয়ার পরামর্শ দিয়ে শেখ মুজিব বললেন, 'স্বাধীনতা চাস, ভালো। কিন্তু রেজুলেশন নিয়ে তো স্বাধীনতা হয় না। গ্রামে যা, কাজ কর।' এ সময় রফিকুল ইসলাম জোরে স্লোগান দিয়ে উঠলেন, 'কৃষক-শ্রমিক অস্ত্র ধরো/ বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। রফিকের স্লোগান শুনে শেখ মুজিব বিরক্ত হয়ে বলেন, 'খবরদার, এ স্লোগান দেবা না, এটা কমিউনিস্টদের স্লোগান।' ছাত্রলীগের আরেক সহসম্পাদক চিশতি হেলালুর রহমান শেখ মুজিবের মুখের সামনে হাতের বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে বললেন, 'আপনি শ্রেণিসংগ্রামের কী বোঝেন?' শেখ মুজিব হতভম্ব হয়ে যান। এই প্রজন্মকে তিনি চেনেন না। শেষে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোরা এখন যা। সিরাজের সঙ্গে আমার কথা হবে।'[৩১]

শেখ মুজিব এর আগে বিপ্লবী পরিষদের সঙ্গে আলাপ করে ছাত্রলীগের একদল বিশ্বস্ত কর্মীকে বাছাই করতে বলেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, এদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সত্তরের মাঝামাঝি মুজিব নিশ্চিত হন, দেশে নির্বাচন হবে। এ ছাড়া আগস্টে 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ' প্রস্তাব নিয়ে ছাত্রলীগের মধ্যে দলাদলির কারণে তিনি আগের অবস্থান থেকে সরে আসেন। সামরিক প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা বাতিল হয়। শেখ মুজিব ডা. আবু হেনাকে দিয়ে চিত্তরঞ্জন সুতারের কাছে আরেকটা চিরকুট পাঠান প্রশিক্ষণ স্থগিত করার কথা বলে। শেখ মুজিব এ সময় সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাককে অনুরোধ করেন, তাঁদের সঙ্গে শেখ ফজলুল হক মনি ও তোফায়েল আহমেদকে রাখতে।[৩২]

উনসত্তরের ২৮ নভেম্বর এক বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা করেছিলেন, সত্তরের ৫ অক্টোবর দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সারা দেশে জাতীয় পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়ে ১৬২টি আসন। এ ছাড়া সংরক্ষিত ১৩টি মহিলা আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ থাকে সাতটি। প্রাদেশিক পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানে ৩০০ আসন বরাদ্দ হয়। এর অতিরিক্ত ১০টি সংরক্ষিত মহিলা আসন রাখা হয়। শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, প্রতিটি আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী দেবে।

জুলাই মাসে পূর্ব বাংলায় বন্যা দেখা দেয়। আগস্টে বন্যা-পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। আগস্টে এক ঘোষণায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দেন। নতুন তারিখ নির্ধারিত হয় জাতীয় পরিষদের জন্য ৭ ডিসেম্বর এবং প্রাদেশিক পরিষদের জন্য ১৯ ডিসেম্বর।

সত্তর সালের অক্টোবর মাস, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে রোজার ছুটি শুরু হয়েছে। ডাকসুর সহসভাপতির কক্ষে বসে বিপ্লবী পরিষদের পক্ষে কাজী আরেফ আহমেদ ছাত্রলীগের বাছাই করা একদল কর্মীকে ফুলস্কেপ কাগজে তিন পাতার সাইক্লোস্টাইল করা হাতে লেখা একটা বুলেটিন দিলেন। শিরোনাম ছিল 'জয় বাংলা'। তখন 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স' বা বিএলএফ নামটা মাত্র চালু হয়েছে। এই বুলেটিনে ছিল তারই আগাম বার্তা, যদিও সংগঠনের নাম কোথাও ব্যবহার করা হয়নি। বুলেটিনে বলা হয়, গ্রামে গ্রামে সংগঠন করতে হবে; সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও শাসকগোষ্ঠী যদি ছয় দফা ও ১১ দফাভিত্তিক সংবিধান তৈরি করতে না দেয়, তাহলে 'বাঙালির মুক্তিসংগ্রামই হবে একমাত্র খোলা পথ'। জাতীয় নেতার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এবং আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা রেখে প্রত্যেক কর্মীকে 'মুক্তিযোদ্ধা' হিসেবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে (পরিশিষ্ট ১)।[৩৩]

সিদ্ধান্ত হলো, নির্বাচিত কর্মীরা প্রতিটি এলাকায় যাবেন এবং আওয়ামী লীগের প্রার্থী যাতে নির্বাচনে জয়ী হতে পারেন, সে ব্যাপারে তৎপর থাকবেন। সেই সঙ্গে পরিস্থিতি যদি অন্য রকম হয়, তাহলে তা মোকাবিলা করার জন্যও সাংগঠনিক প্রস্তুতি এখন থেকেই নিতে হবে। রোজার ছুটির দিনগুলো এভাবেই কাজে লাগাতে হবে।

এ সময় উপকূলীয় অঞ্চলে এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে। ১২ নভেম্বর রাতে এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে লাখ লাখ মানুষ নিহত হয়। এদের সংখ্যা সঠিকভাবে কখনোই জানা যায়নি।

জয় বাংলা

মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে ১৯৭০ সালের অক্টোবরে দেওয়া বিএলএফের প্রচারপত্র

বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছিল। ইয়াহিয়া অবশ্য নির্বাচন পেছানোর দাবি মেনে নেননি। শুধু দুর্গত এলাকায় জাতীয় পরিষদের ৯টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ২১টি আসনে নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি ধার্য করা হয়।

নির্বাচন নিয়ে সারা দেশে ছিল প্রচণ্ড উৎসাহ। কেননা, এর আগে সমগ্র পাকিস্তানে কোনো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। নির্বাচনের দুই দিন আগে ঢাকায় অবস্থিত মার্কিন কনস্যুলেট জেনারেল আর্চার ব্লাডের সঙ্গে শেখ মুজিবের দেখা হয়। মুজিব ছিলেন অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। তিনি জানালেন, পিডিপির নুরুল আমিন এবং স্বতন্ত্র চাকমা প্রার্থী ত্রিদিব রায় ছাড়া বাকি সব আসন আওয়ামী লীগ পাবে।[৩৪] ফলাফল তা-ই হলো। দুর্গত এলাকায় নির্বাচন হলো জানুয়ারিতে। নয়টি আসনের সবই আওয়ামী লীগ পেল। প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পেল ২৮৮টি আসন। একেই বলে ভূমিধস বিজয়। পশ্চিম পাকিস্তানে ১৩৮টি আসনের মধ্যে ভুট্টোর পিপলস পার্টি পেল ৮১টি আসন।

MOST PARTIES ROUTED

AL 151, PPP 81

'পাকিস্তান অবজারভার'-এ প্রকাশিত ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল

ভোট পড়েছিল ৫৭.৭ শতাংশ। মোট প্রদত্ত ভোটের ৩৮.৩ শতাংশ পেল আওয়ামী লীগ, ১৯.৫ শতাংশ পাকিস্তান পিপলস পার্টি। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে ৭৪.৯ শতাংশ, পাঞ্জাবে ০.০৭ শতাংশ, সিন্ধুতে ০.০৭ শতাংশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ০.২ শতাংশ ও বেলুচিস্তানে ১ শতাংশ ভোট পায়। পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ আটটি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। পক্ষান্তরে পিপলস পার্টি পাঞ্জাবে ৪১.৬ শতাংশ, সিন্ধুতে ৪৪.৯ শতাংশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১৪.২ শতাংশ ও বেলুচিস্তানে ২.৩ শতাংশ ভোট পায়। জাতীয় পরিষদের কোনো আসনে পূর্ব পাকিস্তানে পিপলস পার্টির কোনো প্রার্থী ছিল না। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ঢাকার মোহাম্মদপুর-মিরপুর এলাকা থেকে পিপলস পার্টির একজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সবচেয়ে বেশি ভোট পায় জমিয়তে উলেমা ইসলাম (২৫.৪ শতাংশ)। বেলুচিস্তানে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি সর্বাধিক ৪৫.১ শতাংশ ভোট পায়।[৩৫]

এত দিন চিন্তা ছিল নির্বাচন হবে কি হবে না। নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর তার ফলাফলে এমন মেরুকরণ ঘটল যে, তা পাকিস্তানের ভিত্তিমূল রীতিমতো ঝাঁকিয়ে দিল। প্রমাণিত হলো, পাকিস্তানে জাতীয়ভিত্তিক কোনো রাজনৈতিক দল নেই। দুটো আঞ্চলিক দল এখন পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থান করছে। এটা ছিল একটা ঝড়ের পূর্বাভাস।

একাত্তরের ৩ জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত এক জনসভায় আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে

শপথ অনুষ্ঠানে ছয় দফা ও এগারো দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন-সংবলিত সংবিধান তৈরি করার অঙ্গীকার করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। 'জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান' বলে তিনি বক্তৃতা শেষ করেন। ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে রমনার বটমূলে ছাত্রলীগের তখনকার ও সাবেক সদস্যদের একটা সম্মিলনের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি শেখ মুজিব। বিশেষ অতিথি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ চৌধুরী ও ড. কামাল হোসেন। অনুষ্ঠানে সদ্য নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সভা শুরু হওয়ার আগে ২০-২৫ জনের একটি দল স্লোগান দিতে দিতে সভাপ্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করে। তাদের স্লোগানগুলো ছিল: বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো/ বাংলাদেশ স্বাধীন করো; মুক্তিফৌজ গঠন করো/ বাংলাদেশ স্বাধীন করো; লাল সূর্য উঠেছে/ বীর জনতা জেগেছে; মুক্তির একই পথ/ সশস্ত্র বিপ্লব; স্বাধীন করো স্বাধীন করো/ বাংলাদেশ স্বাধীন করো; বঙ্গবন্ধুর মন্ত্র/ সমাজতন্ত্র। এ সময় আরেকটি গ্রুপ অন্য রকম স্লোগান দিল। তাদের স্লোগান ছিল: শেখ মুজিবের মতবাদ/ গণতান্ত্রিক সমাজবাদ; ছয় দফা মানতে হবে/ নইলে গদি ছাড়তে

একাত্তরের ১৫ ফেব্রুয়ারি জহুর দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে ডাকসু আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তৃতা করছেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ আবুল হাশিম

হবে—ইত্যাদি। স্লোগানগুলোর মধ্যে ছাত্রলীগের মধ্যকার বিপরীতধর্মী দুটো প্রবণতা ছিল লক্ষণীয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁর বক্তৃতার একপর্যায়ে বললেন, 'কিছু কিছু ছেলে সংগঠনবিরোধী স্লোগান দিয়েছে। দলে এসব বরদাশত করা হবে না।' তবে স্লোগান-পাল্টা স্লোগানের মধ্য থেকে উঠে আসা বার্তাটি শেখ মুজিব ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন। তিনি বক্তৃতা শেষ করলেন 'জয় বাংলা' বলে। অন্যান্য দিনের মতো 'জয় পাকিস্তান' আর বলেননি এবং এরপর আর কোনো দিনও নয়।

একাত্তরের ১৩ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করা হয়, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ৩ মার্চ ঢাকায় শুরু হবে। এটা ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে আসছিল যে, শেখ মুজিব ছয় দফার ব্যাপারে কোনো আপস করবেন না। পক্ষান্তরে ভুট্টো, ইয়াহিয়া এবং তাঁর সামরিক জান্তার কাছে ছয় দফা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। ভুট্টো জানিয়ে দেন, তিনি বা তাঁর দল অধিবেশনে যোগ দেবে না। ১ মার্চ বেলা একটায় রেডিওতে ঘোষণা দিয়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হয়। ঘোষণা শোনামাত্রই ঢাকার রাজপথে সর্বস্তরের মানুষ নেমে আসে। পাকিস্তানি পতাকা পোড়ানো হলো বিভিন্ন জায়গায়। শেখ মুজিব ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তিনি পরদিন ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারা দেশে হরতাল আহ্বান করেন।

সারা দেশ তখন শেখ মুজিবের দিকে তাকিয়ে। এ সময় তাঁর অনেক কড়া সমালোচকও তাঁর ভক্ত হয়ে পড়েন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন হলেন অধ্যাপক আহমদ শরীফ। তাঁর নিজস্ব বিশ্লেষণ ছিল এরকম :

> শেখ মুজিবুর রহমানকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়ানোর ফলেই ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ অ-আওয়ামী লীগ বাঙালি মাত্রই মুজিবের প্রতি সহানুভূতিশীল ও তাঁর সমর্থক হয়ে ওঠে।...এভাবে ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ স্বাতন্ত্র্যকামী বাঙালির স্বতঃস্ফূর্ত নেতৃত্বে বৃত হন শেখ মুজিবুর রহমান। তখন তিনিই বাঙালির বল-ভরসার আকর ও ভিত্তি, প্রেরণার, প্রণোদনার, সংগ্রামের প্রবর্তনার উৎস। তাই নির্বাচনকালে দেশসুদ্ধ প্রায় সবাই আওয়ামী লীগপন্থী হয়ে উঠল। মুজিব হলেন বাঙালির একচ্ছত্র অবিসংবাদিত নেতা ও নায়ক। আমার মতো যারা তাঁকে এবং আওয়ামী লীগকে পছন্দ করিনি কখনো, আমরাও সংসদ অধিবেশন মুলতবি সংবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে আওয়ামী নেতৃত্বে আন্দোলন ও সংগ্রামে অংশীদার হয়ে যাই।[৩৬]

১ মার্চ বিকেলে ছাত্রলীগের একক নেতৃত্বে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এর চারজন প্রধান নেতার মধ্যে ছিলেন ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ, ডাকসুর সহসভাপতি আ

শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কথা বলছেন ছাত্রলীগের চার নেতা : বাঁ থেকে আবদুল কুদ্দুস মাখন, শাজাহান সিরাজ, নূরে আলম সিদ্দিকী ও আ স ম আবদুর রব

স ম আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন। পরদিন ২ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের বটতলায় এক ছাত্র জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। যেহেতু কোনো মঞ্চ তৈরি করা হয়নি, কলা ভবনের সামনে পশ্চিম দিকে গাড়িবারান্দার ছাদের ওপর ছাত্রলীগের প্রধান নেতারা সবাই দাঁড়ালেন। সংখ্যায় তাঁরা ১২-১৩ জন হবেন। মুহুর্মুহু স্লোগান চলছে: 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো/ বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। এমন সময় জগন্নাথ কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি মিছিল এল। তাঁদের হাতে একটা পতাকা। এটা সেই রকম পতাকা, যা সত্তরের ৬ জুন রাতে তৈরি করা হয়েছিল এবং ৭ জুন পল্টনে জয় বাংলা বাহিনীর প্যারেডে ব্যবহার করা হয়েছিল। ১ মার্চ রাতে ইকবাল হলের ২১৫ নম্বর কক্ষে নতুন এই পতাকাটি বানানো হয়। এই কক্ষটি ছিল ছাত্রলীগের নেতা চিশতি শাহ হেলালুর রহমানের। বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা পতাকাটি উঁচু করে ধরে আ স ম আবদুর রবের হাতে দেওয়া হলো। রব বাঁশটা ধরে বেশ কয়েকবার ডানে-বাঁয়ে ঘোরালেন। তারপর বললেন, 'এটা আমাদের স্বাধীন বাংলার পতাকা।' তারপর পতাকাটা হাতে হাতে ঘুরল।

২ মার্চ বিকেলে সিরাজুল আলম খান ইকবাল হলের ক্যানটিনে ছাত্রলীগের একদল নেতা-কর্মীকে নিয়ে বসলেন। কিছু কিছু বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার

দরকার ছিল। তিনি কিছু একটা বলছেন আর কেউ একজন নোট নিচ্ছেন। তিনি বললেন, জাতীয় পতাকা কেমন হবে? কয়েকজন বলল, আজ বটতলায় যেটা তোলা হয়েছে, সেটাই হোক। জাতীয় সংগীতের প্রসঙ্গ উঠতেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানটির প্রস্তাব এল। কিন্তু এর দুটো সমস্যা ছিল। প্রথমত, গানটির কোথাও 'বাংলা' বা 'বাংলাদেশ' শব্দটি নেই। দ্বিতীয়ত, গানটির কোনো রেকর্ড পাওয়া যায় না। শেষমেশ প্রস্তাব করা হলো, রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটিকে জাতীয় সংগীত করা হোক। সিরাজুল আলম খান মাথা নাড়লেন। একজন সঙ্গে সঙ্গে নোট নিল। এরপর এল 'জাতির পিতা' প্রসঙ্গ। অনেকেই আপত্তি

একাত্তরের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করছেন ডাকসুর সহ-সভাপতি আ স ম আবদুর রব

জানিয়ে বললেন, এটা একটা পাকিস্তান-মার্কা প্রস্তাব। জাতি থাকলেই তার একটা পিতা থাকতে হবে নাকি? যেমন আছেন জিন্নাহ সাহেব? সুতরাং 'জাতির পিতা' প্রসঙ্গ বাদ পড়ল। আলোচনা হলো জাতীয় নেতা নিয়ে। সিদ্ধান্ত হলো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হবেন স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের 'সর্বাধিনায়ক'।

সিরাজুল আলম খান আরও কিছু নির্দেশনা দিলেন। যাঁরা নোট নিচ্ছিলেন, তাঁরা আরও দু-চারটা বাক্য জুড়ে দিচ্ছিলেন। পরে ইকবাল হলের ৩১৩ নম্বর কক্ষে এক পৃষ্ঠার একটি প্রাথমিক খসড়া তৈরি করেন রায়হান ফেরদৌস মধু। ডাকসুর সহসভাপতি আ স ম আবদুর রব এই কক্ষে থাকতেন। মধু যখন লেখাটির খসড়া তৈরি করেন, তখন সেখানে সিরাজুল আলম খান ও শেখ ফজলুল হক মনি উপস্থিত ছিলেন।[৩৭] সন্ধ্যার পর নীলক্ষেতে আনোয়ার রেস্টুরেন্টে খসড়াটি পরিমার্জন করে একটা প্রচারপত্রের আকার দেওয়া হয়। কাজটি করেন রায়হান ফেরদৌস মধু ও মহিউদ্দিন আহমদ। রাতেই তা ছাপিয়ে ফেলা হয়। এর শিরোনাম ছিল 'জয় বাংলা—ইশতেহার নং এক'।

ইশতেহার নং এক

জয় বাংলা

(স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচী)

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করা হয়েছে। [illegible]

[illegible]

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ যে 'স্বাধীনতার ইশতেহার' পাঠ করেছিলেন

বন্ধনীর ভেতরে লেখা ছিল 'স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচী' (পরিশিষ্ট ২)।

৩ মার্চ পল্টনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের জনসভা ছিল। সভা শুরু হওয়ার একটু আগে একটা খোলা জিপে করে শেখ মুজিব এলেন। পেছনে দাঁড়ানো রাইফেল হাতে খসরু। তিনি সরাসরি মঞ্চে উঠে গেলেন। তাঁর উপস্থিতিতে শাজাহান সিরাজ আগের দিন তৈরি করা ইশতেহারটি পাঠ করলেন। এটাই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রথম আনুষ্ঠানিক লিখিত দলিল। শেখ মুজিবের ভাষণ ছিল সংক্ষিপ্ত। তিনি অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যেতে বললেন। তিনি আরও বললেন, তাঁর অনেক কিছু বলার আছে। সব কথা তিনি ৭ তারিখে বলবেন।

৭ মার্চ রেসকোর্সের স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভায় শেখ মুজিব এলেন বেলা তিনটায়। তাঁর ১৯ মিনিটের ভাষণটি ছিল নানা দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট, ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে ষড়যন্ত্র, নিরস্ত্র জনতার ওপর সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণের কথা উল্লেখ করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য চারটি শর্ত দিলেন। শর্তগুলো হচ্ছে :

সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে;
সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে;
নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলিবর্ষণের তদন্ত করতে হবে;
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

তিনি সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি, তবে 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার' আহ্বান জানান এবং 'যার যা আছে, তা-ই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার' জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন। জনসভায় তিনি কী বলেছেন, তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, তিনি কী বলেননি।

ইয়াহিয়া ঢাকায় এলেন ১৫ মার্চ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিচারপতি এ আর কর্নেলিয়াস, লে. জেনারেল পীরজাদা, আইএসআইয়ের প্রধান মেজর জেনারেল মো. আকবর, গোয়েন্দা ব্যুরোপ্রধান নাজির আহমেদ রিজভি এবং পরিকল্পনা কমিশনের উপপ্রধান এম এম আহমদ। ইয়াহিয়া-মুজিব সংলাপ চলতে থাকে।

২২ মার্চের পর ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিবের আর কোনো বৈঠক হয়নি। তবে ২৪ মার্চ সন্ধ্যা ছয়টায় আওয়ামী লীগের আলোচক দল ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের সঙ্গে আবার বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সর্বশেষ যে সংশোধনী প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তা হলো, দেশের নাম হবে 'কনফেডারেশন অব পাকিস্তান'।[৩৮]

একাত্তরের মার্চে পল্টন ময়দানে ডামি রাইফেল নিয়ে মিছিল, সামনে নেতৃত্বে ছিলেন ফরিদা খানম সাকী (বাঁয়ে) এবং মমতাজ বেগম (ডানে)

ইয়াহিয়া ২৪ মার্চ টিক্কা খান ও রাও ফরমান আলীকে ডেকে 'অপারেশন সার্চলাইট' বাস্তবায়ন করার নির্দেশ দেন। ইয়াহিয়ার বক্তব্য ছিল, 'দেশকে অখণ্ড রাখার জন্য কয়েক হাজার মানুষ মারতে হলেও এটা খুব বড় একটা মূল্য নয়।'[৩৯] ইয়াহিয়া ২৫ মার্চ সন্ধ্যা সাতটায় গোপনে ঢাকা ছেড়ে যান।

২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্যবর্তী রাতে সামরিক অভিযান শুরু হয়। রাত নয়টার পর থেকেই সামরিক হামলার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে আসছিল। তবে এটা যে কত ভয়ংকর হতে পারে, তা নেতারা আঁচ করতে পারেননি। শেখ মুজিব তাঁর সহযোগী আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের এবং ছাত্রনেতাদের নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বলেন। তিনি নিজে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেবেন এমন ধারণাও দেন। শেখ মুজিব শেষ কথা বলেন সিরাজুল আলম খান, আ স ম আবদুর রব ও শাজাহান সিরাজের সঙ্গে রাত ১১টার দিকে।[৪০] সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবের জন্য ২৬ মার্চ কেরানীগঞ্জের দৌলেশ্বর গ্রামে জাতীয় পরিষদের সদস্য হামিদুর রহমানের বাড়িতে অপেক্ষা করেছিলেন। ওখান থেকে আরও দূরে সরে

যাওয়ার জন্য একটা লঞ্চও প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। শেখ মুজিবকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সিরাজুল আলম খানের নির্দেশে খসরু একটা জিপ নিয়ে মধ্যরাতে ধানমন্ডির আশপাশে ঘুরে বেড়িয়েছেন।[৪১] শেখ মুজিব বাড়িতেই থাকার সিদ্ধান্ত নেন। রাত সোয়া একটায় লে. কর্নেল জেড এ খানের নেতৃত্বে একদল কমান্ডো নিয়ে মেজর বেলাল ধানমন্ডিতে শেখ মুজিবের বাড়িতে বিনা বাধায় প্রবেশ করেন। শেখ মুজিব গ্রেপ্তার হন। আওয়ামী লীগের আর কোনো নেতাকে সেনাবাহিনী গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ৪ এপ্রিল ড. কামাল হোসেন গ্রেপ্তার হন।[৪২]

২৬ মার্চ থেকে চলতে থাকে হাজার হাজার ছিন্নমূল মানুষের পদযাত্রা। তাঁরা সবাই শহর ছেড়ে যাচ্ছেন। অনেকের গন্তব্য নিজ নিজ গ্রামে। যাঁদের আর কোনো ঠিকানা নেই, তাঁরা ক্রমাগত হাঁটছেন সীমান্তের দিকে।

৩০ মার্চ তাজউদ্দীন আহমদ আমীর-উল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে কুষ্টিয়া সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। সেখানে বিএসএফের ইন্সপেক্টর জেনারেল গোলক মজুমদারের সহায়তায় তিনি একটা সামরিক কার্গো বিমানে

AMRITA BAZAR PATRIKA

Mujib proclaims independence

Bridges blown up: Rly. lines uprooted
Army cracks down: Heavy casualties

NEW MARTIAL LAW ORDERS

MUJIB GOES UNDERGROUND

CIVIL WAR IN EAST PAKISTAN

Yahya charges Rehman with treason

একাত্তরের ২৬ মার্চ কলকাতার দৈনিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রথম পৃষ্ঠা

করে ১ এপ্রিল দিল্লি রওনা হন। ৪ এপ্রিল তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন।[৪৩]

আমীর-উল ইসলামের সঙ্গে আলাপ করে তাজউদ্দীন আহমদ সিদ্ধান্ত নিলেন, স্বাধীন বাংলার সরকার গঠন করবেন এবং তিনি নিজে সরকারের প্রধানমন্ত্রী হবেন। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা বৈঠক হলে তাজউদ্দীন তাঁকে সরকার গঠনের ব্যাপারে অবহিত করেন।[৪৪] ততদিনে শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ কলকাতায় পূর্বনির্ধারিত চিত্তরঞ্জন সুতারের বাড়িতে এসে উপস্থিত। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা না করে তাজউদ্দীন দিল্লি গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন, এটা জেনে তাঁরা খুব ক্ষুব্ধ হন। তাঁদের দাবি অনুযায়ী, তাজউদ্দীনের ভবানীপুরে চিত্তরঞ্জন সুতারের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা ছিল। তাঁদের ভাষ্যমতে, শেখ মুজিবের স্পষ্ট নির্দেশনা ছিল, এই চারজন যুবনেতার নেতৃত্বে বিপ্লবী কাউন্সিল হবে এবং কোনো ধরনের সরকার গঠন করা হবে না। বিপ্লবী কাউন্সিল তরুণদের সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং দেশের ভেতরে গেরিলাযুদ্ধ সংগঠিত করবে।[৪৫]

তাজউদ্দীন কলকাতায় ফিরে এলে যুবনেতাদের তোপের মুখে পড়েন। তিনি কৈফিয়ত দেওয়ার চেষ্টা করেন যে, চিত্তরঞ্জন সুতারের বাড়ির ঠিকানা তিনি খুঁজে পাননি। এ সময় আওয়ামী লীগের নেতা ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এ এইচ এম কামারুজ্জামান ও মিজানুর রহমান চৌধুরীও কলকাতায় এসে পৌঁছান।[৪৬]

ইতিমধ্যে আমীর-উল ইসলাম প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ হিসেবে প্রচারের জন্য একটা বক্তৃতার খসড়া তৈরি করেন এবং তাজউদ্দীনের কণ্ঠে তা রেকর্ড করানো হয়। রেকর্ডকৃত ভাষণটি বিএসএফের হাতে দেওয়া হয় আকাশবাণী থেকে প্রচারের জন্য। তখনো আওয়ামী লীগের অনেক সিনিয়র নেতার সঙ্গে তাজউদ্দীনের যোগাযোগ হয়নি।[৪৭]

তাজউদ্দীন ১০ এপ্রিল আমীর-উল ইসলাম, শেখ মনি, তোফায়েল আহমেদ ও মনসুর আলীকে সঙ্গে নিয়ে আগরতলার উদ্দেশে কলকাতা থেকে যাত্রা করেন। পথে শিলিগুড়িতে তাঁরা যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে তাঁরা রেডিওতে তাজউদ্দীনের ভাষণ শুনতে পান। এরপর তাজউদ্দীনের সঙ্গে শেখ মনির বেশ কথা-কাটাকাটি হয়। তাজউদ্দীন কার সঙ্গে পরামর্শ করে নিজেকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, এ নিয়ে শেখ মনি প্রশ্ন তোলেন।[৪৮]

তাজউদ্দীন নিজেকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করে রেডিওতে ভাষণ দেবেন, এটা তাজউদ্দীন নিজেও জানতেন কি না, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। ভাষণটি প্রচারের আগে তাজউদ্দীনকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করেন রেডিওর ঘোষক। কাজটি আমীর-উল ইসলাম তাজউদ্দীনকে না জানিয়েই করেছিলেন বলে কেউ কেউ সন্দেহ করেন। যাহোক, সব ঝড়ঝাপটা তাজউদ্দীনের ওপর দিয়েই যায়।[৪৯]

শিলিগুড়ি থেকে রওনা হয়ে তাঁরা ময়মনসিংহ সীমান্তের কাছে সৈয়দ নজরুল ইসলামের দেখা পান। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সবাই আগরতলায় যাত্রা করেন। আগরতলায় খন্দকার মোশতাক আহমদ এবং কর্নেল (অব.) আতাউল গনি ওসমানী অপেক্ষা করছিলেন। সেখানে তাঁদের মধ্যে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। ঠিক হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে সরকার গঠন করা হবে। তাঁর অবর্তমানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি থাকবেন। খন্দকার মোশতাক প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার ছিলেন। তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হতে রাজি করানো হয়। কামারুজ্জামানকে স্বরাষ্ট্র এবং মনসুর আলীকে অর্থমন্ত্রীর পদ দেওয়া হয়। কর্নেল ওসমানীকে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এভাবেই গঠন করা হয় বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার। বিএসএফের সহযোগিতায় ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুরে সীমান্তবর্তী অখ্যাত বৈদ্যনাথতলা গ্রামে প্রবাসী সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গ্রামটির নতুন নাম দেওয়া হয় 'মুজিবনগর'। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ইউসুফ আলী স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।[৫০]

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এবং ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বাঙালি সদস্যরা যে যেখানে ছিলেন, সেখান থেকেই সুযোগমতো বিদ্রোহ করেন। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে টিকে থাকার মতো সৈন্য, অস্ত্র ও রসদ তাঁদের ছিল না। পিছু হটতে হটতে তাঁরা একে একে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতের ভেতরে চলে যান। পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করেন এরকম একজন সেনা কর্মকর্তা হলেন মেজর মীর শওকত আলী। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

> ২৫ মার্চ থেকে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত কোনো সরকার ছিল না। তখন স্থানে স্থানে সিনিয়র অফিসাররা বিক্ষিপ্তভাবে কমান্ড করেছেন।
>
> তাহলে বলতে হবে, কয়েকজন মেজর ও ক্যাপ্টেন মিলে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছে। সিভিলিয়ানদের মধ্যেও অনেকে ছিল। যেমন সিলেটে কমান্ডার

মানিক নেতৃত্ব দিয়েছেন। কাদের সিদ্দিকী টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু মোটামুটি যুদ্ধটা পরিচালনা করেছে সেনাবাহিনীর সদস্যরা। রাজনৈতিক নেতাদের গুরুত্ব তেমন ছিল না। যারা যুদ্ধ পরিচালনা করেছে, তাদেরই পরে সিনিয়রিটি অনুযায়ী সেক্টর কমান্ডার করা হয়েছে। সিনিয়র ১০ জনকে সেক্টর কমান্ডার করা হলো।

কোনো নিয়মিত মিটিং হতো না। কলকাতার ৮ থিয়েটার রোডে ছিল বাংলাদেশ ফোর্সের হেডকোয়ার্টার। ওখানে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেব এবং রাষ্ট্রপতি নজরুল ইসলাম সাহেব বসতেন, কর্নেল ওসমানীও বসতেন। অন্যান্য বিভাগ তাঁরা পরে খুলেছেন।...ওসমানী সাহেব প্রথম সেক্টর কমান্ডারদের নিয়ে একটি কনফারেন্স করেন। তখন পুরো বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হলো এবং ১০ জন সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ দেওয়া হলো। তারপর আমরা একটা গাইডলাইন নিয়ে চলে এলাম। আমরা ভারতীয় সেক্টর কমান্ডারদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। ভারতীয় সেক্টর কমান্ডার ছিলেন জেনারেল গুরবাগ সিং গিল। প্রথম দিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মাধ্যমেই আমাদের যোগাযোগ করতে হতো। আমাদের কমিউনিকেশন ব্যবস্থা ছিল না। শেষের দিকে আমি একটা সেট পেলাম। তখন মাঝেমধ্যে কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে দু-একটা মেসেজ আদান-প্রদান হয়েছে। তার আগে চিরকুটের মাধ্যমে যোগাযোগ হতো। ভারতীয় সেনাবাহিনী কিছু রসদ দিত। আর রসদের সমস্যা গেরিলাযুদ্ধে সাধারণত হয় না। আমরা যেখানেই যুদ্ধ করতাম, সেখান থেকেই অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতাম। কারণ, পাকিস্তানিরা সব রেখে পালাত।[৫১]

মনি-সিরাজ-রাজ্জাক-তোফায়েল—এই চার যুবনেতা বসে ছিলেন না। ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথতলায় ব্যানার্জি নামের এক ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ হয়। তাঁর মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল সুজন সিং উবানের দেখা হয়। তিনি ছিলেন স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের ইন্সপেক্টর জেনারেল। তাঁকে অপ্রচলিত (গেরিলা) যুদ্ধের একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে দেখা হতো। তাঁকে বাংলাদেশের তরুণদের বিশেষ সামরিক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। জেনারেল উবান স্বাধীনভাবেই তাঁর দায়িত্ব পালন করার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন। তাঁকে জবাবদিহি করতে হতো ভারত সরকারের সচিব রামেশ্বর নাথ কাওয়ের কাছে।[৫২] কাও ছিলেন একই সঙ্গে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এরও (রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং) পরিচালক। সংস্থাটি ১৯৬৮ সালে সিআইএ (যুক্তরাষ্ট্র) এবং এমআই সিক্স (যুক্তরাজ্য)-এর আদলে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। এর প্রথম প্রকল্পটির নাম 'বাংলাদেশ'। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর

যে অসামান্য সাফল্য, তার পেছনে 'র'র অবদান ছিল অনেকখানি।[৫৩]

চার যুবনেতা 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স' (বিএলএফ)-এর প্রশিক্ষণের জন্য সম্পদ ও অবকাঠামোগত সুযোগ খুঁজছিলেন। উবানও খুঁজছিলেন এমন একটি যুবশক্তি। এপ্রিলের শেষে এই যোগাযোগ ঘটল। এ প্রসঙ্গে উবানের বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> গোলযোগের অশান্ত দিনগুলোতে আমরা একদল নিবেদিতপ্রাণ যুবনেতার কথা জানতে পারলাম, যাঁরা বাংলাদেশে বেশ পরিচিত। তাঁরা হলেন শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ। তাঁদের মনে হলো অত্যন্ত অনুপ্রাণিত, করতে অথবা মরতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং বাংলাদেশের ভেতরে ও বাইরে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে তাঁদের নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত ছিল। দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো, অস্থায়ী সরকার এঁদের তেমন মর্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিল না। তাঁরা চাইছিলেন, এঁরা মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে ও যুদ্ধে অংশ নেবে। কিন্তু এই যুবনেতাদের তাতে দৃঢ় আপত্তি ছিল। (মুজিবের প্রতি তাঁদের গভীরতর আনুগত্যের ও নৈকট্যের কারণে তাঁরা সবাই পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে জেল খেটেছেন মুজিবের সঙ্গে) তাঁরা মুজিব বাহিনী নামে অভিহিত হতে পছন্দ করলেন। তাঁরা তাঁদের পুরোনো সহকর্মীদের ক্যাডার হিসেবে বেছে বেছে সত্যায়িত করলেন।...

স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার্স ফোর্সের প্রধান মেজর জেনারেল উবানের সঙ্গে বিএলএফের চার অধিনায়ক (বাঁ থেকে) সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি, তোফায়েল আহমেদ ও আবদুর রাজ্জাক

ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েটের সেক্রেটারি শ্রী আর এন কাও এ সময় আমার ঊর্ধ্বতন সিভিলিয়ান কর্মকর্তা ছিলেন। আওয়ামী লীগের যুব উইংয়ের নেতৃত্ব এবং খোদ সংগঠনটি সম্পর্কে বিস্তারিত গোয়েন্দা তথ্য জানার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। তাঁর গভীর উপলব্ধি ছিল যে, তিনি আমার তত্ত্বাবধানে যে যুবনেতাদের দিয়েছিলেন, কেবল তাঁদের দ্বারাই আসল কাজটি হবে এবং তাঁদের বাংলাদেশের সবচেয়ে স্পর্শকাতর রাজনৈতিক অঞ্চলে কাজ করার জন্য বিশেষ মর্যাদা দেওয়া দরকার। তিনি তাঁদের প্রতি অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রীদের ঈর্ষার কথা জানতেন তাঁদের আপসহীন মনোভাবের জন্য এবং মন্ত্রীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অভিসন্ধির জন্য।[৫৪]

যুবনেতাদের সম্পর্কে উবানের ধারণা ছিল অত্যন্ত উঁচু। বিএলএফের প্রধান দুই নেতা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। শেখ ফজলুল হক মনি সম্পর্কে তিনি বলছেন: 'হালকা-পাতলা গড়নের মানুষটি যেন এক জ্বলন্ত মশাল। তাঁদের স্বাভাবিক নেতা বলে মনে হতো তাঁকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন এবং যেকোনো আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত ছিলেন তিনি।...তোফায়েল ও রাজ্জাক তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। সিরাজও তা করতেন, কিন্তু মাত্র অল্প পরিমাণে। প্রায়ই আলোচনা গরম হয়ে উঠত। সিরাজ অপেক্ষা করতে চাইতেন না। কিন্তু সব সময় তাঁরা একটা টিম হয়ে কাজ করতেন এবং যৌথ নেতৃত্বের ভালো উদাহরণ তুলে ধরতেন।' সিরাজুল আলম খান সম্পর্কে উবানের অভিমত ছিল: 'তিনি র‍্যাডিকেল ধ্যানধারণা পোষণ করতেন। আপসহীন মনোভাবের ছিলেন। যুদ্ধ করতেন বাঘের মতো। কাজ করতেন নিবেদিতপ্রাণ ক্রীতদাসের মতো। একসঙ্গে অনেক দিন তিনি না খেয়ে না ঘুমিয়ে শুধু চায়ের ওপর থাকতে পারতেন।...বক্তৃতা দিতে তিনি পছন্দ করতেন না। কথা এমন বলতেন যে বোঝা যেত তিনি কাজের লোক, কথার নয়। তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীর মতো তিনি কথা বলতেন। তিনি প্রচার অপছন্দ করতেন। মুখ বুজে কাজ করে যেতে চাইতেন। চিরকুমার। বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলার ধরন ছিল আক্রমণাত্মক।...তিনি এমন মানুষ যাঁকে ভালোবাসতে হয়। তিনি আত্মোৎসর্গের প্রতীক। আমার শুধু এই ভয়ই ছিল যে দারিদ্র্যমুক্তির পথের ধীরগতিতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারবেন না এবং হয়তো রূঢ় ও অগ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে অপ্রিয় হয়ে যাবেন।'[৫৫]

বিএলএফের (তখনো মুজিব বাহিনী নামকরণ হয়নি) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছিল উবানের সরাসরি তত্ত্বাবধানে স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের

(এসএফএফ) একদল প্রশিক্ষকের হাতে। এর দুটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র ছিল, একটা দেরাদুনের চাকরাতা, অন্যটি আসামের হাফলং। প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করার জন্য চারটি ট্রানজিট ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। এগুলোর অবস্থান ছিল দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ব্যারাকপুর। আঞ্চলিক অধিনায়ক ছিলেন তোফায়েল আহমেদ। তাঁর সহকারী ছিলেন নূরে আলম জিকু। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ট্রানজিট ক্যাম্প ছিল জলপাইগুড়ির কাছে পাংগা নামক স্থানে। এই অঞ্চলের অধিনায়ক ছিলেন সিরাজুল আলম খান। তাঁর সহকারী ছিলেন মনিরুল ইসলাম। মধ্যাঞ্চলের ক্যাম্প ছিল মেঘালয়ের তুরা শহরে। এই অঞ্চলের অধিনায়ক ছিলেন আবদুর রাজ্জাক। তাঁর সহকারী ছিলেন সৈয়দ আহমদ। পূর্বাঞ্চলের (ঢাকাসহ) ক্যাম্প ছিল আগরতলায়। এই অঞ্চলের অধিনায়ক ছিলেন শেখ ফজলুল হক মনি। সহকারী ছিলেন আ স ম আবদুর রব। কাজী আরেফ ছিলেন বিএলএফের গোয়েন্দা-প্রধান। বিএলএফের পক্ষ থেকে প্রবাসী সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার কাজটি করতেন শাজাহান সিরাজ। চার যুবনেতা নিজেদের নতুন নামকরণ করলেন। তাঁরা নতুন নামেই অনেক জায়গায় নিজেদের পরিচয় দিতেন। নামগুলো সংক্ষেপে ছিল মনোজ (মনি), সরোজ (সিরাজ), রাজু (রাজ্জাক) ও তপন (তোফায়েল)। বিএলএফের চার আঞ্চলিক অধিনায়ককে লে. জেনারেলের মর্যাদা ও প্রটোকল দেওয়া হয়েছিল।[৫৬]

প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করা হতো মূলত ছাত্রলীগের সদস্যদের মধ্য থেকে। এ ছাড়া শ্রমিক লীগের অনেক সদস্যকেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হয় মে মাসের শেষ সপ্তাহে এবং তা একটানা চলে অক্টোবর পর্যন্ত। প্রশিক্ষণ ছিল ছয় সপ্তাহের। প্রশিক্ষণে হালকা ও মাঝারি অস্ত্র চালনা, বিস্ফোরক তৈরি ও পরিকল্পনা—এই তিনটি বিষয়েই গুরুত্ব দেওয়া হয়। মোট কতজন প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন, তার সঠিক হিসাব জানা যায়নি। উবানের হিসাবমতে সংখ্যাটি ১০ হাজার।[৫৭] প্রকৃত সংখ্যাটি ছিল সাত হাজার। নির্দেশ ছিল, প্রশিক্ষণ শেষে দেশের ভেতরে গিয়ে প্রত্যেক সদস্য আরও ১০ জনকে প্রশিক্ষণ দেবেন এবং এভাবেই ৭০ হাজার সদস্যের একটি যোদ্ধা বাহিনী গড়ে উঠবে। দেশের ভেতরে গিয়ে ছাত্রলীগের কর্মীদের খুঁজে বের করা, চারটি বেইস ক্যাম্প চালানো, প্রশিক্ষণার্থীদের বেইস ক্যাম্পে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা ইত্যাদির খরচ মেটানোর জন্য ৭৬ লাখ টাকার একটা বাজেট তৈরি করে উবানের হাতে দেওয়া হয়। বরাদ্দ হয়েছিল ৭০ লাখের কিছু বেশি। কয়েক কিস্তিতে টাকাটা দেওয়া হয়।[৫৮]

সহযোদ্ধা পরিবেষ্টিত বিএলএফের অন্যতম অধিনায়ক সিরাজুল আলম খান

অস্ত্র চালনার পাশাপাশি রাজনৈতিক মতাদর্শের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছিল। ছাত্রলীগের চারজন নেতাকে প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত রাজনৈতিক পাঠ দেওয়ার জন্য বাছাই করা হয়। তাঁরা হলেন হাসানুল হক ইনু, শরীফ নুরুল আম্বিয়া, আ ফ ম মাহবুবুল হক ও মাসুদ আহমেদ রুমি। তাঁরা সবাই ছিলেন সিরাজপন্থী।

আওয়ামী লীগের নেতারা প্রথাগত সরকার-পদ্ধতির বাইরে অন্য কিছু ভাবার অবকাশ পাননি। তাঁদের অনেকেই মনে করতেন, দলের মধ্যকার 'চরমপন্থী যুবকদের হঠকারী কার্যকলাপের' ফলেই তাঁদের ভারতের মাটিতে এত কষ্ট করতে হচ্ছে। এ জন্য তাঁরা বিএলএফের ব্যাপারে খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন। সেক্টর কমান্ডাররা, যাঁরা অস্থায়ী সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন, বিএলএফের ব্যাপারে তাঁদেরও অনেক ক্ষোভ ছিল। তাঁরা যুবকদের জন্য যাঁর যাঁর সেক্টরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের হাতে সম্পদ ছিল অপ্রতুল। অন্যান্য অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ছিল না বললেই চলে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা পাঁচ-ছয় দিনের একটা মামুলি প্রশিক্ষণের পর

তরুণদের নামমাত্র অস্ত্র দিয়ে দেশের ভেতরে পাঠিয়ে দিতেন। তাঁরা চেয়েছিলেন বিএলএফ আলাদা বাহিনী হিসেবে না থেকে তাঁদের কমান্ডে থাকুক। তাঁরা এটা বুঝতে অক্ষম ছিলেন যে বিএলএফ প্রথাগত সেনাবাহিনী নয়, এটা একটা রাজনৈতিক সংগঠন। তাজউদ্দীন বিএলএফের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু তিনি না পারতেন এদের তাঁর নিয়ন্ত্রণে আনতে, না পারতেন এদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে। তিনি ভালো করেই জানতেন, বিএলএফ ছিল শেখ মুজিবের নির্দেশিত একটি 'অপশন'। এ প্রসঙ্গে এক আলাপচারিতায় আবদুর রাজ্জাক বলেছিলেন :

> ১৮ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু আমাদের চারজন—মনি ভাই, সিরাজ ভাই, আমি আর তোফায়েলকে ডাকলেন। ব্রিফিং দিলেন : 'ওরা আমাদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেবে না, তোমাদের প্রস্তুতি সংঘবদ্ধ করো, সশস্ত্র বিপ্লব করে দেশ স্বাধীন করতে হবে।' তাজউদ্দীন ভাই একা উপস্থিত ছিলেন। আরও বললেন, 'আমি না থাকলে এই তাজউদ্দীন হবে তোমাদের নেতা।'[৫৯]

বেশ কিছু জায়গায় মুক্তিবাহিনী ও বিএলএফের সদস্যদের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝি ও সংঘর্ষ হয়। এটা উল্লেখ করা দরকার যে, বিএলএফের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর (ফ্রিডম ফাইটার বা এফএফ নামে পরিচিত) এবং বিভিন্ন সেক্টরে যুদ্ধরত বাঙালি সৈনিকদের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত প্রধানত ২ নম্বর সেক্টরেই লক্ষ করা যায়। বিএলএফের পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক শেখ ফজলুল হক মনির সঙ্গে মেজর খালেদ মোশাররফের বাহিনীর কোনো বোঝাপড়া ছিল না। মনি ছিলেন তাজউদ্দীন সরকারের প্রচণ্ডরকম বিরোধী। তাঁর অভিযোগ ছিল, খালেদ তাঁর সেক্টরে বামপন্থী ছাত্রদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিচ্ছেন। দেশের অন্য তিনটি অঞ্চলে এ ধরনের কোনো সংঘাত ছিল না। সেসব অঞ্চলে তাঁরা সবাই পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে কাজ করতেন। দেখা গেছে, অনেক জেলায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধান নেতা ছিলেন বিএলএফের কমান্ডার। খুলনা, যশোর, বগুড়া, রংপুর—এসব জেলায় বিএলএফের জেলা ও মহকুমা কমান্ডাররা সব মুক্তিযোদ্ধারই নেতৃত্ব দিয়েছেন। সেসব জেলায় মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কোনো বিভাজন ছিল না।[৬০]

২ নম্বর সেক্টরে ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের বাহিনীর সঙ্গে বিএলএফের একটি দলের সংঘর্ষ হয়েছিল। বিষয়টি সুরাহা করার জন্য আওয়ামী লীগের নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী আইনউদ্দিনের কাছে গেলে তিনি বাংলাদেশ সরকারের একটা চিঠি দেখান। চিঠিতে লেখা ছিল, 'আমাদের সরকারি বাহিনীর অনুমতি ছাড়া কেউই সশস্ত্র অবস্থায় দেশের ভেতরে যেতে পারবে

না।'[৬১] এ ব্যাপারে উবানের সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক লে. জেনারেল অরোরার কথা হয়। সিদ্ধান্ত হয়, সীমান্তের ভেতরে ২০ মাইল পর্যন্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনী কার্যকর থাকবে এবং বিএলএফ দেশের অভ্যন্তরে দায়িত্ব পালন করবে। দেশের ভেতরে যাতায়াতের জন্য সীমান্তে বিএলএফের সদস্যরা নির্দিষ্ট কয়েকটা করিডর ব্যবহার করবেন।[৬২]

বামপন্থীদের ব্যাপারে প্রবাসী সরকারের উৎকণ্ঠা ছিল। বামপন্থীদের অভিযোগ ছিল, বিভিন্ন সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বামপন্থী, বিশেষ করে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। বিএলএফের নেতারাও সতর্ক ছিলেন, যাতে বামপন্থীরা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র না পায়। এ বিষয়ে জেনারেল উবান তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন, যা বিএলএফের নেতাদের কট্টর বাম-বিরোধিতার উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। নিম্নবর্ণিত কথোপকথন থেকে বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

> যুবনেতাগণ: স্যার, আমরা আশা করিনি আপনারা নকশালপন্থী ও মার্ক্সবাদীদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রপাতি দেবেন, যাতে আমরা গত ২৫ বছরে যা অর্জন করেছি তা বরবাদ হয়ে যায়।
>
> উবান: আপনারা এসব কী বলছেন?
>
> যুবনেতাগণ: আপনি বলতে চান আপনি জানেন না যে নকশালপন্থীদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রপাতি দেওয়া হচ্ছে...(একটা জায়গার নাম বলে) জায়গায় এবং ভারতীয় কর্মকর্তারা তাঁদের নেতাদের প্রথম শ্রেণির ভারতীয় হোটেলে রাখছেন ও তাঁদের সঙ্গে গল্পগুজব করছেন।
>
> উবান: আমি এমন আজগুবি কথা আগে শুনিনি। আমি সব সময় ভেবেছি, শত্রুর দালাল আমাদের মধ্যে ভাঙন ধরাবে। এখন বলেন, আপনাদের মধ্যে এসব গুজব কারা ছড়াচ্ছে?
>
> যুবনেতাগণ: আমরা আমাদের নিজেদের চোখে দেখেছি এবং নিজেদের কানে শুনেছি। আমাদের মন ভেঙে গেছে। দয়া করে খবর নিন এবং আমাদের আপনার সরকারের পলিসি জানান। রাশিয়াপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির কথা না হয় বোঝা যায়, তারা পুনর্গঠিত হলে যা-কিছু হোক কেবল কাগজে-কলমে বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু চীনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি?

জেনারেল উবান যুবনেতাদের মনোভাব আর এন কাওকে জানালেন। কাও উবানকে অবাক করে দিয়ে বললেন যে বাস্তবিকই মওলানা ভাসানীর লোকজন কোনো এক স্থানে প্রশিক্ষণ পাচ্ছে। অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের ইচ্ছার

বিরুদ্ধে কিছুই করা হচ্ছে না। তাঁরা ভাসানীর লোকদের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মস্ত সম্পদ হিসেবে দেখছেন। কাও উবানকে পরামর্শ দিলেন, 'দয়া করে আপনার যুবনেতাদের বলুন যে পছন্দ না করলেও এটা তাদের গিলতে হবে। আমরা তাদের সমর্থন দেব শুধু সামগ্রিক প্রকল্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে, একটা স্বাধীন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে নয়।' উবান যুবনেতাদের বললেন যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুত এমন সবাইকে সাহায্য করছে তাদের নিজেদের অস্থায়ী সরকারের সুপারিশ অনুযায়ী। কিছু অবাঞ্ছিত লোক এর সুযোগ নিতে পারে এবং এ কারণে তাদের দ্বিগুণ সতর্ক থাকতে হবে।[৬৩]

৯ আগস্ট ভারত সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ২০ বছর মেয়াদি একটি 'শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা' চুক্তি স্বাক্ষর করে। এরপর ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ছাত্র ইউনিয়ন, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির (মণি সিংহ) সদস্যদের জন্য আলাদা সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। আসামের তেজপুরে কয়েকটি ব্যাচে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রথম তিনটি ব্যাচে নেতৃত্ব দেন গোলাম মোর্তুজা, মনজুরুল আহসান খান ও ইয়াফেস ওসমান। অথচ এর আগে তাঁদের অনেকেই মাসের পর মাস আগরতলার ক্রাফট হোস্টেল ও অন্যান্য জায়গায় প্রশিক্ষণের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সুযোগ এল অনেক পরে, সেপ্টেম্বরে।[৬৪]

পিকিংপন্থীদের ব্যাপারে বিএলএফের বিরূপ মনোভাবের কারণ ছিল ঐতিহাসিক। পিকিংপন্থীরা ছয় দফাকে সিআইএর দলিল বলে প্রচার করেছিল। আইয়ুব ও ইয়াহিয়ার সঙ্গে তাদের সখ্য ছিল অনেকটা প্রকাশ্য। চীনের পররাষ্ট্রনীতির অন্ধ অনুসরণ করতে গিয়ে তারা অনেক ক্ষেত্রে বাঙালির জাতীয় মুক্তির প্রশ্নটিকে শুধু পাশ কাটিয়ে যায়নি, এর বিরুদ্ধে সচেতনভাবে কাজও করেছিল। তাদের একটি অংশ পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যকার লড়াইকে বলেছিল 'কুকুরে-কুকুরে কামড়াকামড়ি'।

বিএলএফকে সে সময় অনেকেই 'র'র সৃষ্টি এবং এর সঙ্গে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর যোগাযোগ আছে বলে মনে করতেন। কিন্তু পুরো বিষয়টাই ছিল ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে। বিএলএফ ভারতের তৈরি বাহিনী হিসেবে প্রচার পায়। ভারতে তাদের আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয় এবং তাদের বাংলাদেশ সরকারের সেনাবাহিনীর কমান্ডের বাইরে রাখা হয়। এর নেতারা প্রয়োজনে যে কারও সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁদের কোনো শুচিবাই ছিল না। এ প্রসঙ্গে তাঁরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়

ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামে সুভাষচন্দ্র বসুর কর্মপন্থার উদাহরণ টেনে বলতেন, ওই সময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ছিল ভুল। বিএলএফকে অনেক বাম রাজনীতিক নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখলেও এর সদস্যদের আন্তরিকতা ও দেশপ্রেম ছিল প্রশ্নাতীত। প্রকৃতপক্ষে গুটি কয়েক নেতার কথা বাদ দিলে বিএলএফের সাধারণ সদস্যরা জানতেনই না কীভাবে তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। তাঁদের শুধু এটুকু ধারণা দেওয়া হয়েছিল, স্বয়ং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে তাঁদের বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে একটা দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জনের জন্য। ছাত্রলীগের প্রথম সারির নেতা-কর্মীদের এই বাহিনীর আওতায় আনা হয়েছিল, যাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন সিরাজপন্থী, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত। এমনকি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান দুই নেতার দুই ছেলে বিএলএফের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ছেলে শেখ জামাল এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের ছেলে সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম।[৬৫]

ছাত্রলীগের নেতাদের মধ্যে যাঁরা বিএলএফের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ছাত্রলীগের সভাপতি ও ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী।

অক্টোবরে বিএলএফের জেলা পর্যায়ের প্রতিনিধিসহ প্রায় ৭৩ জন নেতার সম্মেলন হয় দেরাদুনের পাশে কালশিতে। এটা ছিল একটা অস্থায়ী প্রশিক্ষণকেন্দ্র। বিএলএফের নেতারা জানতেন, শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে তাঁরা একটা বিশেষ ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। জয়লাভের পর তাঁদের নেতা শেখ মুজিব অনুপস্থিত থাকবেন, এটা যদিও কারও কাম্য ছিল না, তবু সে রকম একটা আশঙ্কা থেকে ওই সম্মেলনে কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়। শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্র থেকে সম্ভাব্য যে আক্রমণগুলো আসতে পারে, তা বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ রাজনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্মেলনে সবাই একমত হন। মাসব্যাপী সামরিক প্রশিক্ষণের সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনা শেষে সিরাজুল আলম খান এবং শেখ মনির মধ্যে মতৈক্য হয়। পারিপার্শ্বিকতার কারণে অনেক কিছুরই সমাধান হয়ে যায়। সিদ্ধান্ত হয়, সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা বাস্তবায়নের লড়াই যে দর্শনকে কেন্দ্র করে, তাকে শেখ মুজিবের নামে পরিচিতি দিতে হবে এবং এই দর্শনকে 'মুজিববাদ' হিসেবে প্রচার করা হবে। এ ছাড়া বিএলএফের নাম বদলে 'মুজিব বাহিনী' রাখা হয়।[৬৬]

বিএলএফ নিয়ে প্রবাসী সরকারের মধ্যে তখনো বিতর্ক বন্ধ হয়নি। তাঁদের অনেকের মধ্যে একটা সহজাত কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা কাজ করত। তাঁরা চাইছিলেন, সবকিছু তাঁদের নিয়ন্ত্রণে থাকুক। তাজউদ্দীন আহমদ, কর্নেল ওসমানী, লে. জেনারেল অরোরা—কেউ এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল স্যাম মানেকশ মন্তব্য করেছিলেন, 'এখন আমার দুটি ফাইটিং কমান্ড হলো। স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স (এসএসএফ) একটি কমান্ডো বাহিনী হিসেবে এবং মুজিব বাহিনী একটি গেরিলাবাহিনী হিসেবে।' তিনি তাজউদ্দীনকে বলেছিলেন, তিনি নিজে এই বাহিনী গড়ে তুলেছেন সেনাবাহিনীর পক্ষে বিশেষ কাজ সম্পন্ন করার জন্য। স্যাম মানেকশ বিএলএফের সদস্যদের 'স্যাম'স বয়েজ' নামে ডাকতেন।[৬৭]

২১ নভেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার অধীনে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ বাহিনী গঠন করা হয়। ডিসেম্বরের ৩ তারিখ বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ডের আওতায় মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ সীমান্তের ভেতরে প্রবেশ করতে শুরু করে। কিন্তু তার আগেই, ৩ নভেম্বর জেনারেল উবানের নেতৃত্বে এসএসএফ পার্বত্য চট্টগ্রামে 'অপারেশন ঈগল' শুরু করে। এসএসএফের সঙ্গে যুক্ত হয় শেখ মনির নেতৃত্বাধীন মুজিব বাহিনীর একটি দল।[৬৮]

৬ ডিসেম্বর ভারতের লোকসভায় বক্তৃতা করতে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।[৬৯]

১৫ ডিসেম্বর সকাল থেকে ভারতীয় বাহিনীর পক্ষে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের সামরিক কমান্ডকে উদ্দেশ করে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের আহ্বান জানানো হচ্ছিল। পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার জেনারেল নিয়াজির সামনে তখন আর কোনো পথ খোলা ছিল না। তিনি আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেন। ১৬ ডিসেম্বর বিকেল পাঁচটা এক মিনিটে (ভারতীয় সময় চারটা ৩১ মিনিটে) নিয়াজি আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। মুক্তিবাহিনীর প্রধান কর্নেল ওসমানী আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। 'কেউ একজন নৈতিক ভুলটা করে বাংলাদেশ আর্মির সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করার একটা ঐতিহাসিক সুযোগ নষ্ট করেছিল।'[৭০]

পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী থেকে বিদ্রোহ করে আসা সৈনিকেরা ছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান শক্তি। তাঁরা অধিকাংশই যুদ্ধ করেছেন

ভারতের মাটিতে অবস্থিত বিভিন্ন শিবিরে থেকে। যুদ্ধের পর তাঁদের অনেকে প্রচণ্ড ভারতবিরোধী মনোভাব নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। তবে ব্যতিক্রমও ছিল। মুক্তিযুদ্ধে ১ নম্বর সেক্টরের প্রধান এবং পরবর্তী সময়ে জেড ফোর্সের অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমান ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং এ জন্য তাঁর গর্ব ছিল। সাপ্তাহিক *বিচিত্রায়* প্রকাশিত তাঁর একটি লেখার অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

> খেমকারান রণাঙ্গনের বেদিয়ানে তখন আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। সেখানে আমাদের ব্যাটেলিয়ান বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।...বহুসংখ্যক প্রতিপক্ষকে হতাহত করে, যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটক করে এই কোম্পানী অর্জন করেছিল সৈনিকসুলভ মর্যাদা। যুদ্ধবিরতির সময় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সুযোগে আমি দেখা করেছিলাম বেশ কিছুসংখ্যক ভারতীয় অফিসার ও সৈনিকের সঙ্গে। আমি তখন তাদের সাথে কোলাকুলি করেছি, হাত মিলিয়েছি। আমার ভালো লাগত তাদের সঙ্গে হাত মেলাতে। কেননা আমি তখন দেখেছিলাম, তারাও অত্যন্ত উঁচু মানের সৈনিক। আমরা তখন মতবিনিময় করেছিলাম। সৈনিক হিসেবেই আমাদের মাঝে একটা হৃদ্যতাও গড়ে উঠেছিল, আমরা বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলাম। এই প্রীতিই দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে পাশাপাশি ভাই-এর মতো দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে আমাদের।[৭১]
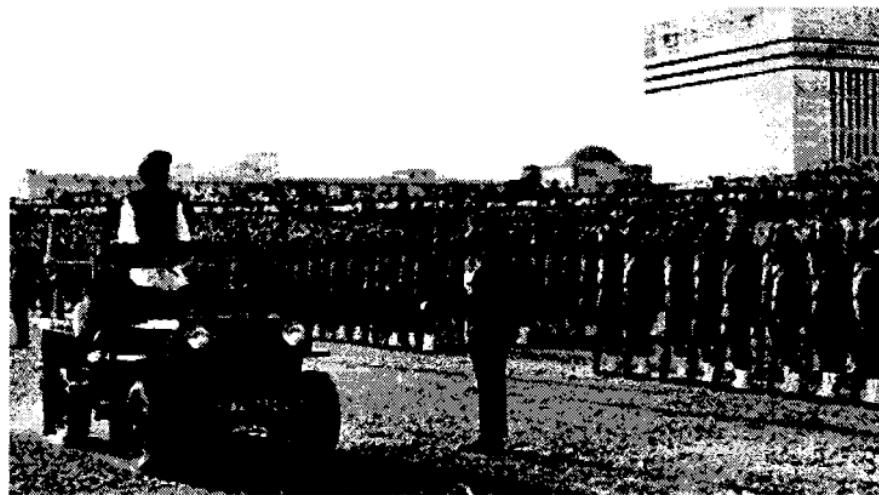
যুদ্ধ শেষে একটা বিষয় প্রচার পেয়েছিল যে, ভারতের সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার একটি গোপন চুক্তি করেছে। প্রবাসী সরকারের দিল্লি মিশনের প্রধান এবং পরে রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী এ বিষয়ে তাঁর স্মৃতি থেকে বলেছেন :

> ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকারের সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এক লিখিত চুক্তিতে, প্যাক্ট নয়, এগ্রিমেন্টে আসে। ওই চুক্তি বা এগ্রিমেন্ট অনুসারে দুই পক্ষ কিছু প্রশাসনিক, সামরিক ও বাণিজ্যিক সমঝোতায় আসে।...সামরিক সমঝোতা হলো : বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে।...বাংলাদেশের নিজস্ব কোনো সেনাবাহিনী থাকবে না। অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মুক্তিবাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারা মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে।
>
> ওই লিখিত সমঝোতাই হচ্ছে বাংলাদেশে রক্ষীবাহিনীর উৎস। আর ভারত-পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধবিষয়ক সমঝোতাটি হলো : যুদ্ধে অধিনায়কত্ব করবেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান এবং যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়কত্বে থাকবে।...

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা সফরে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ কথাবার্তার মাঝে প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে অপ্রস্তুত করে দিয়ে বলেন, 'আমার দেশ থেকে আপনার সেনাবাহিনী ফিরিয়ে আনতে হবে।' শেখ মুজিব এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এত সহজভাবে তুলতে পারেন, ভাবতেও পারেননি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী। তাঁর অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগ নিয়ে শেখ মুজিব নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন, 'এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর আদেশই যথেষ্ট।' অস্বস্তিকর অবস্থা কাটাতে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে রাজি হতে হয় এবং (তিনি) জেনারেল মানেকশকে বাংলাদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের দিনক্ষণ নির্ধারণের নির্দেশ দেন।...

ভারত সরকারের সঙ্গে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গৃহীত এই পুরো ব্যবস্থাকেই অগ্রাহ্য করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ কারণে আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ বাংলাদেশ পাকিস্তানি সৈন্যমুক্ত হয় মাত্র। কিন্তু স্বাধীন, সার্বভৌম হয় ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারিতে, যেদিন শেখ মুজিব পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্ত হয়ে ঢাকায় আসেন। বস্তুত, শেখ মুজিব ছিলেন প্রকৃত সাহসী ও খাঁটি জাতীয়তাবাদী।[৭২]

বাহাত্তরের মার্চ মাসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বশেষ দলটি ঢাকা ছেড়ে যায়। ১২ মার্চ ভারতীয় বাহিনীর একটি দল ঢাকা স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে শেখ মুজিবকে বিদায়ী 'গার্ড অব অনার' দেয়। 'বাংলাদেশ-ভারত গোপন চুক্তির' শেষ এখানেই।

১২ মার্চ ১৯৭২। ঢাকা স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিদায়ী 'গার্ড অব অনার' দিচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি দল

তথ্যনির্দেশ

১. Karim, S. A., (2009). *Sheikh Mujib—Triumph and Tragedy*, UPL, Dhaka, p. 135.

২. Karim, p. 136.

৩. খন্দকার আবদুল মালেক ও সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আলাপচারিতা। খন্দকার আবদুল মালেক ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি হিসেবে ওয়ার্কিং কমিটির সভায় উপস্থিত ছিলেন।

৪. মিয়া, এম এ ওয়াজেদ (১৯৯৩), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ*, ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ২৪-২৫।

৫. আলী, সৈয়দ মোদাচ্ছের (১৯৯১), *স্মৃতিতে অম্লান ষাট দশকের ছাত্ররাজনীতি*, নাজমুন্‌নেছা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃ. ৬০।

৬. আলী, পৃ. ১০৮।

৭. রব, আ স ম আবদুর (২০০৬), 'মুক্তিযুদ্ধের নিউক্লিয়াস', মহিউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত *আমাদের একাত্তর* গ্রন্থে সংকলিত, সিডিএল, ঢাকা, পৃ. ৭।

৮. আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে আলাপচারিতা।

৯. ওই।

১০. তৃতীয় মাত্রা, চ্যানেল আই, ৪ এপ্রিল ২০০১। ইউটিউব থেকে সংকলিত, সুমন মাহমুদের সৌজন্যে পাওয়া।

১১. সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।

১২. রব, পৃ. ৬-৮।

১৩. সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।

১৪. রব, পৃ. ১০-১১।

১৫. রেজাউল হক মুশতাকের সঙ্গে আলাপচারিতা।

১৬. ইসলাম, মনিরুল (২০১৩), *জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সমাজতন্ত্র*, জ্যা পাবলিকেশনস, ঢাকা, পৃ. ৯৬।

১৭. রব, পৃ. ১০-১১।

১৮. রব, পৃ. ১১।

১৯. সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।

২০. *ইত্তেফাক*, ১৯ জানুয়ারি ১৯৭০।

২১. ইসলাম, মনিরুল (২০১৩), পৃ. ১২৭-১২৯।

২২. রফিকুল ইসলামের সঙ্গে আলাপচারিতা।

২৩. রব, পৃ. ১০-১১।

২৪. ইসলাম, মনিরুল (২০১৩), ঢাকা, পৃ. ১২৯।

২৫. ফজলুর রহমান বাবুলের সঙ্গে আলাপচারিতা।

২৬. হোসেন, শেখ মোহাম্মদ জাহিদ (২০০২), *মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রলীগ ও বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (বিএলএফ)*। অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৪৬।

২৭. রব, পৃ. ১০-১১।

২৮. বেগম, সাহিদা (২০০০), *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা—প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

২৯. কাজী আরেফ আহমেদ ও মনিরুল ইসলামের সঙ্গে আলাপচারিতা; ইসলাম, মনিরুল (২০১৩), পৃ. ১৩৪, ১৮৩; আহমেদ, কাজী আরেফ (২০১৪), *বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র*, ইন্টারন্যাশনাল হিস্টোরিক্যাল নেটওয়ার্ক, ঢাকা, পৃ. ৭০।

৩০. রব, পৃ. ১৩।

৩১. আ ফ ম মাহবুবুল হক ও বদিউল আলমের সঙ্গে আলাপচারিতা।

৩২. কাজী আরেফ আহমেদ ও মনিরুল ইসলামের সঙ্গে আলাপচারিতা।

৩৩. লেখক এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

৩৪. Blood, Archer K. (2006), *The Cruel Birth of Bangladesh—Memoirs of an American Diplomat*, UPL, Dhaka, p. 128.

৩৫. Chowdhury, G. W (1994). *The Last Days of United Pakistan*, UPL, Dhaka, p. 129.

৩৬. করিম, নেহাল ও অন্যান্য সম্পাদিত (২০০৯), *আহমদ শরীফের ডায়েরি: ভাব-বুদ্বুদ*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১১৫।

৩৭. রায়হান ফেরদৌস মধুর সঙ্গে আলাপচারিতা।

৩৮. তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৫), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র*, পঞ্চদশ খণ্ড, ড. কামাল হোসেনের সাক্ষাৎকার, পৃ. ২৭৭।

৩৯. Matinuddin, Kamal (Lt. Gen), *Tragedy of Errors—East Pakistan Crisis 1968-1971*. Wajidalis, Lahore, p. 245.

৪০. মিয়া, পৃ. ৭৬।

৪১. কামরুল আলম খান খসরু ও মোস্তফা মহসীন মন্টুর সঙ্গে আলাপচারিতা।

৪২. Matinuddin, p. 247-248.

৪৩. তথ্য মন্ত্রণালয় (১৯৮৫), আমীর-উল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, পৃ. ১০০-১০৬।

৪৪. ওই, পৃ. ১০৭।

৪৫. সিরাজুল আলম খান, কাজী আরেফ আহমেদ ও মনিরুল ইসলামের সঙ্গে আলাপচারিতা।

৪৬. Karim, p. 208.

৪৭. তথ্য মন্ত্রণালয়, আমীর-উল ইসলামের সাক্ষাৎকার, পৃ. ১০৯।

৪৮. Karim, p. 208.

৪৯. তথ্য মন্ত্রণালয়, আমীর-উল ইসলামের সাক্ষাৎকার, পৃ. ১১৪-১১৫।
৫০. Karim, p. 209.
৫১. আলী, লে. জেনারেল মীর শওকত (২০০৬), 'যুদ্ধের কথা কষ্টের কথা', মহিউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত *আমাদের একাত্তর* গ্রন্থে সংকলিত, পৃ. ৪৩।
৫২. সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৫৩. Riana, Ashok (1981), *Inside Raw—the Story of India's Secret Service*, Vikas Publishing House, New Delhi, p. 49.
৫৪. উবান, মেজর জেনারেল (অব.) এস এস (২০০৫), *ফ্যান্টমস অব চিটাগং—দ্য 'ফিফথ আর্মি' ইন বাংলাদেশ*, ঘাস ফুল নদী, ঢাকা, পৃ. ২০-২১।
৫৫. উবান, পৃ. ২১-২৩।
৫৬. সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৫৭. উবান, পৃ. ৪২।
৫৮. সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৫৯. তৃতীয় মাত্রা, প্রাগুক্ত।
৬০. সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৬১. চৌধুরী, মিজানুর রহমান (২০০১), *রাজনীতির তিনকাল*, হাফেজ মাহমুদা ফাউন্ডেশন, ঢাকা, পৃ. ১২৫।
৬২. উবান, পৃ. ৪১।
৬৩. উবান, পৃ. ৩৩-৩৫।
৬৪. মুহাম্মদ হিলালউদ্দিনের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৬৫. উবান, পৃ. ২৬।
৬৬. ইসলাম, মনিরুল (২০১৩), পৃ. ১৯৩।
৬৭. উবান, পৃ. ৬২।
৬৮. উবান, পৃ. ৮৪।
৬৯. Gandhi, Indira (1972). *India and Bangladesh : Selected Speeches and Statements: March to December 1971*, Orient Longman, New Delhi, p. 133.
৭০. উবান, পৃ. ১২০।
৭১. রহমান, মেজর জেনারেল জিয়াউর (১৯৮১), 'একটি জাতির জন্ম', *বিচিত্রা*, ১০ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৫ জুন ১৯৮১, ঢাকা।
৭২. হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার। ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৯ সালে সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন লেখক-সাংবাদিক মাসুদুল হক। এটি উদ্ধৃত হয়েছে রইসউদ্দিন আরিফ (২০১০), *বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিকথা* (পরিশিষ্ট ২), পাঠক সমাবেশ, ঢাকা থেকে।

উত্থান

একাত্তরের ২২ ডিসেম্বর প্রবাসী সরকারের নেতারা কলকাতা থেকে ঢাকায় এলেন। আগের দিন, ২১ ডিসেম্বর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ এক সংবাদ সম্মেলনে স্বাধীনতাসংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব দেন।[১] তাঁর এ বক্তব্য নিয়ে কিছুটা হইচই পড়ে যায়। আওয়ামী লীগ ছাড়া বাংলাদেশের আর কোনো দাবিদার আছে, এটা অনেকেই ভাবতে পারতেন না। ২৩ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের সমাজসেবা সম্পাদক কে এম ওবায়দুর রহমান সংবাদ সম্মেলন ডেকে বললেন, এই মুহূর্তে বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই; এটা মানুষকে শুধু বিভ্রান্ত করবে।[২] ২৫ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গভবনে এক সংবাদ সম্মেলন করেন। প্রস্তাবিত জাতীয় সরকার সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন, নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি 'জাতীয় সরকার'ই গঠিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, পাঁচদলীয় উপদেষ্টা কমিটি বৈধ থাকবে এবং কমিটির সব সদস্য ঢাকায় ফিরে এলে এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।[৩] ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন ২৮ ডিসেম্বর আরেকটা সংবাদ সম্মেলন ডাকেন। তাঁর দলের সভাপতির দেওয়া জাতীয় সরকারের প্রস্তাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার শর্ত হিসেবে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। তাঁদের দল সরকারে থাকুক আর না-ই থাকুক, সরকারের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবে। তিনি মন্তব্য করেন, সব সংগ্রামী শক্তিকে আস্থায় নেওয়া এবং তাদের কাজে লাগানো দরকার এবং একটি জাতীয় সরকারই কাজটি করতে পারে। সংগ্রামী শক্তি

বলতে তিনি আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, মওলানা ভাসানীর দল ও বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস—এ পাঁচটি দলের নাম উল্লেখ করেন।[৪]

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণ করার আহ্বান জানালেন। কিন্তু তাঁর সে আহ্বানে বিশেষ কোনো কাজ হলো না। অনেকেই তখন প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করছেন। বাড়ি-গাড়ি-দোকান-অফিস দখল চলছে। মুজিব বাহিনীর সদস্যদের ওপর অস্ত্র জমা দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। এ নিয়ে তাজউদ্দীনের সঙ্গে মুজিব বাহিনীর নতুন করে তিক্ততা শুরু হয়। শেখ ফজলুল হক মনি ব্যাপারটা নিয়ে তাজউদ্দীনের বিরুদ্ধে রীতিমতো প্রচারে নামলেন। জেনারেল উবান তখন ঢাকায়। তাঁর বর্ণনায় বিষয়টি এভাবে উঠে এসেছে :

> তিনি (মনি) আমার কাছে অভিযোগ করলেন যে, তাজউদ্দীন যে পলিসি নিয়েছেন তা, তাঁর মতে, ক্ষমতায় থাকার জন্য ও বামপন্থী বাহিনীসমূহ গড়ে তোলার জন্য। তিনি এমনকি আমাকে কিছু সশস্ত্র কমিউনিস্ট যুবককে দেখালেন [যারা] হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের করিডরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের মাথায় কালো কাপড়ের ব্যান্ড বাঁধা।
>
> অস্ত্রসংক্রান্ত এই প্রশ্নে শ্রী ডি পি ধর ও মনির মধ্যে অত্যন্ত কড়া বাক্যবিনিময়ের আমি ছিলাম একজন সাক্ষী। মনি শ্রী ধরকে বলেছিলেন, শেখ মুজিব ঢাকায় না পৌঁছানো পর্যন্ত তাঁরা অস্ত্র জমা দেবেন না এবং তেমন প্রয়োজন হলে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেবেন। এই সময় মনি যে সাহস দেখিয়েছিলেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। শ্রী ধর যে মুষড়ে পড়েছিলেন তা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। মনি পরে আমাকে বলেছিলেন, তিনি নিশ্চিত যে শ্রী ধর তাঁর দেশের সবচেয়ে বড় শত্রু। পরে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কে এর প্রভাব পড়েছিল। এটা খুবই জানা কথা যে, শেখ মুজিব ক্ষমতা নেওয়ার পর তাঁর সরকারের কাছে শ্রী ধর একজন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হয়ে পড়েছিলেন। একপর্যায়ে বাংলাদেশ তাঁকে ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল। শ্রীমতী গান্ধী ব্যাপারটা মিটমাট করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কারণ, তিনি বাংলাদেশের জন্য যা করেছিলেন, তার জন্য শেখ মুজিব তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন।[৫]

সিরাজপন্থী ছাত্রলীগের একদল কর্মী একাত্তরের ডিসেম্বরের শেষ দিকে পুরান ঢাকার র‍্যাংকিন স্ট্রিটে অবস্থিত জনতা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজেসের দখল নিলেন। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন সূর্য সেন হলের ছাত্রলীগের নেতা ও মুজিব বাহিনীর সদস্য আফতাবউদ্দিন আহমদ। ওই প্রেস থেকে জামায়াতে ইসলামীর দৈনিক পত্রিকা *সংগ্রাম* ছাপা হতো। ১৯৭২ সালের ১০

জানুয়ারি ওই ছাপাখানা থেকে আফতাব একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করলেন। আফতাবের প্রধান সহযোগী ছিলেন রায়হান ফেরদৌস মধু। পত্রিকার নাম 'গণকণ্ঠ'। সম্পাদক হিসেবে কবি আল মাহমুদের নাম ছাপা হলো। তিনি তখনো কলকাতা থেকে ঢাকায় ফেরেননি। পত্রিকার একটা ডিক্লারেশনের জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন জানানো হলো। আবেদনপত্রে পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ এবং পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি গাজী গোলাম মোস্তফার নাম উল্লেখ করা হয়েছিল।[৬]

একাত্তর সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে শেখ ফজলুল হক মনি কিছু লোক নিয়ে মতিঝিলে *দৈনিক বাংলা-মর্নিং নিউজ* অফিস দখল করতে যান। ওই সময় ভবনটির বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের ভারপ্রাপ্ত তথ্যসচিব বাহাউদ্দিন চৌধুরী। তিনি একসময় কমিউনিস্ট পার্টি করতেন এবং শেখ মুজিবের খুব ভক্ত ছিলেন। তিনি শেখ মনিকে ধমক দিয়ে বললেন, 'খবরদার, আমি যতক্ষণ আছি আর এক পা-ও এদিকে নয়।'[৭] শেখ মনি তখন দলবল নিয়ে মতিঝিলে উর্দু দৈনিক *পাসবান* অফিসের দখল নিলেন এবং 'মধুমতি মুদ্রণালয়' নামে একটা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে সেখান থেকে সাপ্তাহিক *বাংলার বাণী* ছাপাতে লাগলেন।

ছাত্রলীগের সিরাজপন্থীদের বসার নির্দিষ্ট কোনো জায়গা ছিল না। দিনের বেলা জহুরুল হক হলের ক্যানটিন কিংবা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আহসানউল্লাহ হল অথবা ছাত্র সংসদের অফিস এবং সন্ধ্যার পর নীলক্ষেতে আনোয়ার রেস্টুরেন্টে তাঁরা সচরাচর বসতেন এবং আলাপ-আলোচনা করতেন। এখন তাঁদের যোগাযোগের নতুন কেন্দ্র হলো *গণকণ্ঠ* অফিস। জনতা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজেস লিমিটেড ছিল একটা 'পরিত্যক্ত সম্পত্তি'। ছাত্রলীগের সহসভাপতি মনিরুল ইসলাম এর 'প্রশাসক' নিযুক্ত হন। পাঁচজনের যৌথ মালিকানায় *গণকণ্ঠ* নিবন্ধিত হয়। এই পাঁচজন হলেন আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, কাজী আরেফ আহমেদ, মনিরুল ইসলাম ও আফতাবউদ্দিন আহমদ। আফতাব নির্বাহী সম্পাদক ও কাজী আরেফ ব্যবস্থাপনা সম্পাদক নিযুক্ত হন। নাজিমুদ্দিন মানিক বার্তা সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেন মোহাম্মদ তোহা খান, আলাউদ্দিন আহমদ, রমেন দত্ত, আবুল হাসান ও নির্মলেন্দু গুণ। আবু কায়সার সাহিত্য সম্পাদকের দায়িত্ব পান। রফিকুন নবী অনেকগুলো দৃষ্টিনন্দন টাইটেল ও স্কেচ এঁকে দেন। *গণকণ্ঠ* টাইটেলটা করে দিয়েছিলেন কালাম মাহমুদ।

বাহাত্তর সালের ২১ ফেব্রুয়ারি *গণকণ্ঠ* দৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কয়েক মাস পর আহমদ ছফা সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন।

শেখ মুজিবুর রহমান বাহাত্তর সালের ১০ জানুয়ারি লন্ডন থেকে নয়াদিল্লি হয়ে ঢাকায় আসেন। বিমানবন্দর থেকে তাঁকে সরাসরি সোহরাওয়ার্দী

গণকণ্ঠ

সমাজতন্ত্রের পথে আমলাতান্ত্রিক ষড়যন্ত্র চলবেনা

শহীদ দিবসের আগেই সর্বস্তরে বাঙলাভাষা চালু কর
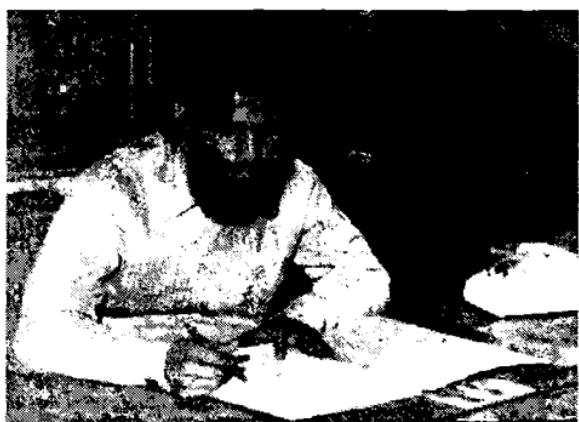
সাপ্তাহিক 'গণকণ্ঠ'-এর প্রথম সংখ্যা (১০ জানুয়ারি ১৯৭২) হাতে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২

সাপ্তাহিক 'গণকণ্ঠ'-এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হিসেবে কর্মরত কাজী আরেফ আহমেদ

উদ্যানে নিয়ে যাওয়া হয়। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সভা শেষ করে শেখ মুজিব শেরেবাংলা ও সোহরাওয়ার্দীর মাজার জিয়ারত করে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। তারপর তিনি ধানমন্ডির ১৮ নম্বর সড়কের বাড়িটিতে আসেন, যেখানে তাঁর পরিবার বসবাস করছিল। সন্ধ্যার পর দোতলার একটি ঘরে তিনি শেখ মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ—মুজিব বাহিনীর এই চার নেতার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন।

রাষ্ট্রপতির শপথ

আমি, শেখ মুজিবুর রহমান, দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত এই শপথ গ্রহণ করিতেছি যে, আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাসের সহিত অনুগত থাকিব।

আমি আইনানুসারে সংবিধান এবং আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের সার্বভৌম রক্ষা এবং সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসাবে আমার কর্তব্য ও দায়িত্ব সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব।

আমি রাষ্ট্রপতি হিসাবে আমার কর্তব্যপালনে সকল সিদ্ধান্তগ্রহণে আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে থাকিব।

আমি সংবিধান অনুসরণ, সংরক্ষণ ও সমর্থন করিব।

এবং আমি কোনরূপ ভীতি অথবা অনুগ্রহ, প্রীতি অথবা বিদ্বেষ ব্যতিরেকে আইন অনুযায়ী সকল শ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় বিচার করিব।

শেখ মুজিবুর রহমান
(স্বাক্ষর)

সোমবার, ২৫শে পৌষ, ১৩৭৮ সন, ১০ই জানুয়ারী, ১৯৭২ খৃষ্টাব্দ, ঢাকা।

অদ্য সোমবার, ২৫শে পৌষ, ১৩৭৮ সন/১০ই জানুয়ারী, ১৯৭২ খৃষ্টাব্দ, ঢাকায় আমার সম্মুখে শপথ গৃহীত হইল।

(স্বাক্ষর) ১০-১-৭২

বাহাত্তরের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন

শেখ মুজিবের জামাতা এম এ ওয়াজেদ মিয়া এ সময় উপস্থিত ছিলেন। চার নেতা যুদ্ধকালীন সময়ের পরিস্থিতি ও ঘটনাবলি সম্পর্কে শেখ মুজিবকে অবহিত করেন।[৮]

১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান 'বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' জারি করেন। এই আদেশের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো ছিল :

— বাংলাদেশের জনগণের ঘোষিত আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সংসদীয় গণতন্ত্র কার্যকর করা হবে।
— ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে বিজয়ী এবং আইনের দ্বারা অন্য কোনো দিক দিয়ে অযোগ্য বিবেচিত নন—এমন সব নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হবে।
— বাংলাদেশে একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকবে এবং এর প্রধান হবেন প্রধানমন্ত্রী।
— রাষ্ট্রপতি তাঁর সব দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন।
— রাষ্ট্রপতি গণপরিষদের এমন একজনকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করবেন, যিনি গণপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন।[৯]

১২ জানুয়ারি শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে নতুন রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করা হয়। বঙ্গভবনে (আগে যেটা ছিল গভর্নর হাউস) নতুন প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ১২ জানুয়ারি। আগতদের মধ্যে অনেকেই জানতেন না কে হচ্ছেন নতুন প্রধানমন্ত্রী। এমন সময় শেখ মুজিব বঙ্গভবনের দরবার হলে প্রবেশ করেন এবং নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। এতে ছাত্রলীগের সিরাজপন্থী নেতারা বিস্মিত হন। কারণ, তাঁদের ধারণা ছিল, শেখ মুজিব সরকারে থাকবেন না, অন্য কেউ প্রধানমন্ত্রী হবেন। এই পদে সৈয়দ নজরুল ইসলাম নিয়োগ পেতে পারেন বলে গুঞ্জন ছিল।[১০]

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর শেখ মুজিব ১৪ জানুয়ারি প্রথম সংবাদ সম্মেলন করেন। এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে তিনি সরকারি পদ গ্রহণ করেছেন বলে আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আর দলীয় প্রধান থাকবেন না। এই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী যেসব আওয়ামী লীগ-দলীয় সদস্য সরকারি পদ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সবাইকেই দলীয় নেতৃত্বের পদ ছেড়ে দিতে হবে। তিনি যাতে দলীয় ও সরকারি উভয় পদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে দলের গঠনতন্ত্র সংশোধনের সম্ভাবনাও তিনি নাকচ করে দেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত বহুদলীয় উপদেষ্টা কমিটির বর্তমান মর্যাদা

সম্পর্কে তিনি বলেন যে যখন প্রয়োজন মনে করবেন, তখন উপদেষ্টা কমিটির পরামর্শ গ্রহণ করবেন।[১১]

শেখ মুজিব সব অস্ত্র ৩১ জানুয়ারির মধ্যে জমা দেওয়ার আহ্বান জানান।[১২] তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের প্রশংসা করেন এবং যার যার কাজে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানান। মুজিব বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সমর্পণ করে ৩১ জানুয়ারি। ওই দিন ঢাকা স্টেডিয়ামে অস্ত্র সমর্পণের জন্য একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। শেখ মুজিব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মুজিব বাহিনীর পক্ষে এর চারজন অধিনায়ক—শেখ মনি, সিরাজ, রাজ্জাক ও তোফায়েল এবং জাতীয় শ্রমিক লীগের পক্ষ থেকে এর সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান শেখ মুজিবের কাছে প্রতীকী অস্ত্র সমর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে শেখ মুজিব কিছু বলার জন্য সিরাজুল আলম খানকে অনুরোধ করলে সিরাজ একটা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন :

> যারা বিজয়ী, তারা কখনো অস্ত্র সমর্পণ করে না। প্রয়োজনে তারা অস্ত্র জমা রাখে। আমরা অস্ত্র জমা রাখলাম।[১৩]

১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি ঢাকা স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে অস্ত্র জমা দেওয়ার অনুষ্ঠানে বিএলএফের চার নেতা, (বাঁ থেকে) আবদুর রাজ্জাক, সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমেদ ও শেখ ফজলুল হক মনি

কী পরিমাণ অস্ত্র তাঁদের কাছে ছিল এবং তার কতটা জমা দেওয়া হয়েছিল, তা হিসাব করা ছিল খুব কঠিন। মুজিব বাহিনীর সদস্যরা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যেসব অস্ত্র পেয়েছিলেন, তার তালিকা ছিল। কিন্তু তাঁরা পরে নিজেদের উদ্যোগে পাকিস্তানি বাহিনীর কাছ থেকে যেসব অস্ত্র সংগ্রহ করেছিলেন, তার হিসাব শুধু তাঁরাই জানতেন। তাঁদের অনেকেই নানা উদ্দেশ্যে অনেক অস্ত্রশস্ত্র নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। কেউ রেখেছিলেন পরে রাজনীতিতে পেশিশক্তির মহড়া দেওয়ার জন্য, কেউ রেখেছিলেন 'অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধকে যৌক্তিক পরিণতিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে কাজে লাগতে পারে'—এই উদ্দেশ্যে। দীর্ঘকাল ধরে অস্ত্র সংরক্ষণ করার পদ্ধতি তাঁরা জানতেন; কারণ, এটা প্রশিক্ষণের সময় তাঁদের শেখানো হয়েছিল। অনেকেই নিজ উদ্যোগে গ্রিজ মেখে ও পলিথিন শিট দিয়ে মুড়িয়ে অস্ত্রশস্ত্র মাটির নিচে এবং বিভিন্ন গোপন আস্তানায় রেখে দিয়েছিলেন। কাজটি মুজিব বাহিনীর বাইরে অন্যরাও করেছিলেন। পরে এসব অস্ত্রের ব্যবহার দেখা গেছে বিভিন্ন স্থানে; কখনো বিপ্লবী রাজনীতির নামে, কখনো নিছক ডাকাতি ও লুটতরাজের উদ্দেশ্যে।

শেখ মুজিব ইতিমধ্যে বেশ কিছু পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো একটি মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা। এ জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে মেজর জেনারেল উবানের সাহায্য চেয়ে ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। উবান বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> একদিন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব শ্রী পি এন হাকসার আমাকে একটা বার্তা পাঠিয়ে জানালেন যে শেখ মুজিবুর রহমানের অনুরোধে শেখের ব্যক্তিগত উপদেষ্টা হিসেবে আমার ঢাকা যাওয়াতে প্রধানমন্ত্রী সম্মত হয়েছেন এবং আমাকে অবিলম্বে যেতে হবে।...
>
> মুজিব ওই সময় তিনটি বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। একটা হলো, কতগুলো মহল তখনো অস্ত্র সমর্পণ করেনি, তারা সুযোগ পেলে সেগুলো সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারত। বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকে লুকানো অস্ত্রের ভান্ডার গড়ে তুলেছিল।
>
> দ্বিতীয়টি হলো, আমাদের সাধারণ সীমান্তের বিভিন্ন অংশ দিয়ে উভয় দিকে চোরাচালানের প্রশ্ন। এই চোরাচালান তাঁর অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিতে পারত।
>
> তৃতীয়টি ছিল, তাঁর দেশের প্রকৃত যুব ক্যাডারদের পুনর্বাসনের প্রশ্ন। তারা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা ভালোভাবে প্রশিক্ষিত ও অস্ত্রসজ্জিত হয়েছিল এবং তারা সবাই ছিল বেকার। সংখ্যায় তারা এত বিরাট যে, তাদের আত্তীকরণ করার সাধ্য তাঁর ছোট্ট আর্মির ছিল না।...

শেখ মনে মনে একটা ভাবনা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন—একটা বাহিনী, যা মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহিনীর সকল দেশপ্রেমিক যুবাকে ধারণ করতে পারবে...। তিনি আমার সঙ্গে ব্যাপারটা আলোচনা করলেন এবং আমাকে একমত দেখে এই বাহিনী গড়ে তোলার আদেশ দিলেন। তিনি বাহিনীর নাম দিলেন জাতীয় রক্ষীবাহিনী (জেআরবি) এবং আদেশ দিলেন, শুরুতে এতে ১২ হাজার অফিসার ও জওয়ান থাকবে। এর সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য একে তিনি নিজ কমান্ডের অধীনে রাখলেন এবং ঢাকাকে এর গ্যারিসন করলেন। চূড়ান্ত রকমের একজন দক্ষ অফিসার কর্নেল নুরুজ্জামানকে এই বাহিনী কমান্ড করার জন্য বাছাই করলেন। আমাকে অনুরোধ করলেন এ বাহিনীকে সংগঠিত, প্রশিক্ষিত ও সজ্জিত করতে সাহায্য করার জন্য, আমি যেন যথাসাধ্য তা করি।[১৪]

এ সময় সিরাজপন্থীদের মধ্যে একটা ধারণা ছিল, শেখ মুজিব সরকারের কোনো পদ গ্রহণ করবেন না। তিনি মহাত্মা গান্ধীর মতো নেপথ্যে থেকে জাতীয় অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবেন।

১৯৭২ সালের জানুয়ারির কোনো এক সময় স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের নেতাদের সঙ্গে শেখ মুজিবের একটি বৈঠক হয়। সিরাজুল আলম খান ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে একটি ১৫ দফা কর্মসূচির খসড়া দিয়েছিলেন শেখ মুজিবকে। নতুন রাষ্ট্রটি কীভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, এই কর্মসূচিতে তিনি তা উল্লেখ করেছিলেন। প্রস্তাবগুলো ছিল :

১. অসম্পূর্ণ মুক্তিযুদ্ধ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় পুনর্গঠনের একটা পর্যায় পর্যন্ত বাংলাদেশ একটি বিপ্লবী জাতীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত হবে। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া সকল দলের সমন্বয়ে গঠিত এই সরকারের প্রধান থাকবেন বঙ্গবন্ধু।
২. কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হবে মুক্তিযুদ্ধের পরীক্ষিত নেতৃত্ব দ্বারা, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করেন।
৩. বঙ্গবন্ধুর মর্যাদার বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনবোধে তিনি রাজধানীর বাইরে অবস্থান করবেন। তাঁকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতির চেতনা বিকাশের ধারা প্রবাহিত হবে।
৪. বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে, কোনো দেশের অনুকরণে নয়। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া সকল দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হবে।
৫. চিরাচরিত প্রথার সেনাবাহিনী গঠন না করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাতীয় পর্যায়ে রেভল্যুশনারি গার্ড বাহিনী গঠন করা হবে। এফএফ এবং বিএলএফসহ মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে এই বাহিনী তৈরি হবে। এর সমান্তরাল অন্য কোনো বাহিনী থাকবে না।

৬. রেভল্যুশনারি গার্ডের মধ্যে থাকবে :

ক) বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী, যা কিনা হবে 'পিপলস আর্মি'।

খ) কৃষিকাজে সহায়তা দেওয়ার জন্য রেভল্যুশনারি কৃষক ব্রিগেড।

গ) শিল্প এলাকার জন্য রেভল্যুশনারি লেবার ব্রিগেড।

৭. নিবর্তনমূলক পুলিশ বাহিনীর বদলে পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সমন্বয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গঠন করা হবে। 'পুলিশ' নামটি ব্যবহার করা হবে না।

৮. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো আপাতত খোলা হবে না। মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক-ছাত্রদের নিয়ে ছোট ছোট স্কোয়াড তৈরি করে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এক বছরের মধ্যে ৬০ শতাংশ মানুষকে সাক্ষরতার আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

৯. উচ্চশিক্ষার সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। প্রয়োজনে ব্যাংকঋণের ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষা শেষ করে কর্মক্ষেত্রে যোগ দিয়ে ঋণ পরিশোধের সুযোগ দেওয়া হবে।

১০. ব্রিটিশ-পাকিস্তানি আমলের ধারাবাহিকতায় জেলা-মহকুমা-থানায় কমপক্ষে দুই-তিন বছর প্রশাসনের কোনো ক্যাডার বা গোষ্ঠীকে জনপ্রশাসনের দায়িত্বে রাখা যাবে না।

১১. মুক্তিযুদ্ধের সময় যাঁরা জেলা-মহকুমা-থানা পর্যায়ে কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁরাই জনপ্রশাসনের দায়িত্বে থাকবেন।

১২. জনপ্রশাসনে প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ—এই সব শ্রেণিবিন্যাস থাকবে না। কাজের ক্ষেত্রে দায়িত্ব পাওয়ার জন্য যে স্তর হয়, তার কোনো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকবে না।

১৩. সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ বেতনের অনুপাত হবে অনধিক ১:৭।

১৪. সমবায়ভিত্তিক অর্থনীতি চালু হবে। পরিত্যক্ত কলকারখানা মুক্তিযোদ্ধা শ্রমিক-কর্মচারীদের সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

১৫. কেবল ভারত ও রাশিয়ার ওপর নির্ভর না করে চীন, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্রুততম সময়ের মধ্যে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

কর্মসূচিটি একঝলক দেখে শেখ মুজিব সেটা তাঁর টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দেন। ড্রয়ার থেকে সেটা আর বের হয়নি।

সর্বদলীয় সরকারের ব্যাপারে শেখ মুজিবের প্রাথমিক সম্মতি ছিল। তবে তাঁর মনে হয়েছিল, এটা সম্ভব হবে না। সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে তাঁর এ বিষয়ে বেশ কিছু কথাবার্তা হয়।

মুজিব : অন্য কোনো দল আসবে না। সুতরাং ওই চিন্তা বাদ দাও।

> সিরাজ : কথাবার্তা বলতে হবে সবার সাথে। তোহা ভাইকে আমি যেমন করেই হোক ম্যানেজ করব। সিরাজ শিকদারকেও আমি আনতে পারব।
>
> মুজিব : আমার মনে হয় না এটা সম্ভব হবে। আমার দলের অনেকেই এটা পছন্দ করবে না।

গণভবনের সবুজ চত্বরে এক সন্ধ্যায় সিরাজুল আলম খানের কাঁধে হাত রেখে শেখ মুজিব অনেকক্ষণ হেঁটেছিলেন। একপর্যায়ে বলেই ফেললেন, 'পারলাম না রে, সিরাজ।' আওয়ামী লীগের অনেক প্রভাবশালী নেতা এর বিরোধিতা করেছিলেন।[১৫]

তাজউদ্দীনের সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি লক্ষ করলেন, তাজউদ্দীন ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন। মুক্তিযুদ্ধে তাজউদ্দীনের ভূমিকা ও পরবর্তী সময়ে তাঁর নেপথ্যে চলে যাওয়ার ব্যাপারে সিরাজুল আলম খানের পর্যবেক্ষণ ছিল এরকম :

> বঙ্গবন্ধুর নামে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ের নেতা হলেন তাজউদ্দীন। জামায়াতে ইসলামী হলো পাকিস্তানি ফোর্স আর আওয়ামী লীগ ছিল অ্যান্টি লিবারেশন ফোর্স। আওয়ামী লীগ তো ছয় দফা থেকে এক ইঞ্চিও আগে বাড়তে চায়নি। এদের সত্যিকার চেহারা জানতে পারলে মানুষ এদের গায়ে থুতু দেবে। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় তাজউদ্দীনের নাম আসা উচিত এক নম্বরে। অথচ তিনিই হলেন এর প্রথম ক্যাজুয়ালটি।[১৬]

সিরাজুল আলম খানের দেওয়া প্রস্তাবগুলো শেখ মুজিব অবশ্য নীতিগতভাবে মেনে নেন এবং স্বাধীনতা দিবস (২৬ মার্চ) উপলক্ষে তিনি এই বিষয়ে একটি ঘোষণা দেবেন বলে মন্তব্য করেন।[১৭]

ফেব্রুয়ারির ৫ থেকে ৭ তারিখ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় একটি যুগান্তকারী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে 'শ্রেণিসংগ্রামকে তীব্রতর করে সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা'র প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়। ১৯-২২ মার্চ চার দিনব্যাপী ছাত্রলীগের একটি বর্ধিত সভায় বিভিন্ন জেলা প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়। প্রস্তাবে বলা হয় :

> রাজনৈতিক চক্র, সুবিধাবাদী রাজনীতি, আমলাতন্ত্র, উঠতি বুর্জোয়া ও শিল্প প্রশাসক গোষ্ঠী, অতি উৎসাহী সামরিক চক্র, সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী ও সকল প্রকার শ্রেণিবিভেদ পোষণকারীরাই সমাজতান্ত্রিক পথকে কণ্টকাকীর্ণ করে রেখেছে। উপর্যুপরি বৈপ্লবিক আন্দোলনের মাধ্যমে অপসারিত করতে হবে সমাজতন্ত্রের সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে একনিষ্ঠ ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের মাধ্যমে এই বিপ্লব পরিচালিত হবে স্বয়ং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। তাই সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে একটি শ্রেণিহীন-শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক

শ্রেণীশোষণ শোষণকারীদের সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে [illegible] হবে [illegible]। ক্ষমতাসীন সৈরাচারী আন্দোলনের মাধ্যমে অগণতান্ত্রিক করতে হবে সমাজদেহের [illegible] সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে একনিষ্ঠ ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও রাজনৈতিক সংগঠন সমূহের মাধ্যমে এই বিপ্লব পরিচালিত হবে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। তাই—

সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে একটি শ্রেণীহীন-শোষণহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠা এবং ছাত্র শ্রমিক কৃষক ও রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠা নতুন নেতৃত্বের অধিকারী কৃষক, শ্রমিকের সত্যিকারের প্রতিনিধিদের উপর শাসন ক্ষমতা অর্পণের মাধ্যমে কৃষক-শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

সাড়ে সাত কোটি বাঙালী জাতির জন্ম হই এই বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আত্মবিকাশ, বাঙালী (মেহনতী মানুষের) শিল্প ও সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সভ্যতার ঐতিহ্যকে আরও ঐতিহ্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য আমাদের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে আমাদের বিপ্লবী চেতনাকে পরিচালিত করতে হবে।

এদেশে অতীতের সকল গণমুখী আন্দোলনের অগ্রদূত ও একক নেতৃত্বদানের গৌরবে গৌরবান্বিত ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ একটি শোষণহীন-শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় এবং বাংলাদেশে কৃষক-শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে শ্রেণী সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনায় বদ্ধপরিকর।

শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবাবলী

এই সভা শিক্ষানীতির প্রশ্নে এই ঘোষণা প্রকাশ করছে যে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয়করণ করতঃ শ্রেণী বৈষম্য মূলক শিক্ষা ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে অবাধ সার্বজনীন বিজ্ঞান সম্মত গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করতঃ বৈজ্ঞানিক কৃষি, কারিগরি, চিকিৎসা, বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের দাবী জানাচ্ছে এবং তাই প্রথম পদক্ষেপ স্বরূপ আগামী শিক্ষা বছর থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার আহ্বান জানাচ্ছে এবং বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রচলনের আহ্বান জানাচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঘোষণাসংবলিত ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব, ফেব্রুয়ারি ১৯৭২

ও রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠা নতুন নেতৃত্বের অধিকারী কৃষক-শ্রমিকের সত্যিকারের প্রতিনিধিদের ওপর শাসনব্যবস্থা অর্পণের মাধ্যমে কৃষক-শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।[১৮]

২৬ মার্চ সন্ধ্যায় শেখ মুজিব রেডিও-টেলিভিশনে একটি ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি নতুন রাষ্ট্র এবং নতুন সমাজের উপযোগী করে সমগ্র প্রশাসনযন্ত্রকে পুনর্গঠন করার অঙ্গীকার করেন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের সব মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সমাজতন্ত্রের ব্যাপারে প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি বলেন :

আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সমাজ-বিপ্লবে বিশ্বাসী। পুরোনো সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। অবাস্তব আস্তিকতা নয়, আমার
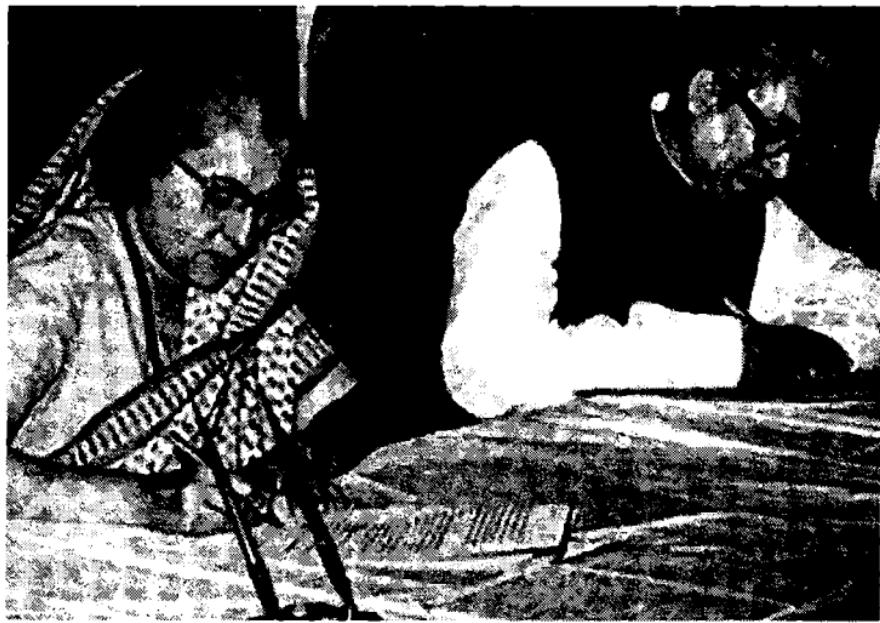
সরকার বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দেশের বাস্তব প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে পুরোনো সামাজিক কাঠামোকে ভেঙে দিয়ে নতুন সমাজ গড়তে হবে।[১৯]

এই ভাষণে শেখ মুজিব প্রথমবারের মতো 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন এবং এর পর থেকে ছাত্রলীগের সিরাজপন্থীরা তাঁদের সব প্রচারপত্রে 'আমরা লড়ছি সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য'—এই বাক্যটি একটি পরিচিতি স্মারক হিসেবে ব্যবহার করতে থাকেন।

বাহাত্তরের ফেব্রুয়ারি থেকে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের দুই নেতা সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাকের মধ্যে দূরত্বের সৃষ্টি হয়। ছাত্রলীগের একাংশের ভেতরে 'অতি বাম' প্রবণতা লক্ষ করে রাজ্জাক উদ্বিগ্ন হন। বিশেষ করে, কিছু কিছু স্লোগান নিয়ে তিনি আপত্তি জানান। 'লাল সালাম' স্লোগানে তাঁর ঘোর আপত্তি ছিল। তাঁর পছন্দের স্লোগান ছিল 'লও সালাম'। অবশ্য এই স্লোগান সিরাজপন্থীদের কাছে খুব পানসে মনে হতো। আরও নানা কারণে দুজনের মধ্যে দূরত্ব দিন দিন বাড়তে থাকে। এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

একাত্তর সালের অক্টোবরে বিএলএফের প্রশিক্ষণকেন্দ্রে সিরাজুল আলম খান প্রথম 'মুজিববাদ' শব্দটি ব্যবহার করেন। রাজ্জাক এটা সমর্থন করেন।[২০] ১৬ ডিসেম্বরের পরই ছাত্রলীগের মধ্যে 'বিশ্বে এল নতুন বাদ—মুজিববাদ মুজিববাদ'—এই স্লোগান চালু হয়ে যায়। কয়েক দিন যেতে না-যেতেই সিরাজপন্থীরা এই স্লোগান দেওয়া বন্ধ করে দেন। তবে বাহাত্তরের জানুয়ারিতেই জাতীয় শ্রমিক লীগের ব্যানারে 'লাল বাহিনী' তৈরির ঘোষণা দেওয়া হয়।

ছাত্রলীগের মধ্যে মেরুকরণ চলতে থাকে। ছাত্রলীগের নেতারা বিভিন্ন জেলা সফর করে তাঁদের প্রভাববলয় তৈরি ও তা শক্তিশালী করার কাজ জোরদার করতে থাকেন। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি হবিগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগ আয়োজিত এক কর্মিসভায় অংশ নেওয়ার জন্য ঢাকা থেকে বদিউল আলম ও মহিউদ্দিন আহমদ হবিগঞ্জে যান। হবিগঞ্জে ছাত্রলীগ ছিল দুর্বল। তুলনামূলকভাবে ছাত্র ইউনিয়ন ছিল শক্তিশালী। এক বিকেলে শহরের বিটি হলে ছাত্রসভা হলো। জেলার নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্যদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তৃতার একপর্যায়ে মহিউদ্দিন মুজিববাদকে একটা ফাঁকা বুলি হিসেবে অভিহিত করে বলেন, সমাজতন্ত্রের ভিত্তি হচ্ছে মার্ক্সবাদ; মুজিববাদ বলে কিছু নেই। সভা শেষে তাঁরা জেলা ছাত্রলীগের অফিসে যান এবং সেখানে মহিউদ্দিন স্থানীয় কর্মীদের জন্য পোস্টারে অনেকগুলো স্লোগান লিখে

বাহাত্তরের মার্চে ঢাকায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পঁচিশ বছর মেয়াদি শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি সই করছেন শেখ মুজিব ও ইন্দিরা গান্ধী

দিয়ে বলেন, 'এখন থেকে আমরা এই স্লোগানগুলো বেশি করে দেব।' এর মধ্যে একটি স্লোগান ছিল, 'কমরেড শেখ মুজিব—লাল সালাম লাল সালাম।'

কিছুদিন পর এক সাংগঠনিক সফরে আবদুর রাজ্জাক হবিগঞ্জে যান। সেখানে ছাত্রলীগের কর্মীরা 'কমরেড আবদুর রাজ্জাক, লাল সালাম লাল সালাম' বলে মুহুর্মুহু স্লোগান দেন। এতে রাজ্জাক খুবই ক্ষুব্ধ হন। কে এই স্লোগান শিখিয়েছে, এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা ঢাকা থেকে আসা মহিউদ্দিনের নাম উল্লেখ করেন। রাজ্জাক ঢাকায় ফিরে সিরাজুল আলম খানের কাছে অনুযোগ করেন, 'এসব কী হচ্ছে?'[২১]

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশে একটা বিরাট ওলট-পালট ঘটে গেছে। তরুণদের আকাঙ্ক্ষা তখন আকাশছোঁয়া। তাঁরা চান সমাজের একটা গুণগত পরিবর্তন। এটা ধারণ করার মতো সামর্থ্য আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের ছিল না। শেখ মুজিব তখনো অবিসংবাদী নেতা। তবে তাঁকে নিয়েও নানাবিধ প্রশ্ন উঠছে। এই পর্যায়ে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের নিউক্লিয়াসে ভাঙন ধরল। আবদুর রাজ্জাক ছিলেন ধীরে চলা নীতির পক্ষে। তিনি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কোনো রকমের বিতর্কে জড়াতে রাজি ছিলেন না। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, বঙ্গবন্ধুকে এই মুহূর্তে ছেড়ে যাওয়াটা হবে বোকামি ও আত্মঘাতী।[২২]

শেখ মুজিব ধীরে ধীরে ঘর গোছানোর চেষ্টা করছিলেন। লাল সালাম বা মার্ক্সবাদ-জাতীয় স্লোগানে তাঁর তীব্র আপত্তি ছিল। ছাত্রলীগের পাল্টাপাল্টি স্লোগানে এপ্রিলে তাঁর দুটো জনসভা প্রায় পণ্ড হয়ে যায়। একটি সিলেটে, অন্যটি নোয়াখালীতে। আবদুর রাজ্জাক স্পষ্ট জানিয়ে দেন, শেখ মুজিবকে ছেড়ে তিনি আসবেন না। তাঁর সাফ কথা, সময় এখনো আসেনি এবং এর প্রয়োজনও নেই।[২৩]

সিরাজপন্থীরা এপ্রিলে একটা গোপন বৈঠক করেন। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিরাজুল আলম খান, কাজী আরেফ আহমেদ, আ স ম আবদুর রব, মনিরুল ইসলাম, শাজাহান সিরাজ, মো. শাজাহান, বিধানকৃষ্ণ সেন, সুলতানউদ্দিন আহমদ, এম এ আউয়াল, নূরে আলম জিকু ও আলী রেজা। তাঁদের মধ্যে বিধানকৃষ্ণ সেন, সুলতানউদ্দিন ও আলী রেজা ছিলেন আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত। অন্যরা এসেছেন পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী ধারা থেকে। তাঁরা নতুন একটা রাজনৈতিক দল তৈরির ব্যাপারে একমত হন।[২৪]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) শেখ মুজিবকে ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এ উপলক্ষে বাহাত্তরের ৭ মে একটা সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেসিয়াম-সংলগ্ন মাঠে। শেখ মুজিবের উপস্থিতিতে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে একটা শোডাউন হয়। সিরাজপন্থীদের স্লোগান ছিল: 'সমাজতন্ত্রের ভিত্তি কী—মার্ক্সবাদ মার্ক্সবাদ', 'কৃষকরাজ শ্রমিকরাজ/ কায়েম করো কায়েম করো'; 'কমরেড শেখ মুজিব/ লাল সালাম লাল সালাম'। অন্য গ্রুপটি পাল্টা স্লোগান দেয়: 'শেখ মুজিবের মতবাদ/ গণতান্ত্রিক সমাজবাদ', 'কৃষক-শ্রমিক-গণরাজ/ কায়েম করো কায়েম করো', 'জাতির পিতা শেখ মুজিব/ লও সালাম লও সালাম' ইত্যাদি। শেখ মুজিবের হাতে ডাকসুর আজীবন সদস্যপদের একটি সনদ তুলে দেন আ স ম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন। শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে বলেন, 'ব্যাংক-বিমা-বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করে শোষণের চাবিকাঠি বন্ধ করে দিয়েছি।'[২৫]

ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে, বাহাত্তরের ৩ জুন ডাকসু ও হল সংসদগুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মে মাসের শুরু থেকেই ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে প্রস্তুতি শুরু হলো। ৬ মে কলাভবনের বটতলায় ছাত্রলীগের একটা প্রজেকশন মিটিং হওয়ার কথা। বিকেল পাঁচটায় সভা শুরু হয়। নূরে আলম সিদ্দিকী সভাপতিত্ব করছিলেন। শুরু থেকেই হট্টগোল;

ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে স্লোগান আর পাল্টা স্লোগান। একদল বলে, 'বিপ্লব বিপ্লব/ সামাজিক বিপ্লব', তো অন্য দল বলে, 'পাতিবিপ্লবী খতম করো/ মুজিববাদ কায়েম করো'। হইচইয়ের মধ্যে নূরে আলম সিদ্দিকী সভা পরিচালনা করতে পারছিলেন না। প্রথম প্রথম কর্মীরা মতাদর্শগত স্লোগান দিচ্ছিলেন। একটু পরই শুরু হলো আক্রমণাত্মক স্লোগান। এক গ্রুপের স্লোগান ছিল, 'সিআইএর দালালেরা/ হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার', অন্য গ্রুপের স্লোগান ছিল, 'চীন-রাশিয়ার দালালেরা/ হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার'। একপর্যায়ে দুই গ্রুপ দুই ভাগ হয়ে আলাদা মিছিল নিয়ে বটতলা থেকে রওনা হলো। তারা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর প্রদক্ষিণ করল ঘণ্টা খানেক। ছাত্রলীগ দুই টুকরা হয়ে গেল।

এরপর চলল ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বহিষ্কার আর পাল্টা বহিষ্কারের পালা। সিরাজপন্থীরা কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁরা নূরে আলম সিদ্দিকীকে বহিষ্কার করে অন্যতম সহসভাপতি শরীফ নুরুল আম্বিয়াকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে নিয়োগ দিলেন। প্রতিপক্ষ গ্রুপ শাজাহান সিরাজকে বহিষ্কার করে সহসম্পাদক ইসমত কাদির গামাকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দিল। সিরাজপন্থীরা যাঁদের বহিষ্কার করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আরও ছিলেন সহসভাপতি সৈয়দ রেজাউর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুল হক চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক এম এ রশীদ, সহসম্পাদক ইসমত কাদির গামা এবং কার্যনির্বাহী সদস্য গোউস আলী সুলতান, শফিউল আলম প্রধান, শেখ শহীদুল ইসলাম ও আবদুল কুদ্দুস মাখন। এর পর থেকেই সিরাজপন্থীরা একটা অনানুষ্ঠানিক দল হিসেবে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বক্তৃতা-বিবৃতি দিতে থাকেন। 'জরুরি অবস্থা ঘোষণা, গণপরিষদ বাতিল ও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বিপ্লবী সরকার গঠনের আহ্বান' জানিয়ে আ স ম রব, শাজাহান সিরাজ ও শরীফ নুরুল আম্বিয়ার নামে প্রথম প্রকাশ্য বিবৃতিটি দেওয়া হয় বাহাত্তরের ২৫ মে। বিবৃতিতে দেশের পরিস্থিতি বর্ণনা করে তাঁরা বলেন :

> দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং সেই সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করে আসছি, জীবন ধারণের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতির ফলে জনগণের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ বিরাজ করছে। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, চোরাচালান, মুনাফাখোরি ও সশস্ত্র গুন্ডামি জনগণের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতাবোধ সৃষ্টি করেছে। সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দুর্নীতিপরায়ণ গণপরিষদ সদস্যদের যোগসাজশে আমলারা পরিস্থিতিকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে যে এই নতুন জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে

জনগণের মনে এক বিরাট সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। একটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও আমলারা তাঁদের নোংরা খেলায় মেতেছেন। অনেক দালাল, রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্য কোনো কোনো গণপরিষদ সদস্য ও দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিকের আশ্রয়ে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।...

এরূপ এক জটিল পরিস্থিতিতে কেবল বঙ্গবন্ধুই দেশকে নৈরাজ্যের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। কারণ, জাতির পিতা হিসেবে দেশের নেতৃত্বদানকারী বঙ্গবন্ধুর ওপরই এই দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের দলনির্বিশেষে আস্থা আছে।

এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতির ঘোষণাবলে বঙ্গবন্ধুর ওপর বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত করা হোক। এই কারণে সচেতন ছাত্রসমাজ ও স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণের পক্ষ থেকে আমরা নিম্নরূপ দাবিগুলো পেশ করছি :

১. জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে সকল ক্ষমতার উৎস বলে ঘোষণা করতে হবে।
২. বর্তমান মন্ত্রিসভা ও গণপরিষদ বাতিল করে দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলোর সর্বোত্তম সদস্যদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী সরকার গঠন করতে হবে।
৩. বিপ্লবী সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক নীতিসমূহ সন্নিবিষ্ট করে অন্তর্বর্তীকালীন একটি খসড়া সংবিধান তৈরি করতে হবে।
৪. গণ-আদালতে দুর্নীতিপরায়ণ গণপরিষদ সদস্যদের প্রকাশ্য বিচার করতে হবে।
৫. পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দালাল, রাজাকার, আলবদর, চোরাচালানি, কালোবাজারি ও সশস্ত্র দুষ্কৃতকারীদের প্রকাশ্যে গুলি করে মারতে হবে।
৬. অসৎ ব্যবসায়ী এবং নৈরাজ্যপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীকে সাহায্য করার পূর্ণ ক্ষমতা ছাত্র, রাজনৈতিক কর্মী, লাল বাহিনী ও আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে দিতে হবে।
৭. সব রাজনৈতিক নেতা ও উচ্চপদস্থ আমলাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ও ব্যাংকে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করতে হবে।[২৬]

একই তারিখে জাতীয় শ্রমিক লীগের তিনজন নেতা—মো. শাজাহান, আবদুল মান্নান ও রুহুল আমিন ভূঁইয়া—এক যৌথ বিবৃতিতে দেশে 'জরুরি অবস্থা ঘোষণা, মন্ত্রিপরিষদ ও গণপরিষদ ভেঙে দেওয়া এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী সরকার গঠনের' দাবি জানান। পরে তাঁদের মধ্যে

একজন—শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান—এই বিবৃতি থেকে তাঁর নাম প্রত্যাহার করে নেন।

রব-সিরাজ-আম্বিয়ার বিবৃতি রাজনৈতিক অঙ্গনে একটা ঢেউ তুলতে সমর্থ হয়। একটা পাল্টা বিবৃতি আসতে খুব বেশি সময় লাগেনি। ২৬ মে ছাত্রলীগের অপর গ্রুপটির পক্ষে নূরে আলম সিদ্দিকী, ইসমত কাদির গামা ও আবদুল কুদ্দুস মাখন একটি বিবৃতি দেন। তাঁদের বিবৃতির ভাষা ছিল এরকম :

> চীন সরকার ও তার তাঁবেদার একটি বিশেষ গোষ্ঠী বাংলাদেশ সরকারের অস্তিত্ব যখন স্বীকার করেনি এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও চীনা চক্রান্তকারীরা যখন বাংলাদেশের অস্তিত্ব মেনে নিতে পারেনি, সর্বোপরি গণপরিষদ যখন সংবিধান রচনার জন্য ১৬ জুন মিলিত হচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে বিশেষ কোটারিভুক্ত ব্যক্তিদের এই বিবৃতি বাংলার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যেই বিশেষ চক্রান্তকারী গোষ্ঠীর নির্দেশে দেওয়া হয়েছে।...বঙ্গবন্ধুর সরকার জনগণের সমর্থনে এদের নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম এবং বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সারা বাংলার ছাত্রলীগের সাত লক্ষাধিক সদস্য সামাজিক অনাচার সৃষ্টির এই কীটগুলোকে ধ্বংস করে দিতে বদ্ধপরিকর।[২৭]

বিষয়টি নিয়ে আওয়ামী লীগের ভেতরেও তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। ২৯ মে আওয়ামী লীগের সহসভাপতি কোরবান আলী, সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ও সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক এক যৌথ বিবৃতিতে 'প্রতিক্রিয়াশীল ও অতিবিপ্লবীদের মোকাবিলা করার জন্য' জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। বিবৃতিতে তাঁরা বলেন :

> বিপ্লবের মাধ্যমে গঠিত বিপ্লবী সরকার জনগণকে পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, কিছু কিছু সমাজবিরোধী ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কাজ করবে। যারা সারা দেশের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারকে নস্যাৎ করে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তারা কখনো গণতন্ত্রকে সম্মান করতে পারে না।...কিছুসংখ্যক লোক দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অনাস্থা সৃষ্টি করতে চায়। দেশের সাধারণ মানুষ এসব দুষ্কৃতকারীকে ভালো করে চেনে এবং কখনো এদের মিষ্টি বুলিতে পথভ্রান্ত হবে না। দেশের মানুষ এখন পরিপূর্ণ শান্তি চায় ও রাষ্ট্রের চারটি মৌলিক নীতি—সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে মুজিববাদের প্রতিষ্ঠা দেখতে চায়।[২৮]

রব-সিরাজ-আম্বিয়ার বিবৃতির ওপর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির মন্তব্য ছিল, 'আমরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত।' ১ জুন এক বিবৃতিতে কমিউনিস্ট পার্টি উল্লেখ করে :

ইহা আজ অনস্বীকার্য যে, আমাদের স্বাধীনতাকে বিপর্যস্ত করার জন্য দেশি ও বিদেশি প্রতিক্রিয়াশীলদের গভীর ষড়যন্ত্র চলিতেছে, দেশে একটা গভীর খাদ্যসংকট ও অর্থনৈতিক সংকট চলিতেছে, দেশে ব্যাপক দুর্নীতি চলিতেছে এবং একশ্রেণির এমসিএও এই দুর্নীতির সহিত রহিয়াছেন।

উপরিউক্ত সমস্ত সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য সরকার ও দেশপ্রেমিক প্রগতিশীল দলসমূহের ও জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সরকারের যে জনসমর্থন ও ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহাতে সরকার দেশপ্রেমিক শক্তিগুলোর সহায়তা নিয়া ঐ সকল সমস্যার মোকাবিলা করিতে পারেন। ইহার জন্য 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করার বা তথাকথিত 'বিপ্লবী সরকারের' নামে ডিক্টেটরি শাসন কায়েম করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। বরং জরুরি অবস্থা ঘোষিত হওয়ার ফলে দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশ ক্ষুণ্ন হইলে জনগণের মনে অনিশ্চিত অবস্থা দেখা দিবে এবং বিদেশে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিরূপ ধারণাই সৃষ্টি হইবে। এইরূপ অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেশের অগ্রগতির পথে মারাত্মক ক্ষতিকর হইবে।...ইহাতে লাভবান হইবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, মাওবাদী চীনা ও দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা, যারা আমাদের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বিপর্যস্ত করিতে চায়। তাই জরুরি অবস্থা ঘোষণা ও বিপ্লবী সরকারের দাবিকে আমরা বিভেদমূলক, অগণতান্ত্রিক, দেশের পক্ষে মারাত্মক বলিয়া মনে করি। এইরূপ দাবিকে অগ্রাহ্য করিবার জন্য আমরা সরকার ও দেশবাসীর নিকট আহ্বান জানাইতেছি।[২৯]

সিরাজুল আলম খানের অনুসারীদের সামনে তখন পুনর্গঠিত ছাত্রলীগ ছাড়া কোনো প্ল্যাটফর্ম নেই। এ সময় তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে আরেকটি গণসংগঠন তৈরি করেন। নাম দেওয়া হয় জাতীয় কৃষক লীগ। এর সভাপতি হন গণপরিষদের সদস্য খন্দকার আবদুল মালেক এবং সাধারণ সম্পাদক হন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য স্নাতক হওয়া ছাত্রলীগের নেতা হাসানুল হক ইনু। কৃষক লীগ 'বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের' প্রতি আস্থাশীল থাকার অঙ্গীকার করে। ২৯ মে এই সংগঠনের কমিটি ঘোষণা করা হয়।

বাহাত্তরের ৩ জুন ডাকসু ও হল ছাত্রসংসদগুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রলীগের দুটো আলাদা প্যানেল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। সিরাজপন্থীদের প্যানেলের সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী ছিলেন যথাক্রমে জিনাত আলী ও মোয়াজ্জেম হোসেন খান মজলিশ। ছাত্রলীগের অন্য প্যানেলটির সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী ছিলেন শেখ শহীদুল ইসলাম এবং এম এ রশীদ। ছাত্রলীগের ভোট দুই শিবিরে ভাগাভাগি হয়ে গেল। মাঝখান দিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন ডাকসুর চারটি সদস্যপদ ছাড়া সব কটি

পদে জিতে গেল। সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হলেন যথাক্রমে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও মাহবুব জামান।

ডাকসু ও হল ছাত্র সংসদগুলোতে সিরাজপন্থীদের মধ্যে চৌদ্দ জন নির্বাচিত হন। তাঁদের নিয়ে ছাত্ররা মিছিল করেন, শহীদ মিনারে তাঁদের সংবর্ধনা দেন এবং তারপর আবার মিছিল করে মিন্টো রোডের গণভবনে যান। সেখানে একতলার বারান্দায় শেখ মুজিব লুঙ্গি পরে একটা চেয়ারে বসে ছিলেন। ছাত্ররা অনেকগুলো স্লোগান দেন। শেখ মুজিব সমবেত ছাত্রদের উদ্দেশে বললেন, নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে জেনে তিনি খুশি হয়েছেন। তিনি আরও বললেন, 'আমার লক্ষ্য সমাজতন্ত্র।' পরদিন নূরে আলম সিদ্দিকীর নেতৃত্বে ছাত্রলীগের অপর গ্রুপটি তাদের গ্রুপের নির্বাচিত আটজনকে নিয়ে মিছিল করে গণভবনে গেলে শেখ মুজিব তাঁদের বলেন, 'আমার আছে চার নীতি—গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। তোমরা যদি এটাকে মুজিববাদ বলতে চাও, আমার তাতে আপত্তি নাই।' এর পর থেকে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের পরিচিতি দাঁড়াল এরকম : সিরাজপন্থীদের অন্যরা বলে 'রব গ্রুপ', আর অন্য গ্রুপটিকে তারা বলে 'মুজিববাদী গ্রুপ'। এই নামেই তারা পরিচিত হতে থাকল।

ছাত্রলীগের উভয় গ্রুপ ২১-২৩ জুলাই কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিল। রব গ্রুপের সম্মেলন হবে পল্টন ময়দানে, মুজিববাদী গ্রুপেরটা হবে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। উভয় গ্রুপই পোস্টার ছাপিয়ে জানান দিল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্মেলন উদ্বোধন করবেন। ২০ জুলাই রাত পর্যন্ত সিরাজপন্থীরা আশা করেছিলেন, শেখ মুজিব তাঁদের সম্মেলনটিই উদ্বোধন করবেন, অথবা কোনোটিতেই যাবেন না। সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে শেখ মুজিব ২১ জুলাই সকালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গিয়ে হাজির হন। যদিও তিনি জানতেন ছাত্রলীগের ৯০ শতাংশ কর্মী-সমর্থক পল্টনের সম্মেলনটির সঙ্গে একাত্ম।[৩০]

পল্টনের সম্মেলনটি আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কলকাতা থেকে কয়েকজন সংগীতশিল্পীকে নিয়ে আসা হয়েছিল। কবি আল মাহমুদ এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আমন্ত্রিতদের মধ্যে বরেণ্য রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাণী ঠাকুরও ছিলেন। মাঝরাত অবধি গান হতো এবং পল্টন ময়দান জমজমাট থাকত। স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা সংগীত পরিবেশন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উদীয়মান গণসংগীতশিল্পী ফকির আলমগীর। তিনি নিজেই একটা গান

তৈরি করে 'মুজিববাদ' নিয়ে প্রচণ্ড রসিকতা করেছিলেন। গানটির একটি লাইন ছিল এরকম : 'এক শ টাকা চালের দাম/ মুজিববাদের অপর নাম'। ঢাকায় অবশ্য চালের দাম বেড়ে গেলেও তখন ৬০ টাকা মণ দরে পাওয়া যেত। ২২ জুলাই একটা আলোচনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে প্রবীণ রাজনীতিক আবুল হাশিম বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তরুণদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন, 'মাদ্রাসাশিক্ষা তোপের মুখে উড়িয়ে দাও।'

পল্টনের সম্মেলনে ছাত্রলীগের কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন করলেন সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ। প্রতিবেদনে 'শ্রেণিসংগ্রাম ত্বরান্বিত করে ধাপে ধাপে সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার' অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। প্রতিবেদনে অন্য বাম দলগুলো সম্বন্ধে পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলা হয় :

১. জনগণকে প্রস্তুত না করেই কর্মসূচি উপস্থাপন করার কারণে এই দলগুলোকে জনগণ গ্রহণ করেনি।
২. এই দলগুলো রাজনৈতিক আন্দোলন ধাপে ধাপে গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস করে না।
৩. তাদের আনুগত্য রাশিয়া অথবা চীনের প্রতি। তারা দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে লড়াই করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের আন্তর্জাতিক মুরব্বি এই লড়াইয়ে সমর্থন দেয়।
৪. আজ পর্যন্ত তারা দেশে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন নিজস্ব শক্তিতে গড়ে তুলতে বা নেতৃত্ব দিতে পারেনি। একটি গ্রুপ মস্কোর দালালি করছে, অন্যটি জনগণকে সংগঠিত না করে রাজনীতির নামে শুধু গুপ্তহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে।
৫. তারা আন্তর্জাতিকতাবাদকে জাতীয় রাজনীতির চালিকা শক্তি মনে করে।[৩১]

ইতিমধ্যে আলাউদ্দিন ও আবদুল মতিনের নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির একটি উপদল 'শ্রেণিসংগ্রাম' শুরু করে দিয়েছিল। বাহাত্তর সালের মাঝামাঝি নওগাঁ জেলার আত্রাই অঞ্চলে এই দলের সদস্যরা ওহিদুর রহমান ও টিপু বিশ্বাসের নেতৃত্বে 'শ্রেণিশত্রু খতমের' অভিযান শুরু করে। তাদের এই আন্দোলন মোকাবিলা করার জন্য সেনাবাহিনীর রংপুর ব্রিগেডকে ডেকে আনা হয়। এই বিগ্রেডের অধিনায়ক ছিলেন লে. কর্নেল শাফায়াত জামিল। শাফায়াত কঠোর হস্তে 'বিদ্রোহ' দমন করেন। সংঘর্ষে স্থানীয় অনেক তরুণ নিহত হন। নূর চৌধুরী ছিলেন শাফায়াত জামিলের অধীনে একজন ক্যাপ্টেন। তিনি ছাত্রজীবনে ছাত্র ইউনিয়নের মেনন গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

ছিলেন। তিনি শাফায়াত জামিলের 'বিদ্রোহ দমন পদ্ধতি'র প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি। পরে তদবির করে তিনি ঢাকায় বদলি হয়ে আসেন এবং সেনাবাহিনীর উপপ্রধান জিয়াউর রহমানের এডিসি নিযুক্ত হন। সরকারের বিরুদ্ধে নূরের তখন থেকেই প্রচণ্ড ক্ষোভ এবং বিদ্বেষ।[৩২]

১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস উপলক্ষে সিরাজপন্থী ছাত্রলীগের উদ্যোগে পল্টনে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় আ স ম আবদুর রব ইঙ্গিতে বলেন, 'শোষিত জনগণের' নিজস্ব রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হতে পারে যেকোনো দিন। কিন্তু একটা রাজনৈতিক দল করার জন্য কিছু আবশ্যকীয় শর্ত তখনো পূরণ হচ্ছিল না। যাদের নিয়ে দল করা হবে, তাদের প্রায় সবাই অল্প বয়সী, অনভিজ্ঞ। সিরাজুল আলম খান তাঁর নিজের সম্বন্ধে একটা প্রচ্ছন্ন ধারণা তৈরি করতে পেরেছিলেন যে, তিনি নেপথ্যে থেকে সবকিছু পরিচালনা করবেন, কিন্তু গণসংগঠনে কোনো পদে থাকবেন না। আবদুর রাজ্জাক এই গ্রুপের সঙ্গে সম্পর্কের ইতি টানায় সংকট তৈরি হয়েছিল। কারণ, তাঁকে সভাপতি করেই নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করার একটা পরিকল্পনা ছিল।

দলের সভাপতি কে হবেন, তা নিয়ে গুঞ্জন ছিল। আলীম আল রাজীকে নিয়ে আলোচনা হয়েছিল প্রস্তাবিত দলের সম্ভাব্য সভাপতি হিসেবে। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগও করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি বিদ্বান হলেও অত্যন্ত রক্ষণশীল মানসিকতার মানুষ ছিলেন। তাঁকে দিয়ে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের' তরি বেয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। ঠিক সেই সময় দৃশ্যপটে আবির্ভূত হলেন মেজর (অব.) মোহাম্মদ আবদুল জলিল।

জলিল মুক্তিযুদ্ধের সময় ছিলেন কনিষ্ঠতম মেজর। তিনি ৯ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি ছিলেন সাঁজোয়া বাহিনীর সদস্য এবং অত্যন্ত সাহসী। ডিসেম্বরে মুক্তিবাহিনী যখন খুলনা মুক্ত করে, তখন তিনি 'ভারতীয় বাহিনীর লুটপাটের' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর সঙ্গে আরও যাঁরা গ্রেপ্তার হন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ওই সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা এবং আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত নৌবাহিনীর প্রাক্তন লিডিং সি-ম্যান সুলতানউদ্দিন আহমদ ও মো. খুরশীদ। খুরশীদ ও সুলতানউদ্দিন অভিযোগ থেকে খালাস পেলেও জলিলকে সামরিক আদালতে বিচারের মুখোমুখি করা হয়। ওই আদালতের প্রধান ছিলেন মুক্তিবাহিনীর সেক্টর কমান্ডার লে. কর্নেল আবু তাহের। বিচারে জলিল নির্দোষ প্রমাণিত হন। কিন্তু তিনি সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেন। এর পর থেকেই তিনি

উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করতে থাকেন। তবে সুলতানউদ্দিনের সঙ্গে তাঁর সব সময় যোগাযোগ ছিল। মতিঝিলে সুলতানউদ্দিনের একটি অফিস ছিল। ওই অফিসে সিলিংয়ের মতো একটা কাঠের পাটাতন বানানো হয়, যাতে জলিল সেখানে রাতে ঘুমাতে পারেন। ঢাকায় তাঁর থাকার আর কোনো জায়গা ছিল না। পরে তিনি ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে একটা বাড়িতে উঠেছিলেন। সেখান থেকেও তাঁকে বের করে দেওয়া হয়।[৩৩]

মুক্তিযুদ্ধের শুরুর পর্যায়ে সিরাজুল আলম খান ঢাকা ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের দিকে যাওয়ার সময় পিরোজপুরে জলিলের সাক্ষাৎ পান। পরবর্তী সময়ে সুলতানউদ্দিনের মাধ্যমে এই যোগাযোগ বাড়তে থাকে। আগরতলা মামলার অনেক অভিযুক্তের সঙ্গেই সিরাজুল আলম খানের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। দীর্ঘদিন তিনি এঁদের সঙ্গে শেখ মুজিবের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ছিলেন।

জলিল যখন বুঝলেন সেনাবাহিনীতে তাঁর আর ভবিষ্যৎ নেই, তিনি রাজনীতির প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলেন। তাঁর প্রথম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল মহাখালীর তিতুমীর কলেজে (প্রাক্তন জিন্নাহ কলেজ) একটা ছাত্রসভায় ভাষণ দেওয়া। এর আয়োজন করেছিলেন তিতুমীর কলেজের ছাত্রনেতা, সুলতানউদ্দিনের ছোট ভাই কামালউদ্দিন আহমদ। পরে সার্জেন্ট জহুরুল হক হলেও তিনি একটা ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতা দেন।[৩৪] তিনি রাজনীতির পরিভাষা বুঝতেন না। তবে দেশের গরিব মানুষের জন্য কিছু একটা করার ইচ্ছা ছিল তাঁর। তিনি উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় তিনি 'ইতিহাসে' এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি এসেছেন একটা নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে এবং অন্য অনেক সেক্টর কমান্ডার তাঁকে যথেষ্ট 'এলিট' মনে করতেন না বলে তাঁরা তাঁকে এড়িয়ে চলতেন। একপর্যায়ে পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। সিরাজুল আলম খান, সুলতানউদ্দিন আহমদ এবং আ স ম আবদুর রবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তিনি সিদ্ধান্ত নেন, তিনি তাঁদের সঙ্গেই থাকবেন। বিষয়টা ছাত্রলীগের বেশির ভাগ নেতা-কর্মীর কাছে গোপন ছিল।

এর আগে সিরাজুল আলম খান তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে নতুন দল করা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেন। মুজিব বাহিনীর সঙ্গে তাজউদ্দীনের টানাপোড়েন থাকা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের সখ্য ছিল। শেখ মুজিব তাঁদের দুজনের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করতেন। আওয়ামী লীগের অন্য সিনিয়র নেতাদের মধ্যে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলী

ছিলেন শেখ মুজিবের খুবই অনুগত। জাতীয় নেতা হওয়ার মতো গুণাবলি তাঁদের ছিল না। দলের আরেক সিনিয়র নেতা খন্দকার মোশতাক আহমদ ছিলেন অত্যন্ত ধীরস্থির ও বুদ্ধিমান। শেখ মুজিবের সঙ্গে একমাত্র তাঁরই তুই-তুমি সম্পর্ক ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগের অনেক বিষয়ে এবং কাজে শেখ মুজিব তাঁকে সম্পৃক্ত করতে ভরসা পেতেন না।

মুজিবনগর সরকার পরিচালনা করার সময় তাজউদ্দীনের সঙ্গে মুজিব বাহিনীর বিরোধ হলেও মূল দ্বন্দ্বটা ছিল শেখ মনির সঙ্গে। শেখ মনি তাজউদ্দীনকে মনে করতেন কমিউনিস্টদের চর। শেখ মুজিব ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরে আসার পর শেখ মনি তাজউদ্দীনের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের কান ভারী করেছিলেন। এ নিয়ে তাজউদ্দীনের মনঃকষ্ট ছিল, যদিও প্রকাশ্যে তিনি কখনো শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি।[৩৫]

আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সরকারি পদে থাকলে দলের নেতৃত্বে থাকা যায় না। সে জন্য তাজউদ্দীনকে দলের সাধারণ সম্পাদকের পদ ছেড়ে দিতে হয়। শেখ মুজিব কিন্তু সভাপতির পদ ছাড়লেন না। সিরাজুল আলম খানের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি রাজ্জাককে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেননি। মনি নিজেও সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু দলের অনেক নেতা-কর্মী তাঁকে অপছন্দ করতেন।[৩৬] পরে জিল্লুর রহমানকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং আবদুর রাজ্জাককে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়।

বাহাত্তরের ৬ অক্টোবর সংবিধান তৈরির ব্যাপারে গণপরিষদের অধিকারের প্রশ্নে আ স ম রব ও শাজাহান সিরাজ একটি যৌথ বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তাঁরা বলেন :

> ৫০ জনের অধিক গণপরিষদের সদস্যের (যাঁরা দুর্নীতির দায়ে বহিষ্কৃত, অনুপস্থিত ও পদত্যাগী) অবর্তমানে, অর্থাৎ বাংলাদেশের এক কোটির বেশি নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই গণপরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। পরিষদ সদস্যদের প্রায় ৯০ শতাংশই যেখানে স্বাধীনতাসংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত না থেকে আরাম-আয়েশে গা ভাসিয়ে দিয়ে এবং নানা ধরনের অসামাজিক কাজে লিপ্ত থেকে স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালীন ভারতে নির্লিপ্ত জীবন যাপন করেছে, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত একটি স্বাধীন দেশের সংবিধান তৈরির অধিকার সেসব গণপরিষদ সদস্যের আদৌ আছে বলে দেশবাসী মনে করেন না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জনগণ নতুন করে ওই সব পরিষদ সদস্যের ভূমিকা ও চরিত্রের যে পরিচয় পেয়েছে, তা আরও কলঙ্কজনক।...বর্তমান ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক প্রণীত সংবিধান শাসক সম্প্রদায়ের চরিত্রগত কারণেই কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি জনতার আশা-

আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাই যেকোনো ধরনের একটি সংবিধান কেবল গণপরিষদে গৃহীত হওয়ার নাম দিয়ে জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা না করে সংবিধানকে জনসাধারণের আস্থা ভোট অর্জনের জন্য গণভোটের মাধ্যমে পাস করিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা দাবি জানাচ্ছি।[৩৭]

বাহাত্তরের ১২ অক্টোবর গণপরিষদে আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন খসড়া সংবিধান বিল উত্থাপন করেন। খসড়া সংবিধানের ওপর মতামত দেওয়ার ব্যাপারে সিরাজুল আলম খানের চিন্তাভাবনা ছিল। কিন্তু তাঁর অনুসারীদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যিনি এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ মতামত দিতে পারেন। *গণকণ্ঠ* অফিসে তিনি আ স ম রব এবং *গণকণ্ঠ*-এর রিপোর্টার মহিউদ্দিন আহমদকে ডেকে বললেন, বিষয়টি নিয়ে একজন বিজ্ঞ সংবিধান বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। ঠিক হলো, আলীম আল রাজীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর মতামত নেওয়া হবে। ১৬ অক্টোবর বিকেল পাঁচটায় রব এবং মহিউদ্দিন ধানমন্ডিতে আলীম আল রাজীর বাসায় গেলেন। আগেই রব ফোনে তাঁকে আসার উদ্দেশ্য জানিয়েছিলেন। আলোচনা শুরু হলো। মহিউদ্দিন নোট নিতে থাকলেন। আলোচনা যখন থামল, রাত তখন ১১টা। আলীম আল রাজীর সঙ্গে আলোচনার সূত্র ধরে মহিউদ্দিন একটা পর্যালোচনামূলক খসড়া তৈরি করে সিরাজুল আলম খানের হাতে দিলেন। সিরাজুল আলম খান খসড়ার ওপর আরও কিছু সংযোজন-বিয়োজন করলেন। ২০ অক্টোবর এই পর্যালোচনাটি আ স ম আবদুর রব ও শাজাহান সিরাজের নামে একটি বিবৃতি হিসেবে পত্রপত্রিকায় পাঠানো হলো।[৩৮] বিবৃতিতে উল্লেখযোগ্য মন্তব্যগুলোর মধ্যে ছিল :

— প্রস্তাবনায় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চকে স্বাধীনতা ঘোষণার তারিখ বলে খসড়া সংবিধানে যে কথা লেখা হয়েছে, তার সত্যতা কোথায়?

— আইনসভায় মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক, কৃষক ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকা উচিত ছিল।

— মহিলা আসনে নির্বাচনে সংসদ সদস্যদের পরিবর্তে সরাসরি সাধারণ ভোট গ্রহণ পদ্ধতি অনেক বেশি বাস্তব।

— প্রতিরক্ষা বিষয়ে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর মতো পেশাদার সেনাবাহিনী বহাল রাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যে দেশের স্বাধীনতা অর্জনে দেশরক্ষা বাহিনী জনগণের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিল এবং যে দেশ সমাজতন্ত্রমুখী, সে দেশে পেশাদার সেনাবাহিনী না রেখে 'পিপলস আর্মি' গঠন করাই বেশি যুক্তিসংগত।[৩৯]

উপসংহারে বলা হয়, এই সংবিধান মন্দের ভালো। সিরাজুল আলম খান বিবৃতিতে একটি ইংরেজি বাক্য জুড়ে দিয়েছিলেন: 'ইট ইজ এ ব্যাড কনস্টিটিউশন; বাট এ ব্যাড কনস্টিটিউশন ইজ বেটার দ্যান নো কনস্টিটিউশন।'[৪০]

২৫ মার্চ সন্ধ্যায় একটি স্বাধীনতার ঘোষণা শেখ মুজিবের ধানমন্ডির বাড়িতে লেখা হয়েছিল এবং সিরাজুল আলম খান নিজে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে দাবি করেছিলেন। ঘোষণার খসড়াটি তাজউদ্দীন ঠিকঠাক করে দেন। এতে বলা হয়:

> দি এনিমি হ্যাজ স্ট্রাক। হিট দেম ব্যাক। ভিক্টরি শ্যাল বি আওয়ার্স ইনশাআল্লাহ। জয় বাংলা (শত্রু আঘাত করেছে। তাদের প্রত্যাঘাত করতে হবে। জয় আমাদের হবেই ইনশাআল্লাহ)।

সিরাজুল আলম খান ২৫ মার্চ ঢাকার লালবাগ থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কামরায় বসে রাত কাটিয়েছিলেন। তিনি ওই কর্মকর্তার টেবিলের ওপর এই ঘোষণাটির একটি কপি দেখেছিলেন।

তাঁর মতে, বঙ্গবন্ধু বিষয়টা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে কোনো ঘোষণা দিয়ে যাননি। তিনি আরও বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধু সরাসরি ঘোষণা দিয়েছিলেন কি দেননি, এটা ওই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো, তাঁর নামে একটি ঘোষণা প্রচার করা হয়েছিল। এটা একটা মীমাংসিত বিষয়।[৪১] সুতরাং এই বিষয়টি নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি করার জন্য রব-সিরাজের বিবৃতিতে কেন স্বাধীনতা ঘোষণার তারিখ প্রসঙ্গটির উল্লেখ করা হলো, তা বোধগম্য নয়। একটা যুক্তি অবশ্য দেওয়া হয়ে থাকে, স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ না হয়ে ২৫ মার্চ হলো না কেন।

সিরাজুল আলম খান তাজউদ্দীন আহমদের পেছনে লেগে ছিলেন তাঁকে নতুন দলে টানার জন্য। ৩০ অক্টোবর সিরাজুল আলম খান ও আ স ম রবকে তাঁর বাসায় 'চা-নাশতা খাওয়ার দাওয়াত' দেন তাজউদ্দীন। তাঁরা শাজাহান সিরাজ, মোহাম্মদ শাজাহান ও নূরে আলম জিকুকে সঙ্গে নিয়ে মিন্টো রোডের মন্ত্রিপাড়ায় তাজউদ্দীনের বাসায় সারা রাত আলাপ-আলোচনা করেন। তাজউদ্দীনের সঙ্গে ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতা ময়েজউদ্দিন, মো. সিরাজুল ইসলাম, রহমত আলী ও রিয়াজুল হক। একপর্যায়ে তাজউদ্দীন রীতিমতো ভেঙে পড়েন। তিনি বুঝতে পারছিলেন, আওয়ামী লীগে তিনি ইতিমধ্যে যথেষ্ট কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। অথচ এই বৃত্তের বাইরে যাওয়ার মতো সাহস তাঁর ছিল না। বললেন, বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে এখন আর তাঁর কোথাও যাওয়ার উপায়

নেই। তবে তিনি কথা দেন, নতুন দল গড়তে সিরাজুল আলম খানদের তিনি যত দূর সম্ভব সহায়তা দেবেন। তাঁর এক সহযোগী রহমত আলীকে তিনি নতুন দলে তাঁর 'নমিনি' হিসেবে রাখার প্রস্তাব দেন।[৪২]

বাহাত্তরের ৩১ অক্টোবর সকালে এক সভায় 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)' নামে নতুন একটা রাজনৈতিক দল গঠনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন সিরাজুল আলম খান, কাজী আরেফ আহমেদ, মেজর জলিল, আ স ম রব, মনিরুল ইসলাম, শাজাহান সিরাজ, বিধানকৃষ্ণ সেন, নূরে আলম জিকু, মোশাররফ হোসেন, খন্দকার আবদুল মালেক, সুলতানউদ্দিন আহমদ, এম এ আউয়াল, রহমত আলী, শরীফ নুরুল আম্বিয়া ও হাসানুল হক ইনু। সাত সদস্যের একটা আহ্বায়ক কমিটি তৈরি করা হয়। জলিল ও রব যুগ্ম আহ্বায়ক মনোনীত হন। আহ্বায়ক কমিটির অন্য পাঁচজন সদস্য ছিলেন শাজাহান সিরাজ, বিধানকৃষ্ণ সেন, সুলতানউদ্দিন আহমদ, নূরে আলম জিকু ও রহমত আলী। দলের লক্ষ্য ও কর্মসূচি সম্পর্কে বলা হয় :

> বিপ্লবী চেতনার অধিকারী বাঙালি জাতির জীবনে কৃষক, শ্রমিক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকে গড়ে ওঠা সঠিক নেতৃত্বের মাধ্যমেই কেবল একটি সফল সামাজিক বিপ্লব সংগঠন ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারাই সেই ইঙ্গিত শ্রেণিহীন, শোষণহীন সমাজ ও কৃষক-শ্রমিকের রাজ কায়েম করা যেতে পারে।
>
> শ্রেণিদ্বন্দ্ব অবসানের জন্য শ্রেণিসংগ্রাম তীব্রতর করে সামাজিক বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার জন্য পরিস্থিতি ও পরিবেশগত কারণে 'সহায়ক শক্তি' হিসেবে রাজনৈতিক গণসংগঠনের যে ঐতিহাসিক প্রয়োজন, তা উপলব্ধি করেই এবং বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অনুমতি লাভ করে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বাংলাদেশের শোষিত, বঞ্চিত কৃষক-শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের নিজস্ব সংগঠন হিসেবে জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করছে এবং এই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক জনযুদ্ধ ঘোষণা করছে।
>
> জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল নিম্নলিখিত আদর্শ বাস্তবায়ন করবে :
>
> ১. বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রেণিহীন-শোষণহীন সমাজ ও কৃষক-শ্রমিকরাজ কায়েম।
>
> ২. বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সফল সামাজিক বিপ্লব সংগঠনে সকল প্রকার সহায়তা দান।
>
> ৩. সমাজতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করা।

৪. বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশের মাধ্যমে সামাজিক বিপ্লবের প্রয়োজনে বিপ্লবী চেতনার জন্ম দেওয়া ও বাঙালি কৃষ্টি-সংস্কৃতি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের মাধ্যমে বাঙালি জাতির জাতিসত্তা অক্ষুণ্ন রাখা।
৫. সাম্প্রদায়িকতার বিষদাঁত ভেঙে ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে বাঙালি মনোভাবের ভিত্তিতে মেহনতি জনতার ঐক্য গড়ে তোলা।
৬. যুদ্ধজোট-বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বন। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি, রাষ্ট্রীয় মর্যাদা হানিকর সকল প্রকার গোপন ও প্রকাশ্য চুক্তি বাতিল। মানবসভ্যতার দুশমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদসহ সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমেরিকা, ভারত, রাশিয়া, চীনসহ যেকোনো রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং এসব দেশের যেকোনো প্রকার অসৎ উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে দেশবাসীর জঙ্গি ঐক্য সৃষ্টি করা।
৭. বিশ্বের সকল প্রকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা দান। বিশ্বের মেহনতি মানুষের সাথে একাত্মতা ঘোষণা।
৮. সামাজিক বিপ্লবের প্রয়োজনে জনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সকল প্রকার পন্থা অবলম্বন করা।

তাই জাতির এ যুগসন্ধিক্ষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রয়োজন এবং বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়নক ও পুতুল সরকারকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে এবং আগামী দিনের সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা শ্রেণিহীন-শোষণহীন সমাজ ও কৃষক-শ্রমিকরাজ কায়েমের জন্য দেশের ভেতরে ও বাইরে প্রবল জনমত সৃষ্টির নিমিত্ত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের পতাকাতলে জমায়েত হওয়ার জন্য আমরা দেশের ছাত্র-যুব শক্তি, মুক্তিযোদ্ধা, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, বাস্তুহারা, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, কৃষক-শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের নিকট উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা

জয় বাংলার মেহনতি মানুষ।[৪৩]

জাসদের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে রহমত আলীকে নিয়ে একটা নাটক হলো। শেখ মনির লোকেরা তাঁকে অপহরণ করে লুকিয়ে রাখলেন। তাঁর কাছ থেকে জোর করে একটা বিবৃতি আদায় করা হলো। বিবৃতিতে বলা হলো, এই কমিটির সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই; তাঁর সঙ্গে

কোনো আলোচনা না করে তাঁর অজান্তেই কমিটিতে তাঁর নাম দেওয়া হয়েছে। *বাংলার বাণী* জাসদের আহ্বায়ক কমিটির সাতজনের ছবি ছাপল। ডান দিকের শেষ ছবিটা ছিল রহমত আলীর। ছবির ওপর একটা ক্রস চিহ্ন দেওয়া। সংবাদের শিরোনাম ছিল, 'প্রথম রজনীতেই একটি তারা খসিয়া পড়িল'।[৪৪]

গণপরিষদের সদস্য ও জাতীয় কৃষক লীগের সভাপতি খন্দকার আবদুল মালেক একটা বিবৃতি দিয়ে জাসদে যোগ দেন। পরদিন আওয়ামী লীগ থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে গণপরিষদে তাঁর সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়। সাতক্ষীরার গণপরিষদ সদস্য স ম আলাউদ্দিন একটি দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে জাসদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন। বিবৃতিটির খসড়া তৈরি করেন *গণকণ্ঠ* পত্রিকার সহসম্পাদক এ কে ফজলুল আহাদ ও প্রতিবেদক মহিউদ্দিন আহমদ। রহমত আলীর ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, সে জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। স ম আলাউদ্দিনকে ফজলুল আহাদের জিম্মায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলের ৩২৩ নম্বর কক্ষে কড়া নজরদারির মধ্যে রাখা হয়। স ম আলাউদ্দিনের বিবৃতি ছাপা হওয়ার পরদিনই তাঁকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়। গণপরিষদের আরও কয়েকজন সদস্য জাসদে যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছিল। কিন্তু ভয়ে কেউ আর সে মুখো হননি।[৪৫]

ওই সময় যদি জাসদের জন্ম না হতো, তাহলে ছাত্রলীগের 'র‍্যাডিকেল' অংশটি কোথায় যেত, এ নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা ছিল। আওয়ামী লীগের মতো একটি রক্ষণশীল দলে তাদের কোনো ভবিষ্যৎ ছিল না। অনেকেই হয়তো বিভিন্ন 'চরমপন্থী' দলে যোগ দিত। ছাত্রলীগের এই অংশটির ওপর পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির নজর ছিল বেশ কিছুদিন ধরে। জাসদ গঠিত হওয়ার পর সিরাজ শিকদার আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'আমাদের রিক্রুটমেন্ট লাইন বন্ধ হয়ে গেল।'[৪৬]

১৯৭২ সালের ১১ নভেম্বর শেখ ফজলুল হক মনি বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনীতিতে টিকে থাকার জন্য তাঁর একটি প্ল্যাটফর্মের খুবই প্রয়োজন ছিল। তাঁর পক্ষে আওয়ামী লীগে ঢোকা ওই মুহূর্তে সম্ভব ছিল না। যুবলীগ খুব দ্রুত বেড়ে ওঠে। নূরে আলম সিদ্দিকীকে সাধারণ সম্পাদক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।[৪৭] শেখ মনির তখন ধ্যান-জ্ঞান প্রধানত দুটো—আওয়ামী লীগকে চাপে রেখে নীতিনির্ধারণে যত দূর সম্ভব অংশ নেওয়া এবং জাসদের অগ্রযাত্রা যেকোনো উপায়ে ঠেকিয়ে রাখা।

বাহাত্তরের ডিসেম্বরে জাতীয় শ্রমিক লীগ ভেঙে গেল। দলের প্রধান তিন নেতার মধ্যে দুজন—মোহাম্মদ শাজাহান ও রুহুল আমিন ভূঁইয়া জাসদের প্রতি

সমর্থন জানালেন। অপর নেতা আবদুল মান্নান আওয়ামী লীগের সঙ্গেই থেকে গেলেন। এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি হুংকার দিয়ে বললেন, 'মুজিববাদের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে আমরা তার জিহ্বা ছিঁড়ে ফেলব।'[৪৮]

খন্দকার আবদুল মালেক ও হাসানুল হকের নেতৃত্বাধীন জাতীয় কৃষক লীগের প্রায় পুরো কমিটিই ছিল সিরাজপন্থী। সুতরাং, আওয়ামী লীগকে নতুন করে একটা কৃষক ফ্রন্ট তৈরি করতে হলো। নাম একই থাকল, জাতীয় কৃষক লীগ।

জাসদ, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ ও ছাত্রলীগ—সব কটি গণসংগঠনই দাবি করল, তারা আসন্ন বিপ্লবের 'সহায়ক শক্তি'। আলোচনা ও গুঞ্জন শুরু হলো, তাহলে বিপ্লবের মূল শক্তি কোনটি। এর জবাব পেতে অপেক্ষা করতে হলো আরও প্রায় দুই বছর।

তথ্যনির্দেশ

১. *The Bangladesh Observer*, 22 December 1971.
২. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭১।
৩. *The Bangladesh Observer*, 26 December 1971.
৪. *The Bangladesh Observer*, 29 December 1971.
৫. উবান, পৃ. ১৩৪।
৬. আফতাবউদ্দিন আহমদের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৭. বাহাউদ্দিন চৌধুরীর সঙ্গে আলাপচারিতা।
৮. মিয়া, পৃ. ১২১-১২২।
৯. *The Bangladesh Gazette, Extraordinory*, 11 January 1972.
১০. শাজাহান সিরাজের সঙ্গে আলাপচারিতা।
১১. *The Bangladesh Observer*, 15 January 1972.
১২. মিয়া, পৃ. ১২৪।
১৩. সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
১৪. উবান, পৃ. ১৪০-১৪২।
১৫. সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
১৬. ওই।
১৭. কাজী আরেফ আহমেদের সঙ্গে আলাপচারিতা।
১৮. বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (১৯৭২), সাধারণ সভা ও বর্ধিত সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী প্রস্তাবাবলি, ৫-৭ এবং ১৯-২৩ মার্চ, মোস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক প্রকাশিত, ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি, ঢাকা, পৃ. ২।
১৯. *দৈনিক বাংলা*, ২৭ মার্চ ১৯৭২।
২০. আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে আলাপচারিতা।

২১. বদিউল আলমের সঙ্গে আলাপচারিতা।
২২. আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে আলাপচারিতা।
২৩. আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে আলাপচারিতা।
২৪. আ স ম আবদুর রবের সঙ্গে আলাপচারিতা।
২৫. লেখকের স্মৃতি থেকে।
২৬. *গণকণ্ঠ*, ২৬ মে ১৯৭২।
২৭. *বাংলার বাণী*, ২৭ মে ১৯৭২।
২৮. *বাংলার বাণী*, ৩০ মে ১৯৭২।
২৯. *সংবাদ*, ২ জুন ১৯৭২।
৩০. আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৩১. বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (১৯৭২), সাধারণ সম্পাদকের কার্যবিবরণী, ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি, ঢাকা, পৃ. ১৪-২১
৩২. Khasru B. Z. (2014), *The Bangladesh Military Coup and the CIA Link*, Rupa Publications India Pvt. Ltd., New Delhi, p. 184.
৩৩. করপোরাল (অব.) আবদুল মজিদ ও কামালউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে আলাপচারিতা। করপোরাল মজিদ ৯ নম্বর সেক্টরে জলিলের সহযোদ্ধা ছিলেন। কামালউদ্দিন ছিলেন সুলতান উদ্দিনের ছোট ভাই।
৩৪. কামালউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৩৫. Karim, p. 264-267.
৩৬. আ স ম আবদুর রবের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৩৭. *গণকণ্ঠ*, ৭ অক্টোবর ১৯৭২।
৩৮. লেখকের স্মৃতি থেকে।
৩৯. *গণকণ্ঠ*, ২১ অক্টোবর ১৯৭২।
৪০. লেখকের স্মৃতি থেকে, *গণকণ্ঠ*, ২১ অক্টোবর ১৯৭২।
৪১. সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৪২. আ স ম আবদুর রবের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৪৩. *গণকণ্ঠ*, ১ নভেম্বর ১৯৭২।
৪৪. *বাংলার বাণী*, ২ নভেম্বর ১৯৭২।
৪৫. লেখকের স্মৃতি থেকে।
৪৬. আকা ফজলুল হকের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৪৭. মিয়া, পৃ. ১৪৫।
৪৮. লেখকের স্মৃতি থেকে।

বিস্তার

ষাটের দশকে সিরাজুল আলম খানকে কেন্দ্র করে যে 'নিউক্লিয়াস' গড়ে উঠেছিল, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গঠনের ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই গ্রুপের সঙ্গে সম্পর্কিত সিরাজপন্থীদের মধ্যে বেশ সাড়া পড়ে যায়। জেলা পর্যায়ে যাঁরা এই গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, তাঁদের অনেকেই নতুন এই দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মির্জা সুলতান রাজা (কুষ্টিয়া), কামরুজ্জামান টুকু (খুলনা), এ বি এম শাহজাহান (বগুড়া), মোস্তাফিজুর রহমান মুকুল (রংপুর), আখতার আহমেদ (সিলেট), হাবিবুল্লাহ চৌধুরী (কুমিল্লা), আহমেদ শরীফ মনির (চট্টগ্রাম), মোস্তাফিজুর রহমান (নোয়াখালী), খন্দকার আবদুল বাতেন (টাঙ্গাইল), শাজাহান খান (মাদারীপুর) প্রমুখ। প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই সিরাজপন্থীদের মধ্যে একটা অনানুষ্ঠানিক সাংগঠনিক প্রক্রিয়া চালু ছিল। বাহাত্তরের মে মাসে ছাত্রলীগের ভাঙনের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে যে নতুন মেরুকরণ হয়, তাতে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে থেকে নতুন একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করার জন্য ক্রমাগত চাপ আসছিল। ৩১ অক্টোবর জাসদের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হলে জেলা পর্যায়ে দুজন করে যুগ্ম আহ্বায়ক নিয়ে সাত সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি তৈরি শুরু হয়। এভাবে ১৯৬২ সালে যে 'নিউক্লিয়াস' যাত্রা শুরু করেছিল, জাসদ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তা একটা পরিপূর্ণ রূপ পায়।

বাহাত্তর সালের ১৩ নভেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবে জাসদের আহ্বায়ক কমিটির পক্ষ থেকে প্রথম সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। প্রথম দিকে দলের তরফে জনসংযোগের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই লক্ষ্যে ১৭ নভেম্বর ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ দিকের চত্বরে জাসদের

জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন মেজর (অব.) এম এ জলিল ও আ স ম আবদুর রব

প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা স্টেডিয়ামের টিকিট কাউন্টারের ছাদটি ব্যবহার করা হয় মঞ্চ হিসেবে। সভায় জলিল ও রব দুর্নীতি, ষড়যন্ত্র ও গুপ্তহত্যার অভিযোগ এনে সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। ঢাকার নবাবগঞ্জ থানার জাতীয় কৃষক লীগের নেতা এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ সিদ্দিক মাস্টার ১২ নভেম্বর এশার নামাজের ওজু করার সময় আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। জাসদ অভিযোগ করে, আওয়ামী লীগের সশস্ত্র ক্যাডাররা এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। দলীয় সংকীর্ণতার ব্যাপ্তি এত ব্যাপক ছিল যে, অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

বাহাত্তরের ১৪ ডিসেম্বর গণপরিষদে বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়। গণপরিষদের সদস্যরা সংবিধানে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষর দেন। ১৫ ডিসেম্বর মধ্যরাত থেকে গণপরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। ১৭ ডিসেম্বর বঙ্গভবনে মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যদের নিয়ে শেখ মুজিব সংবিধানের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে নতুন করে শপথ নেন। ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়।

জাসদের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন বাহাত্তরের ২৩ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলে ৫১ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। মেজর জলিল সভাপতি, আ স ম আবদুর রব সাধারণ সম্পাদক ও শাজাহান সিরাজ যুগ্ম সম্পাদক হন। আহ্বায়ক কমিটির প্রতিবেদন উপস্থাপনের সময় রব 'জনগণকে সকল শক্তি নিয়ে

আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন গণবিরোধী সরকারকে উৎখাত করার' আহ্বান জানান।[১] সরকারের কথিত অগণতান্ত্রিক আচরণের প্রতিবাদে প্রকাশ্যে সরকার উৎখাতের এই আহ্বান বলা বাহুল্য গণতান্ত্রিক রীতিনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। তবে রাজনীতিতে আপন উপস্থিতি প্রবলভাবে জানান দিতে শব্দচয়নে চরমপন্থা অবলম্বন করা একটা অতিপরিচিত রণকৌশল। জাসদ এই 'অ্যাজিটেশনাল পলিটিকসের' গতানুগতিক ধারার বাইরে যেতে পারেনি। অন্তত শুরুটা সেরকমই ছিল।

কাউন্সিল সভায় দলের একটা খসড়া ঘোষণাপত্র নিয়ে আলোচনা হয়। ঘোষণাপত্রে রাষ্ট্র, সংবিধান, কৃষিনীতি, শ্রমনীতি ও শিল্পনীতি সম্পর্কে বক্তব্য ছিল। সেনাবাহিনীকে 'পিপলস আর্মি' হিসেবে পুনর্গঠনের আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, 'দেশ রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনীকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে।'[২]

তেহাত্তর সালের ১ জানুয়ারি ঢাকায় একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। ভিয়েতনামে মার্কিন বাহিনীর নির্বিচার বোমাবর্ষণের প্রতিবাদে ছাত্র ইউনিয়ন বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তাদের একটি মিছিল তোপখানা রোডে মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের কাছে গেলে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। কয়েকজন ছাত্র তথ্যকেন্দ্রের ছাদে উঠে মার্কিন পতাকা নামিয়ে সেখানে ভিয়েতনামের পতাকা তোলার চেষ্টা করেন। ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ গুলি ছোড়ে। পুলিশের গুলিতে মতিউল ও কাদের নামে ছাত্র ইউনিয়নের দুজন কর্মী নিহত হন। বিক্ষোভ দমনের চিরাচরিত ঔপনিবেশিক কৌশল, অর্থাৎ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার নামে জনতার ওপর লাঠিপেটা, কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ এবং গুলি করার এই প্রবণতা স্বাধীন দেশেও অব্যাহত থাকল।

২ জানুয়ারি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) সরকারের পদত্যাগ দাবি করে একটা বিবৃতি দেয়। ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ ভট্টাচার্য বিবৃতিতে বলেন, 'আওয়ামী লীগ সরকারের এই বর্বরোচিত ছাত্রহত্যা আইয়ুব-মোনায়েম স্বৈরাচারী সরকারের কার্যকলাপের নামান্তর। যে সরকার ছাত্র-জনতার রক্তে হাত কলুষিত করেছে, সে সরকারের বিরুদ্ধে দেশবাসীর সংগ্রামকে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা দেশবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে খুনি আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগ দাবি করছি।'[৩]

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও ডাকসু এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাতটি দাবি উত্থাপন করে। দাবিগুলোর মধ্যে ছিল :

১. ছাত্রহত্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী বা যেকোনো মন্ত্রীই হোক না কেন, তাঁর অপসারণ;
২. দোষী পুলিশ কর্মচারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি;
৩. বাংলাদেশে সকল মার্কিন প্রচার ও তথ্যকেন্দ্র সরকারিভাবে বন্ধ ঘোষণা; সরকারিভাবে ভিয়েতনামে মার্কিন হামলার নিন্দা জানানো;
৪. ভিয়েতনাম থেকে অবিলম্বে মার্কিন সৈন্য অপসারণ;
৫. দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন;
৬. ১ জানুয়ারির ঘটনার ওপর প্রকাশিত সম্পূর্ণভাবে বানোয়াট ও মিথ্যা সরকারি প্রেস নোট প্রত্যাহার;
৭. দমননীতি বাতিল।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ৩ জানুয়ারি মণি সিংহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় ছাত্রদের সাত দফা দাবি মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।[৪]

৩ জানুয়ারি ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদ প্রাঙ্গণে এক জনসভায় আ স ম আবদুর রব ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে কড়া বক্তব্য দেন।[৫]

বিরোধীদলীয় একটি সংগঠনের এরকম 'ঔদ্ধত্য' সহ্য করার মতো মানসিকতা আওয়ামী লীগের ছিল না। ৪ জানুয়ারি আবদুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর একটি দল তোপখানা রোডে মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের পাশে অবস্থিত ন্যাপের এবং পুরানা পল্টনে ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় অফিসে হামলা করে এবং সবকিছু তছনছ করে দেয়। ছাত্র ইউনিয়ন ও ন্যাপের একটি মিছিলে তারা অতর্কিত আক্রমণ করে অনেককে আহত করে। এই প্রতি-আক্রমণে দিশাহারা হয়ে ছাত্র ইউনিয়ন তাদের আন্দোলনের ইতি টানে।

সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর কয়েকটি বিরোধী দল নির্বাচনের আগে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সর্বদলীয় সরকার গঠনের দাবি জানায়। ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রমনায় এক ছাত্র সমাবেশে শেখ মুজিব সর্বদলীয় সরকারের দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, নির্বাচনের আগে সরকারের পদত্যাগ করার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব হাইকোর্টের একজন বিচারকের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।[৬]

৪ জানুয়ারি জাসদ-সমর্থিত ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাত্রজমায়েত শেষে মিছিলের পরিকল্পনা ছিল। এ সময় হঠাৎ

আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর একটা মিছিল সেখানে আসে এবং ছাত্রলীগের জমায়েতের ওপর হামলা চালায়। তারা মাইক ছুড়ে ফেলে দেয় এবং যাকে সামনে পায়, তাকেই পেটাতে থাকে। তারা ছাত্রলীগের সভাপতি শরীফ নুরুল আম্বিয়ার হাত ভেঙে দেয় এবং সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম মাহবুবুল হকের মাথা ফাটিয়ে দেয়। মাস খানেক তাঁদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে থাকতে হয়।

জাসদ তেহাত্তরের ৭ মার্চের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি জাসদ 'ওয়াদার ভাঁওতাবাজি নয়, আন্দোলনের ডাক'—এই স্লোগান দিয়ে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে। ইশতেহারে বলা হয়, 'নির্বাচন সাধারণ মানুষকে ঠকানোর বুদ্ধি ছাড়া কিছু নয়। জাসদ এই নির্বাচনকে তার মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পরিচালিত আন্দোলনের একটি পর্যায় হিসেবে গ্রহণ করেছে।' ইশতেহারে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ারও দাবি জানানো হয়।[৭]

সবাই জানত, আওয়ামী লীগ নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে 'নৌকা' চাইবে। জাসদও 'নৌকা' চেয়ে আবেদন করে। তবে দ্বিতীয় পছন্দ হিসেবে চায় 'মশাল'। নির্বাচন কমিশন আওয়ামী লীগকে 'নৌকা' এবং জাসদকে 'মশাল' বরাদ্দ করে। জাসদের পক্ষে শাজাহান সিরাজ নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে 'নৌকা' প্রতীক না দেওয়ার অভিযোগে হাইকোর্টে মামলা ঠুকে দেন। মামলাটি ছিল বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীর এজলাসে। শাজাহান সিরাজের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন আলীম আল রাজী। নির্বাচন কমিশনের যুক্তি ছিল, আওয়ামী লীগ ইতিপূর্বে সব নির্বাচনে 'নৌকা' প্রতীক বরাদ্দ পেয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ১৯৫৪ ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনের উল্লেখ করা হয়। আলীম আল রাজী যুক্তি দেন, চুয়ান্ন সালে আওয়ামী লীগ নির্বাচন করেনি, 'নৌকা' ছিল যুক্তফ্রন্টের প্রতীক। সত্তরের নির্বাচনে 'নৌকা' ছিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রতীক। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবারই প্রথম নির্বাচন করছে। এরপর মামলা খারিজ হয়ে যায়।

আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্যান্য দলের মধ্যে একমাত্র জাসদ ৩০০ আসনের সব কটিতে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। জাসদ ছিল একটা নতুন দল, বয়স মাত্র চার মাস। সব থানায় তো দূরের কথা, সব জেলায়ও এর পূর্ণাঙ্গ কমিটি ছিল না। ফলে, অনেক প্রার্থী একাধিক আসনে মনোনয়ন চান। মেজর জলিল সাতটি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেন। এর মধ্যে ছয়টি ছিল তাঁর নিজ জেলা বরিশালে এবং একটি ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট এলাকা।

মশাল মার্কায় দিয়ে ভোট
কৃষক শ্রমিক বাঁধো জোট

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)

১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে জাসদের প্রচারপত্র

শেখ মুজিব চারটি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেন। এর মধ্যে একটি ছিল ভোলায়। ওই এলাকায় ডা. আজহারউদ্দিন ছিলেন জাসদের একজন শক্তিশালী প্রার্থী। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিন আওয়ামী লীগের কতিপয় লোক ডা. আজহারকে অপহরণ করে। ফলে তাঁর মনোনয়নপত্র জমা পড়েনি। ভোলার ওই আসনে শেখ মুজিবকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের আরও ছয়জন প্রার্থী 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা'য় নির্বাচিত হন।

নির্বাচনের দিন সকালে একটা ঘটনা ঘটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভোটকেন্দ্রে ভোট দিয়ে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম মাহবুবুল হক ও *গণকণ্ঠ*-এর নির্বাহী সম্পাদক আফতাবউদ্দিন কলাভবনের একতলার বারান্দায় রেলিংয়ের ওপর বসে ছিলেন। বেলা ১১টা হবে। শেখ কামাল কয়েকজন সহযোগীসহ তাঁদের জোর করে একটা গাড়িতে ওঠান। গাড়িতে তাঁদের চোখ বেঁধে ফেলা হয়। পরে তাঁদের একটা বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। সারা দিন তাঁদের সেখানে আটকে রাখা হয়। তাঁদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়। আফতাব পরে বলেছিলেন, তাঁদের আবাহনী ক্লাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রাত নয়টার দিকে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। শর্ত ছিল, এসব কথা পত্রিকায় লেখা যাবে না। তাঁদের অপহরণের সংবাদ পেয়ে *গণকণ্ঠে*তে একটা সংবাদ তৈরি করা হয়েছিল। তাঁরা ফিরে আসার পর সংবাদটা আর ছাপানো হয়নি।[৮]

নির্বাচনে চৌদ্দটি রাজনৈতিক দলের এক হাজার ৮৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এ ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন ১১৮ জন। মহিলা প্রার্থী ছিলেন মাত্র ১৫ জন। মোট ভোটারের ৫৫.৬১ শতাংশ ভোট দেন।

আওয়ামী লীগ ২৯২টি আসনে জয়লাভ করে। এর মধ্যে সাতজন আগেই 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা'য় নির্বাচিত হয়েছিলেন। অন্যান্য দলের মধ্যে শুধু জাতীয় লীগের আতাউর রহমান খান ঢাকার ধামরাই থেকে এবং জাসদের আবদুস সাত্তার টাঙ্গাইল থেকে নির্বাচিত হন। এ ছাড়া পাঁচজন স্বতন্ত্র প্রার্থীও নির্বাচিত হন। তাঁদের মধ্যে দুজন ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের।[৯] একজন প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে একটি আসনে নির্বাচন স্থগিত ছিল (পরিশিষ্ট ৩)।

জাসদ ছিল মূলত তরুণদের দল। এর কর্মী-সমর্থকদের বেশির ভাগই ছিলেন ছাত্র। নির্বাচনে জাসদের প্রার্থীরাও ছিলেন অল্প বয়সী তরুণ। তাঁদের মধ্যে ৪৩ শতাংশের বয়স ছিল ২৫ কিংবা তারও নিচে। অনেকেই বয়স

বাড়িয়ে প্রার্থী হয়েছিলেন। ৪১ শতাংশ প্রার্থীর বয়স ছিল ২৬ থেকে ৩৫ বছর। মাত্র ২ শতাংশ প্রার্থীর বয়স ছিল ৪০-এর বেশি।[১০]

নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে অভিযোগ ছিল কমবেশি সব দলেরই। ৯ মার্চ এক সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন-পরবর্তী প্রতিক্রিয়া জানায় জাসদ। আ স ম আবদুর রব একটা লিখিত বিবৃতিতে বলেন, বিরোধী দলের প্রার্থীদের পরাজিত হতে বাধ্য করা হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে জলিল বলেন, তাঁর দলকে পোলিং এজেন্ট দিতে দেওয়া হয়নি। জাল ভোট দেওয়া হয়েছে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছে এবং নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণায় কারচুপি করা হয়েছে।[১১]

ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ ভট্টাচার্য ৯ মার্চ একটি যুক্ত বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তাঁরা বলেন :

> কমপক্ষে ৭০টি নির্বাচনী আসনে যেখানে ন্যাপ ও অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের সুনিশ্চিত বিজয়ের সম্ভাবনা ছিল, সেই আসনসমূহে শাসকদল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার, অস্ত্রের ঝনঝনানি, ভয়ভীতি, সন্ত্রাস প্রয়োগ, গুন্ডাবাহিনী ব্যবহার, ভুয়া ভোট, পোলিং বুথ দখল, পোলিং এজেন্ট অপহরণ, বিদেশি সাহায্য সংস্থা, জাতিসংঘ, সরকারি গাড়ি এবং রেডক্রসের গাড়ির অপব্যবহার প্রভৃতি চরম অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের মাধ্যমে উক্ত নির্বাচনী কেন্দ্রসমূহে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করিয়াছে এবং বিরোধী দলের প্রার্থীদেরকে জোরপূর্বক পরাজিত করিয়াছে। চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া জাতীয় সংসদ আসন নং ২৯৪, চট্টগ্রাম ১৪ আসনে ন্যাপ প্রার্থী মোস্তাক আহমদ চৌধুরীকে সংবাদপত্র, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, ভয়েস অব আমেরিকা তথা দেশি-বিদেশি পত্রপত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমাদের নিকট উদ্বেগজনক খবর আসিয়াছে যে, ন্যাপ প্রার্থী জনাব মোস্তাক আহমদ চৌধুরীকে পরাজিত বলিয়া ঘোষণা দেওয়ার প্রস্তুতি শাসকদল গ্রহণ করিতেছে।[১২]

শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দলের আহ্বায়ক খান সাইফুর রহমান জাতীয় প্রেসক্লাবে ১১ মার্চ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেন, 'মেজর জলিল (জাসদ), ড. আলীম আল রাজী (ন্যাপ-ভাসানী), জনাব মোস্তাক আহমদ চৌধুরী (ন্যাপ-মোজাফ্ফর), কাজী হাতেম আলী (শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দল) এবং আরও কয়েকটি জায়গায় নিশ্চিতভাবে বিরোধী দলগুলি জয়লাভ করিয়াছে।'[১৩]

১০ মার্চ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী একটি বিবৃতিতে বলেন :

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুলভাবে জয়লাভ করিয়াছে। কতকগুলো আসনে যেখানে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হয়, সেই সকল স্থানে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের তরফ হইতে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের পরিপন্থী অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া বহু অভিযোগ রহিয়াছে। এতৎসত্ত্বেও ইহা অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের ব্যাপক জনসাধারণ এই নির্বাচনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁহার দলের প্রতি অকুণ্ঠ আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছে। আমরা জনগণের সেই রায়কে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করিতেছি।[১৪]

একজন মার্কিন কূটনীতিকের পর্যবেক্ষণ ছিল, 'তেহাত্তরের মার্চ মাসের নির্বাচন হলো শেষ যাত্রার শুরু। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জিতেছিল বিপুলভাবে। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতারা ভোট নিয়ে ছেলেখেলা করেছে এবং জালিয়াতি থেকে নিজেদের নিবৃত্ত রাখতে পারেনি।'[১৫]

নির্বাচনের ফলে যে জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠিত হলো, সেখানে বিরোধী দল বলতে সত্যিকার অর্থে তেমন কিছুই ছিল না। ব্যাপারটা ছিল খুবই দৃষ্টিকটু। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রবীণ রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন :

> আমি আওয়ামী-নেতৃত্বকে পরামর্শ দিয়াছিলাম, বিরোধী পক্ষের অন্তত জন-পঞ্চাশেক নেতৃস্থানীয় প্রার্থীকে নির্বাচনে জয়লাভ করিতে দেওয়া উচিত। তাতে পার্লামেন্টে একটি সুবিবেচক গণতন্ত্রমনা গঠনমুখী অপজিশন দল গড়িয়া উঠিবে।
>
> আমার পরামর্শে কেউ কান দিলেন না। বিরোধী দলসমূহের ওই নিশ্চিত বিজয় সম্ভাবনার উল্লাসের মধ্যে আওয়ামী লীগের পক্ষে অমন উদার হওয়াটা বোধ হয় সম্ভবও ছিল না। রেডিও-টেলিভিশনে অপজিশন নেতাদের বক্তৃতা দূরের কথা, যানবাহনের অভাবে তাঁরা ঠিকমতো প্রচার চালাইতেও পারিলেন না। পক্ষান্তরে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব হেলিকপ্টারে দেশময় ঘূর্ণিঝড় ট্যুর করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীরাও সরকারি যানবাহনের সুবিধা নিলেন।...
>
> তিন শ পনেরো সদস্যের পার্লামেন্টে জনা-পঁচিশেক অপজিশন মেম্বর থাকিলে সরকারি দলের কোনোই অসুবিধা হইত না। বরঞ্চ ওই সব অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান অপজিশনে থাকিলে পার্লামেন্টের সৌষ্ঠব ও সজীবতা বৃদ্ধি পাইত। তাঁদের বক্তৃতা বাগ্মিতায় পার্লামেন্ট প্রাণবন্ত, দর্শনীয় ও উপভোগ্য হইত। সরকারি দলও তাতে উপকৃত হইতেন। তাঁদের গঠনমূলক সমালোচনার জবাবে বক্তৃতা দিতে গিয়া সরকারি দলের মেম্বাররা নিজেরা ভালো ভালো দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান হইয়া উঠিতেন। বাংলাদেশের পার্লামেন্ট

পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের একটা ট্রেনিং কলেজ হইয়া উঠিত। আর এসব শুভ পরিণামের সমস্ত প্রশংসা পাইতেন শেখ মুজিব।

কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য এই যে শেখ মুজিব এই উদারতার পথে না গিয়া উল্টা পথ ধরিলেন। এইসব প্রবীণ ও দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ানকে পার্লামেন্টে ঢুকিতে না দিবার জন্য তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করিলেন।

কিন্তু আমি দেখিয়া খুবই আতঙ্কিত ও চিন্তাযুক্ত হইলাম যে নির্বাচন চলাকালে আওয়ামী নেতৃত্ব অপজিশনের প্রতি যে মনোভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেটা সাময়িক অবিবেচনাপ্রসূত ভুল ছিল না। তাঁরা যেন নীতি হিসাবেই এই পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন।...

আমি *ইত্তেফাক*-এ লিখিয়াছিলাম, '৭০ সালের নৌকা ও এবারকার নৌকার মৌলিক পার্থক্য আছে। '৭০ সালেরটা ছিল চড়িবার নৌকা। এবারকারটা চালাইবার নৌকা। নৌকা চালাইতে হইলে ডাইনে-বাঁয়ে দুই সারি দাঁড়ি লাগে। নৌকার হাল ধরিবেন শেখ মুজিব নিজেই ঠিকই, কিন্তু দাঁড়ি হইবেন দুই কাতারের। সব দাঁড়ি একদিক হইতে দাঁড় টানিলে নৌকা সামনে চলিবার বদলে ঘুরপাক খাইয়া ডুবিতে পারে।[১৬]

আবুল মনসুর আহমদের এই পর্যালোচনা ছিল খুবই প্রাসঙ্গিক ও অর্থবহ। এরকম একপেশে পার্লামেন্ট অকার্যকর হতে খুব বেশি দিন সময় নেয়নি। নতুন রাষ্ট্রের শুরুতেই গণতন্ত্রায়ণের প্রক্রিয়া হোঁচট খায়।

শেখ মুজিব মনে করতেন, বাংলাদেশে সত্যিকার কোনো বিরোধী দল গড়ে উঠবে না। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ও জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের অভিজ্ঞতা ও মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। আহমদ ছফার সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি বলেছিলেন :

সেভেন্টি টুতে একবার ইউনিভার্সিটির কাজে তাঁর লগে দেখা করতে গেছিলাম। শেখ সাহেব জীবনে অনেক মানুষের লগে মিশছেন ত আদব লেহাজ আছিল খুব ভালা। অনেক খাতির করলেন। কথায় কথায় আমি জিগাইলাম, আপনের হাতে ত অখন দেশ চালাইবার ভার, আপনে অপজিশনের কী করবেন। অপজিশন ছাড়া দেশ চালাইবেন কেমনে? জওহরলাল নেহরু ক্ষমতায় বইস্যাই জয়প্রকাশ নারায়ণরে কইলেন, তোমরা অপজিশন পার্টি গইড়্যা তোল। শেখ সাহেব বললেন, আগামী ইলেকশানে অপজিশান পার্টিগুলা ম্যাক্সিমাম পাঁচটার বেশি সিট পাইব না। আমি একটু আহত অইলাম, কইলাম, আপনে অপজিশনরে একশো সিট ছাইড়্যা দেবেন না? শেখ সাহেব হাসলেন। আমি চইল্যা আইলাম। ইতিহাস শেখ সাহেবরে স্টেটসম্যান অইবার একটা সুযোগ দিছিল। তিনি এইডা কামে লাগাইবার পারলেন না।[১৭]
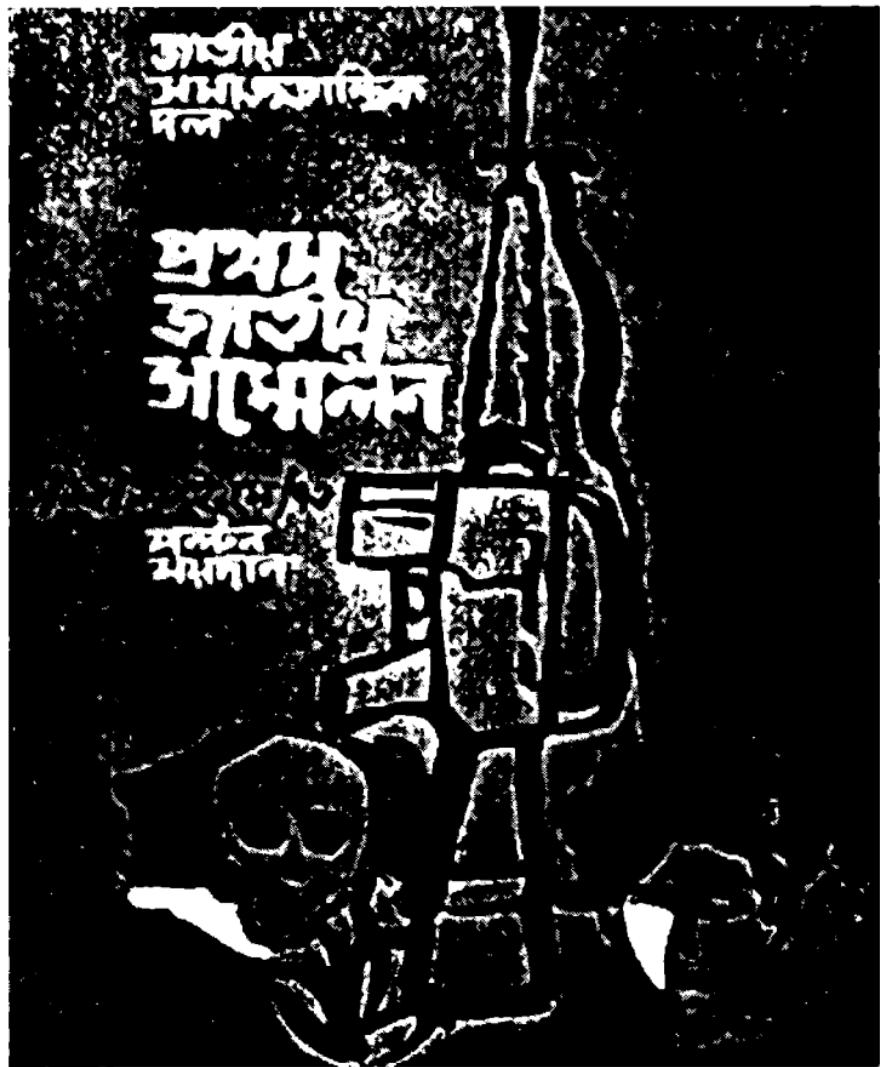
তেহাত্তরের মে মাসে জাসদের সাংগঠনিক বিস্তৃতি শুরু হয়। মহকুমাগুলোকে সে সময় 'সাংগঠনিক জেলা' হিসেবে বিবেচনা করা হতো। ষাটটি সাংগঠনিক জেলার মধ্যে পঞ্চান্নটিতে জাসদের পূর্ণাঙ্গ কমিটি তৈরি হয়। দেশের ৪১৬টি থানার মধ্যে ৩৭০টিতে জাসদ কমিটি করতে সক্ষম হয়।

জাসদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জাতীয় সম্মেলন তেহাত্তর সালের ১১-১৩ মে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি ছিলেন শ্রমিকনেতা মো. শাজাহান। সম্মেলনে ৫৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। জলিল, রব, শাজাহান সিরাজসহ কেন্দ্রীয় কমিটির সবাই নিজ নিজ পদে বহাল থাকলেন। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিতদের মধ্যে ছিলেন বিধানকৃষ্ণ সেন, মোশাররফ হোসেন ও মির্জা সুলতান রাজা (সহসভাপতি), নূরে আলম জিকু (সাংগঠনিক সম্পাদক), সুলতানউদ্দিন আহমদ (প্রচার সম্পাদক), মাজহারুল হক টুলু (দপ্তর সম্পাদক), হাবিবুল্লাহ চৌধুরী (কৃষি সম্পাদক), জাফর সাজ্জাদ খিচ্চু (শ্রম সম্পাদক), কামরুজ্জামান (অর্থ সম্পাদক), শাহ আলম (তথ্য ও গণসংযোগ সম্পাদক) ও মমতাজ বেগম (মহিলাবিষয়ক সম্পাদক)। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন বদরুদ্দীন উমর, অধ্যাপক মো. আনিসুর রহমান এবং *গণকণ্ঠ*-এর বার্তা সম্পাদক নজরুল হক।

জাতীয় কমিটিতে সহসভাপতির একটি পদ খালি রাখা হয়। গুঞ্জন ছিল, সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেওয়া লে. কর্নেল আবু তাহের ওই পদে যোগ দেবেন। তাহের বাহাত্তর সাল থেকেই সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে

জাসদের চাঁদা তোলার কুপন

১৯৭৩ সালের মে মাসে জাসদের প্রথম জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে ছাপানো পোস্টার

যোগাযোগ রাখছিলেন। মেজর জলিল তাঁকে সিরাজুল আলম খানের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। তাহের সরকারি চাকরি ছেড়ে আসতে অপারগ হওয়ায় তাঁকে কমিটিতে রাখা হয়নি।

মৃত্যুজনিত কারণে জাতীয় সংসদের চারটি আসন শূন্য হয়। তেহাত্তরের ২০ মে রাজশাহীর একটি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে জাসদের মইনউদ্দিন আহমেদ মানিক জয়ী হন। অন্যদিকে স্বতন্ত্র সদস্য আবদুল্লাহ সরকার জাসদে যোগ দেন। এর ফলে জাসদ তিনজন সদস্য নিয়ে সংসদে

'দ্বিতীয় বৃহত্তম দলে' পরিণত হলো। ফরিদপুরের একটি আসনে উপনির্বাচন হলে স্বতন্ত্র প্রার্থী কামরুল ইসলাম সালেহউদ্দিন আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে হারিয়ে জয়লাভ করেন। সালেহউদ্দিন পরে ভাসানী-ন্যাপে যোগ দেন।

আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফ্‌ফর) ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এ সময় একটি রাজনৈতিক জোট গঠন করার উদ্যোগ নেয়। তেহাত্তরের সেপ্টেম্বরে তারা ত্রিদলীয় গণ-ঐক্যজোট গঠন করে। ন্যাপ (ভাসানী) ও জাসদ এই জোট গঠনের বিরোধিতা করে বিবৃতি দেয়। জাসদের এক বিবৃতিতে বলা হয়, ত্রিদলীয় ঐক্যজোট 'ষড়যন্ত্রমূলক, গণবিরোধী ও সার্বভৌমত্বের প্রতি ভয়াবহ হুমকিস্বরূপ'। জাতীয় কমিটির এক সভায় জাসদ আহ্বান জানায়, তারা 'মুজিব-মনি-মোজাফ্‌ফর চক্রের "ত্রিভুজী" ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামী জনতার বিপ্লবী একতা কামনা করে।'[১৮]

তেহাত্তরের ১৪ অক্টোবর এক সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান গণ-ঐক্যজোটের ঘোষণাপত্র উপস্থাপন করেন। ঘোষণাপত্রে বলা হয় :

> সমাজবিরোধী দুষ্কৃতকারীরা সারা দেশে সুপরিকল্পিতভাবে লুট, গুপ্তহত্যা, ডাকাতি প্রভৃতি নাশকতামূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়েছে। দেশের এই পরিস্থিতিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনগুলোকে, বিশেষত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে ঐক্যবদ্ধভাবে জাতির সমস্যা ও শত্রুদের মোকাবিলার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। দেশের ও জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে আমরা বঙ্গবন্ধুর এ আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং ঐক্যবদ্ধভাবে সমস্যা ও শত্রুদের মোকাবিলা করা আমাদের দেশপ্রেমিক কর্তব্য বলে মনে করছি। এই ঐক্যজোটে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের ভূমিকা থাকবে এবং জোটভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর দলীয় স্বাতন্ত্র্য এবং নিজ নিজ আদর্শ ও কর্মসূচির ভিত্তিতে কাজ করার অধিকার অক্ষুণ্ন থাকবে।[১৯]

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছিল। চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় মানুষ হিমশিম খেতে থাকে। সত্তর সালে এক সের চালের দাম ছিল এক টাকা। তেহাত্তরের প্রথম দিকেই চালের সের তিন টাকায় ওঠে এবং বছরের শেষে তা আট টাকা হয়ে যায়। চোরাচালান বেড়ে যায় বহুগুণ। ফলে বাজারে নিত্যব্যবহার্য পণ্যের ঘাটতি বাড়তেই থাকে। সরকারি দলের অনেকেই চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কুষ্টিয়ায় স্থানীয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক চোরাচালানে

সাহায্য করার জন্য প্রভাবশালী মুক্তিযোদ্ধা মারফত আলীকে একটা চিরকুট পাঠান। মারফত আলী সেই চিরকুটটি ঢাকায় *গণকণ্ঠ* অফিসে পাঠিয়ে দেন। *গণকণ্ঠ* তা ছেপে দেওয়ার পর ওই নেতার শাস্তি হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর পদোন্নতি হয়। তাঁকে স্থানীয় আওয়ামী লীগ কমিটির সভাপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

দেশের পরিস্থিতি দিন দিনই খারাপ হচ্ছিল। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছিল লাফিয়ে লাফিয়ে। পত্রিকায় প্রায় প্রতিদিনই ত্রাণসামগ্রী চুরির খবর ছাপা হয়। মানুষ প্রকাশ্যেই সরকারের সমালোচনা করতে থাকে। এই সুযোগে পাকিস্তানপন্থী ও রাজাকারদের অনেকেই জাসদে জড়ো হতে থাকে। জাসদের জনসভায় এসব লোকের ভিড়ের কারণে জনসভার আকার বড় হতে থাকে। অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য বিরোধী দল না থাকায় এদের অনেকেই জাসদের ঘাড়ে সওয়ার হয়।

একাত্তরের দিনগুলোতে যাঁরা সামরিক জান্তার দালালি করেছিলেন, তাঁদের একজন ছিলেন মওলানা মতিন। পুরান ঢাকার শ্রমিকদের মধ্যে তাঁর সংগঠন ছিল, বিশেষ করে হোটেল-রেস্তোরাঁ ও পুস্তক বাঁধাই শ্রমিকদের মধ্যে। মওলানা মতিন জাসদে যোগ দেন এবং ঢাকা নগর শ্রমিক লীগের সভাপতি নিযুক্ত হন। ঢাকার একটি পত্রিকায় একদিন একটি ছবি ছাপা হয়। ছবিতে দেখা যায়, একাত্তরের জুলাই মাসে মওলানা মতিন পাকিস্তানের পতাকা হাতে একটা মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এই ছবি ছাপা হওয়ার ফলে জাসদের নেতারা খুবই বিব্রত হন। মতিনকে দল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।[২০] মতিন পরে 'বাংলাদেশ লেবার পার্টি' গঠন করেন।

তেহাত্তরের ৩ সেপ্টেম্বর ডাকসুর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মুজিববাদী ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন যৌথভাবে নির্বাচন করে। তাদের প্যানেলে ডাকসুর সহসভাপতি প্রার্থী ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের নূহ-উল-আলম লেনিন এবং সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী ছিলেন ছাত্রলীগের ইসমত কাদির গামা। পক্ষান্তরে জাসদ-ছাত্রলীগের সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন আ ফ ম মাহবুবুল হক ও জহুর হোসেন। নির্বাচন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় ভোট গণনার সময় দেখা গেল, মাহবুব-জহুর পরিষদ বিপুল ভোটে এগিয়ে। তাঁদের জয় সুনিশ্চিত। হলগুলোতেও অবস্থা একই রকম। রাত আটটার দিকে লেনিন-গামার সমর্থকেরা ভোট গণনার কেন্দ্রগুলোতে হামলা করে ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে নিয়ে যায়। তাঁরা গুলি ছুড়তে ছুড়তে এক হল থেকে অন্য হলে যান। প্রতিপক্ষ দলের ছাত্ররা এবং

ভোট গণনার কাজে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকেরা আতঙ্কিত হয়ে যে যেদিকে পারেন পালিয়ে যান। এ প্রসঙ্গে 'মুজিববাদী ছাত্রলীগে'র একজন কর্মীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> সন্ধ্যার পর ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনিরুল হক চৌধুরী ও সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম প্রধানের নেতৃত্বে আমরা মিছিল নিয়ে বের হয়েছি। সেদিন আমাদের সাথে ৫০-৬০ জন নেতৃস্থানীয় নেতা-কর্মী ছিল। এদিকে নির্বাচনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সমর্থিত পরিষদ জয়ী হতে পারে আর মুজিবপন্থী পরিষদ পরাজিত হতে চলেছে এমন খবর পেয়ে শেখ কামাল ডাকসুর বাক্স ছিনতাই করে। মিছিল নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় আমরা দেখি শেখ কামাল বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা, শুধু চোখ দুটো দেখা যায়। তার পায়ের কাছে কয়েকটি ব্যালট বাক্স। শেখ কামালের আশপাশে আরও কয়েকজন বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মিছিল নিয়ে বের হয়ে যাওয়ার আগে আমরা ধারণাও করিনি যে শেখ কামাল ইতিমধ্যে ডাকসুর বাক্স ছিনতাই করে ফেলেছে।[২১]

রোকেয়া হলে এযাবৎ ছাত্র ইউনিয়নের একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল। সেবারই প্রথম জাসদ-সমর্থিত ছাত্রলীগ বিপুল ভোটে এগিয়ে যায়। রওশন জাহান সাথী ও জাকিয়া চৌধুরী বিলু যথাক্রমে সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। শুধু ফলাফল ঘোষণার আনুষ্ঠানিকতা বাকি ছিল। কিন্তু হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহিম ফল ঘোষণা করতে গড়িমসি করেন। ইতিমধ্যে একদল বহিরাগত যুবক এসে ব্যালট বাক্সগুলো ছিনতাই করে নিয়ে যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সেটা ছিল একটা কলঙ্কজনক দিন। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ নির্বাচনে সরকারবিরোধী ছাত্রসংগঠন জিতে যাবে, এটা মেনে নেওয়ার মতো উদারতা আওয়ামী লীগ সরকারের ছিল না। জাসদ থেকে অভিযোগ করা হয়, সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নেওয়া হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরীর কাছে অভিযোগ জানালে তিনি কোনো রকম ব্যবস্থা নিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি একজন টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী হিসেবে সরকারে যোগ দেন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান।

ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ বাহিনী এখানেই থেমে থাকেনি। তারা বিভিন্ন হলে জাসদ-ছাত্রলীগের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের কক্ষগুলোর তালা ভেঙে লুটপাট করে। একই দিন সন্ধ্যায় পুলিশ *গণকণ্ঠ* অফিসে হামলা চালায় এবং

গণকণ্ঠ-এর সাংবাদিক-কর্মচারীদের পত্রিকা অফিস থেকে বের করে দেয়। র‍্যাংকিন স্ট্রিটের চত্বর থেকে বিতাড়িত হয়ে *গণকণ্ঠ*-এর সাংবাদিকেরা কয়েক দিন মিছিল-মিটিং করেন। সাংবাদিক ইউনিয়ন নামকাওয়াস্তে একটা বিবৃতি দেয়। ব্যস, ওই পর্যন্তই। মাস খানেক পর টিপু সুলতান রোডের একটা চারতলা বাড়ি ভাড়া নিয়ে *গণকণ্ঠ* আবার চালু করা হয়। তবে পত্রিকায় সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়া পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

তেহাত্তরে রাজনীতিতে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করে। পিকিংপন্থী দলগুলো শেখ মুজিবকে ভারতের দালাল ও আওয়ামী লীগকে ভারতের পুতুল সরকার হিসেবে প্রচার করতে থাকে। তাদের এক অংশের অন্ধ ভারত-বিরোধিতার প্রশ্রয়ে উগ্র ধর্মান্ধ গোষ্ঠীগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ফাঁড়ি, থানা, বাজার ও ব্যাংক লুটের ঘটনা ঘটতে থাকে। এর অনেকগুলোতেই আবদুল হকের নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি এবং সিরাজ শিকদারের পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে।

ভারত-বিরোধিতা ক্রমে সাম্প্রদায়িকতায় রূপান্তরিত হয়। একশ্রেণির মানুষের মধ্যে 'মুসলিম আইডেন্টিটি' মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এ সময় 'মুসলিম বাংলা'র স্লোগান ও আন্দোলনের দিকে কেউ কেউ ঝুঁকে পড়েন। অন্যান্য দলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জাসদও কট্টর ভারতবিরোধী বক্তব্য দেওয়া শুরু করে। ভারতের সঙ্গে 'গোপন' চুক্তি বাতিলের দাবিতে অন্যান্য দলের সঙ্গে জাসদও গলা মেলায়। কিন্তু গোপন চুক্তিগুলো কী, তা আর কেউ বলেন না।

তেহাত্তরের ৩০ নভেম্বর সরকার দালাল আইনে অভিযুক্ত ও আটক ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। আশা করা হয়, তাঁরা অতীতের কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে স্বাধীন দেশে গণতন্ত্র সুসংহত করা ও দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার ফলে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করার দায়ে অভিযুক্ত ও আটককৃত প্রায় ৩৪ হাজার ৬০০ ব্যক্তি মুক্তি পান।[২২]

জাসদ তেহাত্তরের ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় কমিটির এক সভায় একটি ২৯ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। ২৯ দফায় উল্লেখিত দাবিগুলোর মধ্যে ছিল :

— রক্ষীবাহিনীকে ভেঙে দিয়ে এর সদস্যদের নিয়মিত সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

— প্রশাসন ও আইন বিভাগকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখতে হবে এবং আইন বিভাগের ওপর থেকে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সকল প্রকার দলীয় প্রভাবের অবসান করতে হবে।

— রাষ্ট্রপতির ৮, ৯, ৫০-সহ সকল কালাকানুন অবিলম্বে বাতিল ঘোষণা করতে হবে।

— সমস্ত প্রগতিশীল রাজবন্দীর অবিলম্বে বিনা শর্তে মুক্তি প্রদান এবং যাবতীয় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও মিথ্যা মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

— উপজাতীয়দের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা দিতে হবে।

— ১৯৭১ সালে মুজিবনগরে যে সরকার গঠন করা হয়েছিল, তার বাজেট ও আয়-ব্যয়ের পূর্ণ হিসাব দিতে হবে। বাংলাদেশ থেকে কী পরিমাণ স্বর্ণ, মুদ্রা ও অন্যান্য সম্পদ তখন ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তারও হিসাব দিতে হবে।

— যে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করেছিল, তাদের অস্ত্রশস্ত্রের হিসাব দিতে হবে।

— ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মন্ত্রী, এমপিসহ অন্য নেতা-উপনেতাদের ১৯৭১ সালে কী পরিমাণ অর্থসম্পদ ছিল, তার যথাযথ বিবরণ দিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।

— অবাঙালিদের ফেলে যাওয়া পরিত্যক্ত সম্পদের হিসাব দিতে হবে।

— পরিত্যক্ত কলকারখানা, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, বসতবাড়ি, গাড়ি ইত্যাদি এখন কাদের দখলে আছে, তা নির্ধারণ করার জন্য নিরপেক্ষ জাতীয় তদন্ত কমিশন গঠন করতে হবে।

— ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর থেকে এযাবৎ কী পরিমাণ সাহায্য-সামগ্রী বিদেশ থেকে এসেছে এবং কীভাবে তার বণ্টন হয়েছে, তার হিসাব দিতে হবে। রেডক্রসসহ সকল সাহায্য প্রতিষ্ঠানের মারফত প্রদত্ত সাহায্যেরও পূর্ণ হিসাব দিতে হবে।

— বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল ষড়যন্ত্র ও অশুভ তৎপরতার আশু অবসানের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। সহ-অবস্থানের ভিত্তিতে জোটনিরপেক্ষ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।[২৩]

ভারতের সঙ্গে ১৯ মার্চ ১৯৭২ তারিখে সম্পাদিত ২৫ বছর মেয়াদি 'শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি' নিয়ে অনেক দলের আপত্তি ছিল। কিন্তু এটা কোনো গোপন চুক্তি ছিল না। এই চুক্তি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে উত্থাপিত ও গৃহীত হয়। তবে এর ৯ ও ১০ নম্বর ধারায় প্রয়োজনে এক দেশ থেকে আরেক দেশের সাহায্যে সামরিক বাহিনী অংশগ্রহণ করতে পারে, এরকম কথা ছিল। এ নিয়ে কয়েকটি দল বেশ হইচই করছিল। তবে দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে এ ধরনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকাটা মোটেও অস্বাভাবিক ছিল না এবং বিশ্বের

অনেক দেশের চুক্তিতে এর উদাহরণ আছে। পিও (প্রেসিডেনশিয়াল অর্ডার) ৮, ৯ ও ৫০ বাতিলের দাবি করার পেছনে কোনো শক্ত যুক্তি ছিল না। আমলাতন্ত্রের একটি অংশকে খুশি করার জন্যই এ দাবি তোলা হয়েছিল। পিও ৮ এবং ৫০ বাতিল করা মানে ছিল দালাল আইনে আটক সবাইকে ছেড়ে দেওয়া। এটা বস্তুতপক্ষে সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদ বলে নিষিদ্ধ ধর্মভিত্তিক রাজনীতি উসকে দেওয়ার সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলে। জাসদ প্রধানত মুক্তিযোদ্ধাদের দল হয়েও একশ্রেণির লোকের কাছে সস্তা জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য এসব দাবি তুলেছিল। জাসদ আসলে সরকারবিরোধী একটা বৃহত্তর জোট গড়ে তোলার জন্য অনেক দাবিদাওয়াকে প্রশ্রয় দিয়েছিল, যেগুলো ছিল তার ঘোষিত নীতির পরিপন্থী।

চুয়াত্তরের শুরু থেকেই জাসদ আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে। জাসদ চুয়াত্তরের ২০ জানুয়ারি 'প্রতিরোধ দিবস' পালন করার ঘোষণা দেয়। ফলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার আশঙ্কায় সরকার ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ১৪৪ ধারা জারি করে। ২০ জানুয়ারি শহরের বিভিন্ন স্থানে জাসদের পক্ষ থেকে অনেক মিছিল বের করা হয়। অনেক জায়গায় পুলিশের সঙ্গে জাসদের কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রতিবাদে জাসদ ৮ ফেব্রুয়ারি হরতাল আহ্বান করে। ওই দিন জাসদ পল্টনে এক জনসভায় ১৫ মার্চের মধ্যে ২৯ দফা দাবি মেনে নেওয়ার জন্য সরকারকে সময় বেঁধে দেয়। জাসদ ঘোষণা করে, সরকার যদি এসব দাবি মেনে না নেয়, তাহলে তারা ঘেরাও আন্দোলন শুরু করবে। সিদ্ধান্ত হয়, ঢাকায় একটি প্রতীকী ঘেরাও করা হবে।

চুয়াত্তরের ১০ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জাসদ ঘেরাও আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। বিবৃতির শিরোনাম ছিল : 'শাসকগোষ্ঠীর প্রতি জাসদের চরমপত্র, জনতার দাবি মেনে নাও'। বিবৃতিতে বলা হয় :

> ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনকাল সুদীর্ঘ ২৫টি মাস অতিক্রম করে গেছে। একদিকে ধনবাদী মুজিব সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপ, গণনির্যাতন, খামখেয়ালীপূর্ণ শাসন, অপদার্থতা এবং অন্যদিকে বিদেশী দাসত্বের দরুন বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সাধারণ মানুষের জীবন আজ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।...
>
> এ অবস্থাকে কোনো মতেই আর অধিককাল চলতে দেওয়া যেতে পারে না। সুতরাং সময় থাকতেই শোষক ও শোষিতের মধ্যে কারা টিকে থাকবে, তার একটা ফয়সালা হওয়া দরকার।...

জনগণের বিশ্বাস, আগামী ১৫ মার্চ পর্যন্ত সময় সমস্ত দাবি-দাওয়া মেনে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং ১৫ মার্চ ১৯৭৪-এর মধ্যে প্রতিটি দাবিদাওয়া পূরণ করার জন্য আমরা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

উক্ত সময়ের মধ্যে ক্ষমতাসীন সরকার যদি এই দাবিসমূহ পুরোপুরি মেনে না নেয়, তাহলে জনগণের তরফ থেকে প্রদত্ত আমাদের বৃহত্তর কার্যসূচি অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে :

— জেলা প্রশাসক, মহকুমা প্রশাসক ও সার্কেল অফিসারদের অফিস এবং তহশিল অফিস ঘেরাও করা হবে।
— জেলখানাসমূহ ঘেরাও করা হবে।
— ধনী কৃষক ও জোতদারদের ঘেরাও করা হবে।
— সরকারদলীয় মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, এমপি প্রমুখদের ঘেরাও করা হবে।
— রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যানদের ঘেরাও করা হবে।
— লাইসেন্স-পারমিট শিকারি, কালোবাজারি, মজুতদারসহ সকল অসৎ ব্যবসায়ীকে ঘেরাও করা হবে।
— খাসজমি এবং অতিরিক্ত জমি দখলের জন্য ঘেরাও করা হবে।
— অসৎভাবে দখলকৃত বাড়িঘর ও অন্যান্য সম্পত্তি থেকে দখলদারদের উচ্ছেদ করার অভিযান শুরু করা হবে।
— সস্তা ও ন্যায্যমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বণ্টন সুনিশ্চিত করার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
— টিসিবি, বিভিন্ন করপোরেশনের অফিস এবং দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির আখড়া ও অন্যান্য সরকারি ও আধা সরকারি অফিস ঘেরাও করা হবে।
— এ পর্যায়ে কেন্দ্রীয় কর্মসূচি হিসেবে গণভবন, সচিবালয় ও বঙ্গভবন ঘেরাও করা হবে।
— আনুষঙ্গিক ব্যাপকতর কর্মসূচি কার্যকর করা হবে।[২৪]

১৭ মার্চ পল্টনে জাসদের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে জলিল ও রব অত্যন্ত জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। জনতা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সভা শেষ হতে না হতেই এক বিশাল মিছিল মিন্টো রোডের দিকে রওনা হয়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন জলিল ও রব। মিছিল গিয়ে থামে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর বাড়ির সামনে। মুহুর্মুহু স্লোগান চলতে থাকে। কয়েক ট্রাকবোঝাই পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর সদস্য এসে উপস্থিত হন। হঠাৎ গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। জনতা এলোপাতাড়ি দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। অনেকেই হতাহত হন। ১৭ মার্চের ঘটনা সম্পর্কে আ স ম আবদুর রবের অভিজ্ঞতা ছিল এরকম :

আমাদের অনুমান ছিল মিছিলে পুলিশ বাধা দিতে পারে। তাই আমরা তিন ভাগ হয়ে তিনটি পথে যাই এবং পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলীর বাসার সামনে জড়ো

> হই। চারদিকে স্লোগান চলছে। আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আমরা একটা স্মারকলিপি দেব। কিন্তু তিনি বাড়িতে ছিলেন না। ওই দিন তিনি কেরানীগঞ্জে একটা জনসভায় ছিলেন। কয়েকজনকে দেখলাম বাড়ির গেটে আগুন দিচ্ছে। লোহার গেটে কি আগুন ধরে? হঠাৎ কোত্থেকে কয়েক ট্রাক পুলিশ আর রক্ষীবাহিনী এল। শুরু করল গুলি। জলিল ভাই, মমতাজ আর আমি একসঙ্গে ছিলাম। ইনু কমান্ড দিল, 'সবাই শুয়ে পড়েন।' আমরা শুয়ে পড়লাম। বৃষ্টির মতো গুলি যাচ্ছে কানের পাশ দিয়ে, চুলের ভেতর দিয়ে। হঠাৎ দেখলাম, ইডেন কলেজের ছাত্রী মুকুল দেশাই গুলি খেয়ে পড়ে গেল। জাহাঙ্গীর আমার কাছেই ছিল। গুলি লেগে সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল।[২৫]

সরকারি প্রেস নোটে বলা হয়, তিনজন নিহত এবং ১৮ জন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে জলিল, রব, মমতাজ বেগম ও মাঈনউদ্দিন খান বাদল ছিলেন। তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। মমতাজ বেগম তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ পরীক্ষার্থী। কোর্টে রিট করে তিনি প্যারোলে মুক্তি পান। জাসদ দাবি করে, অন্তত ৫০ জন নিহত হয়েছেন। মাঈনউদ্দিন খান বাদলের বাবা আহমদউল্লাহ খান ছিলেন পুলিশের ঢাকার তেজগাঁও অঞ্চলের ডিএসপি। বাদল পরে তাঁর কাছে শুনেছিলেন, ৪০-৫০টি লাশ রক্ষীবাহিনী ট্রাকে করে নিয়ে গেছে।[২৬]

১৭ মার্চ রাতে পুলিশ *গণকণ্ঠ* অফিসে হামলা চালায় এবং সম্পাদক আল মাহমুদকে গ্রেপ্তার করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে জাসদ ছাত্রলীগের অনেক নেতার কক্ষ ভাঙচুর ও লুটপাট হয়। ১৮ মার্চ আবদুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ 'জাসদের দুষ্কৃতকারীদের' বিরুদ্ধে ঢাকায় একটা মিছিল বের করে। মিছিলকারীরা জাসদের অফিসে আগুন দেয়। অফিসের নিচে খোলা চত্বরে সিরাজুল আলম খানের একটা মোটরবাইক রাখা ছিল, ইতালিয়ান ল্যামব্রেটা। সেটাও আগুনে পোড়ানো হয়। গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ জাসদের নেতা-কর্মীদের খুঁজতে থাকে। বেশির ভাগ নেতা-কর্মী আত্মগোপন করেন।

১৭ মার্চ এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী জাসদের 'উসকানিমূলক ও উত্তেজনা সৃষ্টির রাজনীতির' সমালোচনা করেন। বিবৃতিতে বলা হয় :

> জাসদ নেতৃত্ব সংকটের প্রতিবাদের নামে 'জ্বালাও-পোড়াও', 'অস্ত্রের বদলে অস্ত্র', 'ঘেরাও' প্রভৃতি উগ্র হিংসাত্মক কার্যপন্থা গ্রহণ করিয়া দেশকে বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাতের দিকে ঠেলিয়া দেওয়ার প্রয়াস পাইয়াছে।...
>
> আমাদের পার্টি সুস্পষ্টভাবেই মনে করে যে, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ও উহার রাজনীতি দেশ ও জাতির স্বার্থবিরোধী। দেশের ও জনগণের স্বার্থেই এই রাজনীতির মোকাবিলা করা দরকার।

> তাই জাসদ নেতৃত্বের রাজনীতি, বিশেষত দেশে অরাজকতা সৃষ্টির জন্য তাহাদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধভাবে রুখিয়া দাঁড়াইবার জন্য আমরা দেশের শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও অন্যান্য জনগণকে আহ্বান করিতেছি।
>
> এই সঙ্গে গণজীবনের সংকটের প্রতিকারকল্পে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা সরকারের নিকট আহ্বান জানাইতেছি এবং সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তিগুলি যাহাতে ঐক্যবদ্ধভাবে এ জন্য আন্দোলন গড়িয়া তোলেন, সে জন্য তাহাদের নিকট আহ্বান জানাইতেছি।[২৭]

জাসদের অনেক নেতা চুয়াত্তরের ১৭ মার্চ ঢাকায় ছিলেন না। এঁদের মধ্যে কাজী আরেফ ছিলেন সিলেটে, মনিরুল ইসলাম ছিলেন দাউদকান্দি এবং শরীফ নুরুল আম্বিয়া ছিলেন যশোরে। মাসুদ আহমেদ রুমী রংপুরে একটা কাজ উপলক্ষে গিয়েছিলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন রুমী। তাঁর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল, 'এমনটা তো হওয়ার কথা নয়?' ঢাকায় এসে তিনি তাঁর প্রশ্নের জবাব খুঁজতে থাকেন। জাসদ থেকে ইতিমধ্যে প্রচারপত্র ছেপে ১৭ মার্চের ঘেরাও আন্দোলনের যুক্তি তুলে ধরে বলা হয়েছে, 'এটা হচ্ছে কিউবার বিপ্লবীদের ১৯৫৩ সালে মনকাডা দুর্গ আক্রমণের অনুরূপ।' রুমী বললেন, মনকাডা অভিযানের কয়েক বছর পর কিউবায় সফল বিপ্লব হয়েছে, কিন্তু অনেক দেশে এরকম কয়েক হাজার অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। তিনি জাসদের এই 'বালখিল্য' কাজের ব্যাপারে রীতিমতো ক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়ে রাজনীতি ছেড়ে *দৈনিক বাংলা* পত্রিকায় ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে যোগ দেন। রুমীর বক্তব্য ছিল সোজাসাপটা। দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়া যদি গণতান্ত্রিক ও স্বচ্ছ না হয়, তাহলে ওই দল করার কোনো মানে হয় না।

গুলিবিদ্ধ অবস্থায় যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, মাঈনউদ্দিন খান বাদল তাঁদের একজন। তাঁকে পুলিশ পাহারায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। বাদলের আশঙ্কা ছিল, তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ হত্যার অভিযোগ আনা হতে পারে। একজন পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছিলেন বলে কানাঘুষা চলছিল। হাসপাতালের কেবিনের বাইরে দরজার পাশে পুলিশ পাহারা থাকে। দুপুরে পনেরো মিনিটের মধ্যে ডিউটি বদল হয়। ওই সময় একদল পুলিশ তিনতলার কেবিন এলাকা থেকে নিচে নেমে যায়, আরেক দল ওপরে উঠে আসে। অর্থাৎ, পনেরো মিনিট কোনো পাহারা থাকে না। পরিকল্পনা হলো, ওই পনেরো মিনিট সময়কে কাজে লাগানো নিয়ে। একদিন দুপুরে যখন ডিউটি বদল হচ্ছে, তখন মেডিকেলের কয়েকজন ছাত্র একটা

স্ট্রেচার নিয়ে এলেন। বাদল তার ওপর শুয়ে পড়লেন। পেটের ওপর একটা বালিশ রেখে তার সারা শরীর চাদরে ঢেকে দেওয়া হলো। ছাত্ররা দ্রুত স্ট্রেচার নিয়ে করিডর দিয়ে ছুটতে ছুটতে লিফটে ঢুকলেন। দেখলে মনে হবে, একজন গর্ভবতী নারীর লাশ যাচ্ছে। হাসপাতালের পেছনের গেট দিয়ে 'লাশ' বের করে একটা অ্যাম্বুলেন্সে ওঠানো হলো। অ্যাম্বুলেন্স আজিমপুরের কাছে একটা জায়গায় থেমে 'লাশ' নামিয়ে দিল। 'লাশ' হেঁটে হেঁটে চলে গেল চাদর মুড়ি দিয়ে। বাদলের বাবা ছিলেন পুলিশের ডিএসপি। তিনি পাহারায় থাকা ছয়জন কনস্টেবলকে সাসপেন্ড করলেন।[২৮]

১৭ মার্চের মিছিল এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও নিয়ে জাসদের মধ্যে অনেক বিতর্ক হয়। প্রথম প্রশ্ন ছিল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ি কেন ঘেরাও করতে হবে, গণভবন নয় কেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, প্রথম গুলি কারা ছুড়েছে। জাসদের পক্ষ থেকেই প্রথম গুলি ছোড়া হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। এটা ছিল দলকে আন্ডারগ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার একটি অংশ। পরিকল্পনাটি সফল হয়। অনেক চড়াই-উতরাই সত্ত্বেও জাসদের রাজনীতির গণতান্ত্রিক ধারাটি এত দিন বজায় ছিল। ১৭ মার্চ এ ধারার পরিসমাপ্তি ঘটে। এ প্রসঙ্গে জাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির কৃষি সম্পাদক হাবিবুল্লাহ চৌধুরীর ভাষ্য এরকম :

> মমতাজ (মমতাজ বেগম, জাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির মহিলা সম্পাদক ও হাবিবুল্লাহ চৌধুরীর স্ত্রী) আমারে কইছিল, গুলি প্রথমে আমরার লোকরাই করছিল। পরে মে মাসে আজিমপুরে চায়না বিল্ডিংয়ের তিনতলায় তিন দিন বৈঠক হয়। প্রথমে শুনলাম, গুলি করছে হাবিবুল হক খান বেনু। পরে জানলাম, এইডা হাসানুল হক ইনুর কাম। সিরাজুল আলম খানরে জিগাইলাম, পোলাপান সব মইরা যাইতেছে, কী ছাতার বিপ্লব করেন। সে জওয়াব দেয় না। প্রশ্ন করলেই সাইড কাইট্টা যায়। কোনো আলোচনা হইতে দেয় নাই। ভলিউম ঘাঁইট্টা খালি তত্ত্ব ঝাড়ে।[২৯]

চুয়াত্তরের শুরু থেকেই রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং প্রতিপক্ষের ওপর হামলার পরিমাণ বেড়ে যায়। বিশেষ ক্ষমতা আইনের দ্বারা পরোয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তার এবং বিনা বিচারে জেলে আটক রাখার ব্যাপারে অভিযোগ উঠতে থাকে। ১৭ মার্চ জাসদের কর্মসূচির পর এই দলের কর্মীরা পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর হামলার শিকার হতে থাকেন বেশি করে। ৩১ মার্চ জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সভায় 'মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটি' নামে একটি নাগরিক সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। অধ্যাপক আহমদ

শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় ৩৩ জনের একটি কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটির নেতাদের মধ্যে ছিলেন সিকান্দার আবু জাফর (সভাপতি), মির্জা গোলাম হাফিজ (সভাপতি, আইন পর্যালোচনা উপকমিটি), আহমদ শরীফ (সভাপতি, প্রকাশনা উপকমিটি), বিনোদ দাশগুপ্ত (সভাপতি, তথ্য অনুসন্ধান উপকমিটি), আবদুল হক (সভাপতি, আইন সাহায্য উপকমিটি), এনায়েতুল্লাহ খান (কোষাধ্যক্ষ), মওদুদ আহমদ (সাধারণ সম্পাদক), সৈয়দ জাফর (সহসম্পাদক) প্রমুখ। বাংলাদেশে এ ধরনের নাগরিক সংগঠন এটাই প্রথম। কমিটির প্রস্তাবনায় বলা হয় :

> গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্র রাষ্ট্রের একটি নিয়ামক নীতি হিসেবে সংযোজিত হয়েছে। ৩১, ৩২ ও ৩৩ ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, শাসনতন্ত্র মোতাবেক জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার সুনিশ্চিত করা হবে এবং প্রত্যেক নাগরিকই নিজেকে গ্রেপ্তার ও আটকের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আইনের সাহায্য প্রার্থনা করার অধিকার ভোগ করবেন।
>
> কিন্তু এসব সুস্পষ্ট নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও উপরিউক্ত শাসনতান্ত্রিক ওয়াদা এবং নাগরিক অধিকার খেলাপ করা হচ্ছে বলে পত্রপত্রিকায় নিয়মিত খবর পাওয়া যায়। এসব খবরে জানা যায় যে, কোনো আদালতে হাজির না করেই অসংখ্য লোককে গ্রেপ্তার করে আটক রেখে নির্যাতন করা হচ্ছে এবং যেসব সংস্থা নাগরিকদের অধিকার রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকার কথা, তাদের হাতেই অনেক লোক শারীরিকভাবে গুম হয়ে যাচ্ছে। নাগরিক কমিটির এই সভায় জনগণকে প্রকৃত ঘটনাবলি জানানো, জনমত সংগঠিত করা এবং প্রয়োজনে ক্ষতিগ্রস্তদের আইনি সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। সভায় প্রস্তাব আকারে পাঁচটি দাবি তুলে ধরা হয়। দাবিগুলো ছিল :
>
> ১. সংবিধানে দেওয়া অধিকারসমূহের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সকল আইন প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং বিভিন্ন সরকারি বাহিনী ও প্রশাসন কর্তৃক ব্যক্তিস্বাধীনতা, বাক্‌স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক অধিকারসমূহের ওপর হস্তক্ষেপ ও হামলা বন্ধ করা;
> ২. বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করা;
> ৩. রক্ষীবাহিনী আইন বাতিল করা;
> ৪. বিনা বিচারে আটক সকল বন্দীর আশু মুক্তি; এবং
> ৫. *গণকণ্ঠ* সম্পাদক আল মাহমুদসহ অন্যান্য আটক ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানাপ্রাপ্ত সংবাদপত্র-কর্মীদের মুক্তি এবং তাঁদের বিরুদ্ধে জারিকৃত পরোয়ানা প্রত্যাহার।[৩০]

'জনতা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজেস' থেকে *গণকণ্ঠ* উৎখাত হয়ে গেলে নতুন ছাপাখানার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। টিপু সুলতান রোডের *গণকণ্ঠ* কার্যালয়ে

একটা ছোটখাটো ছাপার মেশিন ছিল। সেটাও বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ সময় সিকান্‌দার আবু জাফর *গণকণ্ঠ*-এর 'মুদ্রক' হিসেবে এগিয়ে আসেন এবং তা ছাপানোর ব্যবস্থা করেন। *গণকণ্ঠ*-এর নির্বাহী সম্পাদক আফতাবউদ্দিন আহমদ গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য অধ্যাপক আহমদ শরীফের বাসায় আত্মগোপন করেন।

জাসদ একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে গড়ে উঠেছিল এবং চরমপন্থার দিকে ধীরে ধীরে ঝুঁকছিল। কার্যকর বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে জাসদের পক্ষে একটা জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। ষাটের দশক থেকে সিরাজপন্থীরা স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের যে স্বপ্ন লালন করতেন, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী নতুন সদস্য ও অনুপ্রবেশকারীদের অনেকের কাছে সে স্বপ্নের কোনো মূল্য ছিল না। কেউ এ দলে যোগ দিয়েছিলেন মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, কেউ একটা তৈরি এবং জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম পেয়ে তাতে ঢুকে পড়েছিলেন নিজস্ব মতলব নিয়ে, কেউ বা এসেছিলেন শুধু শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করার জন্য। দ্রুত লোকপ্রিয় হওয়ার জন্য জাসদের নেতৃত্ব বাছবিচার না করেই সবাইকে দলে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

জাসদে একাধিক স্রোতোধারা ছিল। তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং বোঝাপড়া যেমন ছিল, আবার ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত এজেন্ডা ও উদ্যোগ নিয়েও কিছু কর্মকাণ্ড চলছিল। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। চুয়াত্তরের গোড়ার দিকে মেজর জলিল ভয়েস অব আমেরিকা, ইউপিআই এবং *ডেইলি টেলিগ্রাফ*-এর প্রতিনিধি আমানউল্লাহর সঙ্গে আলোচনাকালে তাঁকে (আমানউল্লাহকে) পাকিস্তানে ভুট্টো ও তাঁর দলের সঙ্গে যোগাযোগের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। জলিল আমানউল্লাহকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন পাকিস্তানিদের সঙ্গে আলোচনার সময় জলিলের সঙ্গে থাকেন এবং তাঁকে সাহায্য করেন। আমানউল্লাহ জলিলকে স্বাধীনতার আগে থেকেই চিনতেন। জলিল বরিশাল শহরের পুরান বাজারের কাছে একসময়ের 'মিস্টার ইস্ট পাকিস্তান' হরিদাস ঘোষের কাছে ব্যায়াম শিখতেন। আমানউল্লাহ ও হরিদাস ছিলেন শরীরচর্চার সতীর্থ। তাঁরা দুজনই বলরাম শীলের ব্যায়ামাগারের শিষ্য। জলিল আমানউল্লাহকে বড় ভাইয়ের মতো জানতেন এবং নানান প্রয়োজনে তাঁর কাছে পরামর্শ চাইতেন।[৩১]

জাসদের মূলধারাটি এসেছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের স্বাধীনতাকামী তরুণদের মধ্য থেকে। জলিল এসেছেন সামরিক বাহিনী থেকে। তাঁদের মধ্যে বোঝাপড়ার ব্যাপারটি দলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে ঝগড়া-ফ্যাসাদ, তর্ক, উপদলীয়

কোন্দল, কানাকানি ও ফিসফাস করে কথা বলার যে সংস্কৃতি, জলিল তা খুবই অপছন্দ করতেন। তাঁর কথাবার্তা ছিল সোজাসাপটা। গ্রেপ্তারের আগে চুয়াত্তরের কোনো এক সময় ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইনের কাছে একটি বাসায় এক আলাপচারিতায় জলিল বলেছিলেন, 'রাজনীতিতে রব-সিরাজ ইম্পর্ট্যান্ট হতে পারে। অনেকেই বলে, দে আর নট গুড পিপল। একটা সময়ে এ ধরনের লোক দরকার। কিন্তু আমি জানি, হাউ টু ডিল উইথ দিজ পিপল।' তারপর আপন মনেই বললেন, 'আমরা ক্ষমতায় যেতে পারি, মন্ত্রীগুলোকে পাখির মতো ধরে এনে আটকে রাখতে পারি। তবে মনে হয় না, আমাদের প্রতি যথেষ্ট জনসমর্থন আছে। এখন এটা করা যাবে না।' জলিলের অনুরোধে আমানউল্লাহ পরামর্শকের ভূমিকা নিতে রাজি হন।[৩২]

শেখ মুজিব পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। তিনি ধাপে ধাপে এগোচ্ছিলেন। চুয়াত্তরের ফেব্রুয়ারিতে ইসলামি ঐক্য সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে তিনি লাহোরে যান। ওই সম্মেলনে অংশ নিতে পেরে তিনি খুবই প্রীত হয়েছিলেন। জেনারেল উবানের ভাষ্য এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

> বাংলাদেশের বিহারি এবং জনাব ভুট্টো, এই দুটি নাম শেখ মুজিব সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতেন। তারা তাঁর জাতির অনেক ক্ষতি করেছিল। তিনি প্রতিশোধ নিতে এবং তাদের একটা শিক্ষা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।...আমি তাঁকে বোঝাতে লাগলাম যে, ভুট্টোর সাথে এটা শুরু করা দরকার, তাতে করে এমন কিছু সমস্যা, যা দুটি দেশের জন্যই উপদ্রবস্বরূপ এবং তার প্রভাব গোটা দক্ষিণ এশিয়াতেই পড়ছে, সেগুলোর একটা সমাধান হয়ে যেতে পারে। তিনি আমার কথা শুনতেন, কিন্তু কখনো হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিতেন না। একদিন হঠাৎ আমি একটা ফোন পেলাম লাহোর থেকে। লাইনে ছিলেন শেখ মুজিব। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি জানেন, আমি আজকে কী করেছি?' আমি বললাম, 'আপনি বলুন তো এখন আপনি কিসের ধান্দায় আছেন?' তিনি বললেন, 'একটা প্রকাশ্য মঞ্চের ওপর আমি জনাব ভুট্টোর সঙ্গে কোলাকুলি করেছি। আমি জানি, আপনি এটা পছন্দ করবেন, তাই আপনাকেই প্রথম জানাচ্ছি।' এতে আমার চোখে পানি এসে গেল। আমি তাঁর দূরদর্শিতা ও রাষ্ট্রনায়কতার প্রশংসা করলাম।[৩৩]

শেখ মুজিব ইসলামি ঐক্য সংস্থার শীর্ষ বৈঠকে যোগ দিতে ২৩ ফেব্রুয়ারি লাহোরে যান। সম্মেলনে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোকে ঢাকা সফরের আমন্ত্রণ জানান। ভুট্টো ২৭ জুন তিন দিনের সফরে ঢাকা এসেছিলেন। তিনি আসার আগে পাকিস্তান সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন

চুয়াত্তরে লাহোরে ইসলামি দেশগুলোর শীর্ষ সম্মেলনে বাঁ থেকে আরাফাত, মুজিব, ভুট্টো, গাদ্দাফি ও বুমেদিন

কর্মকর্তাদের একটি অগ্রবর্তী দল ঢাকায় আসে। ওই সময় জলিল সাংবাদিক আমানউল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। অফিসে না পেয়ে জলিল তাঁর বাসায় ফোন করেন। তখন আমানউল্লাহ্ বাসায় ছিলেন না। পরে তিনি এটা জানতে পারেন। ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। আমানউল্লাহ পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের সঙ্গে জলিলের সাক্ষাতের সময় উপস্থিত হতে পারেননি। জলিলের এই ব্যাপারটা নিয়ে দলের মধ্যে কিছুটা হইচই হয়েছিল।[৩৪]

আলজিয়ার্সে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর সম্মেলনে অংশ নেওয়ার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা দিল্লিতে বৈঠক করে এক যুক্ত ঘোষণায় বলেন, উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি ও সম্প্রীতি গড়ে তোলার স্বার্থে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাতিল করে দেওয়া হবে। চুয়াত্তরের ৫-৯ এপ্রিল দিল্লিতে অনুষ্ঠিত তিন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক সভায় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের কথা ঘোষণা করা হয়।[৩৫] ৯ এপ্রিল ভারতের নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান—এই তিন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের স্বাক্ষরিত চুক্তির ১৪ নম্বর ধারায় বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয় :

> এ প্রসঙ্গে তিনজন মন্ত্রী উল্লেখ করেন, আপসরফা ও নিষ্পত্তির জন্য দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তিন দেশের দৃঢ় সংকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি

লক্ষ রাখতে হবে। মন্ত্রীরা আরও উল্লেখ করেন, স্বীকৃতিদানের পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণ পেলে তিনি বাংলাদেশ সফরে যাবেন এবং সৌহার্দ্য এগিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে অতীতকে ভুলে যেতে এবং ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য তিনি বাংলাদেশের জনগণের কাছে আবেদন জানাবেন। একইভাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পরিচালিত বর্বরতা ও ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপারে ঘোষণা করেছেন, তিনি চান, জনগণ অতীতকে বিস্মৃত হয়ে নতুন করে যাত্রা শুরু করুক। তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশের মানুষ ক্ষমা করতে জানে।[৩৬]

চুক্তিতে সই করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরণ সিং ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আজিজ আহমদ।

তথ্যনির্দেশ

১. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (১৯৭২), কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির বক্তব্য, ২৩ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১২।

২. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (১৯৭২), ঘোষণাপত্র, ১৪ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ২৫।

৩. *সংবাদ*, ৩ জানুয়ারি ১৯৭৩।

৪. *সংবাদ*, ৪ জানুয়ারি ১৯৭৩।

৫. লেখকের স্মৃতি থেকে।

৬. *The Bangladesh Observer*, 5 January 1973.

৭. *গণকণ্ঠ*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩।

৮. আ ফ ম মাহবুবুল হক ও আফতাবউদ্দিন আহমদের সঙ্গে লেখকের আলাপ। লেখক ওই সময় *গণকণ্ঠ* পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন।

৯. হাবিব, খালেদা (১৯৯১), *নির্বাচন, জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিসভা*। ঢাকা, পৃ. ৪৩।

১০. Ahmed, Aftab Uddin (1983). *The Mujib Regime in Bangladesh 1972-75; An Analysis of its problems and performance.* PhD thesis submitted to Institute of Commonwealth Studies, University of London, October 1983, p. 304.

১১. *গণকণ্ঠ*, ১০ মার্চ ১৯৭৩।

১২. *সংবাদ*, ১০ মার্চ ১৯৭৩।

১৩. *গণকণ্ঠ*, ১২ মার্চ ১৯৭৩।

১৪. *সংবাদ*, ১১ মার্চ ১৯৭৩।

১৫. Milam, William B (2009), *Bangladesh and Pakistan—Flirting with Failure in South Asia*, Hurst Publishers Ltd., London, p. 37.

১৬. আহমদ, আবুল মনসুর (২০০২), *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, পৃ. ৬২৬-৬২৮।
১৭. ছফা, আহমদ (১৯৮৮), *যদ্যপি আমার গুরু*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ৭৩।
১৮. *গণকণ্ঠ*, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩।
১৯. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ১৫ অক্টোবর ১৯৭৩।
২০. আহমদ, মহিউদ্দিন (২০০৬), *এই দেশে একদিন যুদ্ধ হয়েছিল*, গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ঢাকা, পৃ. ১৭২।
২১. বিটু, ইজাজ আহমেদ (২০১৩), *হতভাগা জনগণ—প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, রাঢ়বঙ্গ, রাজশাহী, পৃ. ৪৬
২২. মিয়া, ১৬৪
২৩. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (১৯৭৪), *ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলনের ভিত্তি ও কর্মসূচি*, পৃ. ১৬-৩০।
২৪. *গণকণ্ঠ*, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪।
২৫. আ স ম আবদুর রবের সঙ্গে আলাপচারিতা।
২৬. মাঈনউদ্দিন খান বাদলের সঙ্গে আলাপচারিতা।
২৭. *একতা*, ২২ মার্চ ১৯৭৪।
২৮. মাঈনউদ্দিন খান বাদলের সঙ্গে আলাপচারিতা।
২৯. হাবিবুল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপচারিতা।
৩০. *সংস্কৃতি*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৭৪; সম্পাদক : বদরুদ্দীন উমর, ঢাকা।
৩১. আমানউল্লাহর সঙ্গে আলাপচারিতা।
৩২. ওই।
৩৩. উবান, পৃ. ১৪৫।
৩৪. আমানউল্লাহ ও মনিরুল ইসলামের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৩৫. মিয়া, পৃ. ১৬০, ১৭৮।
৩৬. রহমান, ড. সাঈদ-উর (২০০৪), *১৯৭২-১৯৭৫ কয়েকটি দলিল*, মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১৮৪-১৮৫।

রূপান্তর

জাসদ নিজেকে বিপ্লবের 'সহায়ক শক্তি' বলে দাবি করত। তাদের বিশ্লেষণ ছিল, বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়টা হলো একটা 'শ্রেণিহীন-শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কাঠামো নির্মাণের পর্যায়'। বাহাত্তরের জুলাই মাসে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে উপস্থাপিত এক প্রতিবেদনে তারা ১৯৪৮-৬৬ সময়টাকে 'গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের জন্য সচেতনতা তৈরির উপরিকাঠামোগত পর্যায়' এবং ১৯৬৬-৭১ পর্বকে 'জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের অবকাঠামো তৈরির পর্যায়' হিসেবে উল্লেখ করে। তাদের উপলব্ধি হলো, যুদ্ধ-পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলনের কাঠামোগত পর্যায়ে একটি শ্রেণিসংগঠন তথা একটি বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলা দরকার। এটা বিকশিত হবে সর্বহারা শ্রেণির সচেতনতা, বিপ্লবী চর্চা ও গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, জাতীয় কৃষক লীগ, জাতীয় শ্রমিক লীগ ও ছাত্রলীগকে তারা মনে করত সমাজতান্ত্রিক গণসংগঠন। তাদের মধ্য থেকে উঠে আসবেন বিপ্লবীরা। ক্রমে ক্রমে এসব বিপ্লবী তাঁদের পাতিবুর্জোয়া মানসিকতা ঝেড়ে ফেলে বিপ্লবের মূল শক্তি শ্রমিকশ্রেণি ও তাদের প্রধান মিত্র কৃষকদের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করবেন।

একটু পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই বিশ্লেষণ সমকালীন বাম রাজনীতির মূলধারার চিন্তা থেকে আলাদা কিছু নয়। প্রচলিত কথাবার্তাগুলোই তারা মৌখিকভাবে হলেও আত্মস্থ করার চেষ্টা করলেন। জাসদ তার লক্ষ্য ঠিক করল এভাবে: 'প্রচলিত পার্লামেন্টারি রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতার ব্যাপারে জনগণকে সজাগ করতে হবে এবং প্রচলিত রাজনীতিকে শুধু বর্জন নয়, এটাকে চিরতরে নির্মূল করতে হবে।'[১]

চারটি গণসংগঠনের কর্মকাণ্ডের সমন্বয়ের জন্য একটা অনানুষ্ঠানিক সমন্বয় কমিটি করা হলো। সিরাজুল আলম খান, যিনি কোনো সংগঠনের কোনো পদে ছিলেন না, তিনিই মূল সমন্বয়কের দায়িত্ব নেন। তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন কাজী আরেফ আহমেদ। কাজী আরেফের প্রধান সহযোগী ছিলেন মনিরুল ইসলাম। একটা পর্যায় পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সিরাজুল আলম খানের কাছ থেকেই আসত। তবে এক জায়গায় জাসদের স্বাতন্ত্র্য ছিল, যা সচরাচর অন্যান্য সংগঠিত বাম দলে খুব কমই দেখা যায়। এখানে ভিন্ন চিন্তা, ভিন্নমতের সুযোগ ছিল। সবাই এক সুরে কথা বলবেন, এটা কদাচিৎ দেখা যেত। ভিন্নমতের জন্য অনেকেই নানাভাবে নিগৃহীত হতেন। তবে আন্তপার্টি সংগ্রামের নামে খুন করে ফেলার মতো চরমপন্থা এদের মধ্যে তখনো দেখা যায়নি। এ ধরনের খুনখারাবি কয়েকটি দলের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভিন্নমতের কারণে সর্বহারা পার্টির নেতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের লেকচারার হুমায়ুন কবিরকে বাহাত্তরের ৭ জুন গুলি করে হত্যা করা হয়। হুমায়ুন কবিতা লিখতেন। *কুসুমিত ইস্পাত* নামে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এ হত্যাকাণ্ড অনেকের বিবেককে নাড়া দেয়।

এ সময় সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইন্ডিয়ার (এসইউসিআই) যোগাযোগ হয়। এই দলটি নিজেদের ভারতের একমাত্র খাঁটি কমিউনিস্ট পার্টি বলে মনে করত। এই দলের একজন উঁচু পর্যায়ের নেতা ছিলেন মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। তাঁর বাড়ি চাঁদপুর। ছোটবেলায় তিনি দেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। বাহাত্তর সালের সেপ্টেম্বরে তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে 'পার্টি প্রক্রিয়ায়' অংশ নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই যোগাযোগটি করিয়ে দিয়েছিলেন জাসদের কৃষি সম্পাদক হাবিবুল্লাহ চৌধুরী। হাবিবুল্লাহ ছিলেন ষাটের দশকে কুমিল্লা জেলা ছাত্রলীগের প্রধান নেতা এবং স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের সঙ্গে সম্পর্কিত। মুবিনুল হায়দার সম্পর্কে তাঁর চাচা।[২]

এসইউসিআইয়ের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রশ্নে জাসদের অনেকেরই আপত্তি ছিল। তেহাত্তরের আগস্ট মাসে সিরাজুল আলম খান ভারতে যান এবং এসইউসিআইয়ের প্রধান নেতা শিবদাস ঘোষের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন।[৩]

ঢাকায় ফিরে এসে সিরাজুল আলম খান 'দুই লাইনের লড়াই'-এর প্রস্তাব করেন। এটা ছিল একটা রাজনৈতিক কৌশল; সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য

গোপন প্রস্তুতি নেওয়া এবং একই সঙ্গে সাংবিধানিক রাজনীতির মাধ্যমে জনমত তৈরি করা।[৪]

হায়দারকে দলের সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে স্বাগত জানানো হয়। এসইউসিআই ও জাসদের মধ্যে কোনো সমঝোতা হয়েছিল, এ কথা হায়দার কখনোই স্বীকার করেননি। তাঁর মতে, দুই দেশের দুই দলের মধ্যে এ ধরনের সম্পর্ক থাকাটা বাস্তবসম্মত নয়। তবে তিনি জাসদের ভেতরে বিপ্লবী শক্তির সম্ভাবনা দেখে উৎসাহিত বোধ করেন এবং 'আদর্শগত মিল' থাকার কারণে জাসদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। জাসদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন রচনায় তিনি যথাসাধ্য অবদান রাখার চেষ্টা করেন।[৫] হায়দার যা-ই বলুন না কেন, দেখা গেছে যে জাসদের অনেক প্রচারপত্র ও পুস্তিকায় এসইউসিআইয়ের মতাদর্শের হুবহু প্রতিফলন ছিল।

রাজনৈতিক অঙ্গনে 'মোড অব প্রডাকশন' (উৎপাদন-পদ্ধতি) বিতর্ককে জাসদ বেশ উসকে দিয়েছিল। সমাজ বিশ্লেষণের প্রচলিত তাত্ত্বিক ধারণার বিপরীতে জাসদ নতুন ধারণা উপস্থাপন করে। এ সময় অন্য বাম দলগুলোর মধ্যে, বিশেষ করে যারা 'সশস্ত্র বিপ্লবে' বিশ্বাস করে, প্রচারধর্মী বক্তব্যই বেশি লক্ষ করা গেছে। এসব বক্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল বাগাড়ম্বরে পরিপূর্ণ এবং মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুংয়ের উদ্ধৃতিতে ভরা। যেমন কিছু একটা বলতে চাইলে যুক্তি দেওয়া হতো—এটা করতে হবে, কেননা কমরেড লেনিন এ কথা বলেছেন..., ওভাবে যাওয়া যাবে না, কারণ চেয়ারম্যান মাও এ বিষয়ে এই কথা বলেছেন ইত্যাদি। বাম রাজনীতিতে এই পীরবাদী প্রবণতা স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাকে প্রায় অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছিল।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ছিল সবচেয়ে পুরোনো দল। তাদের ক্ষমতাসীন দলের সহযোগী হিসেবে দেখা হতো। তেহাত্তরের ডিসেম্বরে দলটির দ্বিতীয় কংগ্রেসে যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের পরিস্থিতি এভাবে মূল্যায়ন করা হয়:

> জাতীয় অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় খাত বিকশিত হচ্ছে এবং সার্বিক অর্থনীতিতে এটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।...অধনবাদী বিকাশের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়ার একটি সুযোগ জনগণের সামনে এসেছে।...সরকারের কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব।[৬]

মাওবাদী গ্রুপগুলোর অবস্থা ছিল শোচনীয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় গণবিরোধী ভূমিকার জন্য এদের অনেকের ভাবমূর্তি ছিল নেতিবাচক।

তাদের কেউ কেউ 'ভারতের দালাল-মুক্তিযোদ্ধাদের' খতম করাকে বিপ্লবী কাজ মনে করত। একাত্তরের ২১ জুলাই মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তর (মুজিবনগর) থেকে ২ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক মেজর খালেদ মোশাররফের কাছে পাঠানো এক গোয়েন্দা প্রতিবেদনে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মোহাম্মদ তোয়াহার এ ধরনের কার্যকলাপের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। 'টপ সিক্রেট' ছাপযুক্ত এই প্রতিবেদনে বলা হয়, 'তোয়াহা হ্যাজ গেইনড প্রমিন্যান্স ইন সাম পার্টস অব নোয়াখালী ডিস্ট্রিক্ট। হিজ ফোর্স হ্যাজ এস্টাবলিশড কমপ্লিট কন্ট্রোল ওভার রুরাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন নাইন ভিলেজেস আন্ডার ছাগলনাইয়া থানা। হিজ সাপোর্টারস কিলড আ ফিউ জোতদারস (আওয়ামী লীগ), হু হ্যাড হেলপ্ড মুক্তিবাহিনী' (তোয়াহা নোয়াখালী জেলার কিছু এলাকায় প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তার বাহিনী ছাগলনাইয়া থানার নয়টি গ্রামের প্রশাসন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করার অপরাধে আওয়ামী লীগের কিছু জোতদারকে তার লোকেরা হত্যা করেছে)।[৭] মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাদের নিজস্ব মূল্যায়ন তাদের অবস্থাকে আরও কোণঠাসা করে দেয়। তারা প্রায় সবাই শেখ মুজিবের সরকারকে 'ভারত-সোভিয়েত অক্ষশক্তির পুতুল সরকার' বলত এবং 'জাতীয় মুক্তির' ধারণাটিকে রাজনীতির প্রধান বিষয় হিসেবে দেখত। এটা ছিল এক নির্মম পরিহাস। যাঁরা যুদ্ধের সময় জনগণের স্বাধীনতার লড়াইয়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন, তাঁরাই যুদ্ধের পর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রবক্তা হয়ে গেলেন।

এই দলগুলো 'জাতীয় মুক্তি' বা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আহ্বান জানায়। তাদের মূল্যায়ন ছিল, বাংলাদেশ একটি 'আধা সামন্ততান্ত্রিক' সমাজ এবং রাষ্ট্র হচ্ছে একটি 'উপনিবেশ' বা 'আধা উপনিবেশ'। বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণসমৃদ্ধ বইপত্রের ঘাটতি ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা আবদুল হকের লেখা *বাংলাদেশ আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী* বইটি তখন বাজারে পাওয়া যেত। বইটির বিশ্লেষণ ছিল খুবই নিম্নমানের। আবদুল হক তখনো পার্টির নামের আগে 'পূর্ব পাকিস্তান' শব্দটি ব্যবহার করতেন। এদের বিপরীতে জাসদ নতুন তত্ত্ব হাজির করে। জাসদের বিশ্লেষণ ছিল, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চরিত্র হচ্ছে ধনতান্ত্রিক, যদিও এই ধনতন্ত্র অনুন্নত পর্যায়ে রয়ে গেছে। যেহেতু রাজনৈতিক ক্ষমতা বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধিদের হাতে, তাই বিপ্লবী শক্তির আশু লক্ষ্য হওয়া উচিত

রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বুর্জোয়া শক্তিকে হটিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা।[৮]

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আখলাকুর রহমান তেহাত্তরে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। এর আগে তিনি পাকিস্তানের সম্পদশালী ২২ পরিবারের অন্যতম সায়গল পরিবারের মালিকানাধীন ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেডের চিফ ইকোনমিস্ট হিসেবে চাকরি করতেন। তিনি জাসদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাঁর প্রথম প্রকাশ্য উপস্থিতি লক্ষ করা যায় তেহাত্তরের জুন মাসে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাসদ-ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে একটি আলোচনায় অংশ নেওয়ার মাধ্যমে।

সম্মেলনে আ ফ ম মাহবুবুল হককে সভাপতি ও মাহমুদুর রহমান মান্নাকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। বরাবরের মতো এবারও সম্মেলনে কোনো ভোটাভুটি হয়নি। সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে কাজী আরেফ আহমেদ ও মনিরুল ইসলাম একটা কমিটি তৈরি করে দেন। কমিটিতে নবাগতদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। পুরোনো ও অভিজ্ঞ নেতাদের প্রায় সবাই বাদ পড়েন। বাদ পড়াদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক বদিউল আলম, প্রচার সম্পাদক ইকরামুল হক এবং দপ্তর সম্পাদক রেজাউল হক মুশতাক। এর একটা উদ্দেশ্য ছিল, তাঁদের বিপ্লবী পার্টি গঠন-প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা হবে। কয়েকজন এটা মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা দলের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেন।

তেহাত্তরের শুরু থেকে গণসংগঠনগুলোর যে সমন্বয় কমিটি কাজ করেছিল, চুয়াত্তরের মে মাসে তাকে আরও বিস্তৃত করা হয়। এ সময় সমন্বয় কমিটির সদস্য ছিলেন ৩২ জন। এই কমিটির অন্যতম প্রধান কাজ ছিল, 'পার্টি'র জন্য একটা তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি করা। জুন মাসে একটা 'খসড়া থিসিস' তৈরি হলো। এটা পরে কিছু সংযোজন-বিয়োজনের মধ্য দিয়ে ছিয়াত্তরের জানুয়ারি মাসে 'পরিমার্জিত খসড়া থিসিস' নামে ছাপা হয়। খসড়া থিসিসের ভূমিকায় বলা হয় :

> বাংলাদেশের বামপন্থীরা নিজেদের মধ্যে মতাদর্শগত ঝগড়া করছে। ভুল রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করার কারণেই এটা হয়েছে। এরা বিভক্ত এবং দুর্বল। বিপ্লবীদের জন্য এই অবস্থা বিপজ্জনক। কেবলমাত্র সঠিক রাজনীতি, রণনীতি ও রণকৌশল বিপ্লবী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ, সুসংহত ও শক্তিশালী করতে পারে।

১৯৭৬ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত 'খসড়া থিসিস' (পরিমার্জিত)-এর প্রচ্ছদ

> প্রস্তাবিত রাজনৈতিক লাইনটি (থিসিসে আলোচনা করা হয়েছে) সঠিক বলেই আমাদের বিশ্বাস। এই লাইনের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পার্টি গড়ে উঠবে। এই পার্টি হবে সর্বহারার অগ্রগামী অংশ—শোষিতের সামরিক সংগঠন। এই পার্টি শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে আসন্ন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করবে এবং সর্বহারা ও শোষিত মানুষের বিপ্লবী একনায়কত্বের অধীনে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করবে।

থিসিসে সোভিয়েত ও চীনা পার্টির যাঁরা 'অন্ধ অনুকরণ' করছেন, তাঁদের সমালোচনা করা হয় এবং ১৯৬৩ সালের ১৪ জুন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে লেখা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির চিঠির উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, কোনো রকম বাছবিচার ছাড়াই বিদেশি পার্টির নীতি ও কৌশলের অন্ধ অনুকরণ করলে বিভ্রান্তি এবং ব্যর্থতা ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। অভ্যন্তরীণ রাজনীতি প্রসঙ্গে বলা হয়, 'যেহেতু বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বুর্জোয়া শ্রেণিকে উৎখাত করা, তাই এই বিপ্লব হবে সমাজতান্ত্রিক।' বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজ আনুষঙ্গিক দায়িত্ব হিসেবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচির মধ্যে একীভূত হবে।[৭]

খসড়া থিসিসে এসইউসিআইয়ের রাজনৈতিক তত্ত্ব ও কৌশলের প্রতিফলন ছিল সুস্পষ্ট। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর মধ্যে একমাত্র এসইউসিআই ঘোষণা দিয়েছিল, বিপ্লবের স্তর হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক। এই তত্ত্ব প্রচারের কারণে অনেকেই সিরাজুল আলম খান এবং জাসদকে ট্রটস্কিপন্থী হিসেবে অভিহিত করেন। অবশ্য যে দলগুলো রাজনীতিতে পরিশীলিত ভাষা ব্যবহার করার চেয়ে গালাগালি করতে অভ্যস্ত, তারা জাসদকে কেউ বলত 'জারজ সন্তানের দল', কেউ বলত 'ভারতের সেকেন্ড ডিফেন্স লাইন'। দলটির সমালোচনা হিসেবে সম্ভবত সবচেয়ে শোভন মন্তব্যগুলো ছিল 'উগ্র', 'হঠকারী' ও 'বিভ্রান্ত'। এ দেশের বাম রাজনীতির দুর্ভাগ্য হলো, দলগুলো 'শ্রেণিশত্রুর' বিরুদ্ধে যতটা না সোচ্চার, তার চেয়ে বেশি নির্মম অন্য বাম দলের প্রতি। এদের আরেকটি প্রবণতা হলো, নিজ দলকে একমাত্র খাঁটি বিপ্লবী দল হিসেবে দাবি করা এবং অন্য সব দলকে কুচক্রী, ষড়যন্ত্রকারী, বিশ্বাসঘাতক ও দেশি-বিদেশি শক্তির এজেন্ট হিসেবে চিত্রিত করা।

জাসদকে যেসব দল ভারতের দালাল বলে প্রচার করত, তাদের অন্যতম ছিল আবদুল হকের নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল)। এই দলের যুব সংগঠন ইয়ুথ ফ্রন্ট ফর ন্যাশনাল লিবারেশনের একটি প্রচারপত্রে জাসদকে নির্মমভাবে আক্রমণ করা হয়। ১৯৭৩ সালের ২৮ জুন প্রকাশিত এই প্রচারপত্রে বলা হয়:

> উগ্র জাতীয়তাবাদের একনিষ্ঠ পূজারি হয়েও কেন তারা মার্ক্সবাদের কথা বলছে? শ্রেণিসংগ্রামের কথা বলছে? এর উত্তরও সবার জানা আছে। যখন তারা দেখল যে উগ্র জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে জনগণকে তারা আর ধরে রাখতে পারছে না, তথাকথিত স্বাধীনতার স্বরূপ জনগণের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তখন তারা সাততাড়াতাড়ি ভোল পাল্টে ফেলে এবং মার্ক্সবাদ, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও শ্রেণিসংগ্রামের ধ্বজা তুলে ধরে। এর প্রয়োজনে তারা তাদের মূল সংগঠন আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে আসে। জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম বানচাল করার জন্য এবং জনগণের স্তরে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্যই তারা এটা করেছে।[১০]

বাংলাদেশের রাজনীতিতে মওলানা ভাসানীর ব্যাপক প্রভাব ছিল। জাসদ চেষ্টা করছিল মওলানা ভাসানীর সহানুভূতি পাওয়ার। ভাসানী কোনো রাজনৈতিক জোট তৈরি করলে তাতে যাতে জাসদকে রাখা হয়, সে জন্য জাসদের আগ্রহ ছিল। ভাসানীর দলের ভেতরে বিভিন্ন কমিউনিস্ট দল ও গ্রুপের তখন রীতিমতো প্রতিযোগিতা, কে ভাসানীকে 'ব্যবহার' করবে। নানা

দিক থেকে ভাসানীর ওপর চাপ আসছিল। অবশ্য আর কোনো দল বা গ্রুপই জাসদকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করার পক্ষপাতী ছিল না।

অনেক দিন ধরে ভাসানীপন্থী ন্যাপের কাউন্সিল অধিবেশন হয়নি। চুয়াত্তরের ২১ মে ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে ন্যাপের প্রচার সম্পাদক রাশেদ খান মেনন ভাসানীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এক মাসের মধ্যে দলের কাউন্সিল অধিবেশন না ডাকা হলে 'রিকুইজিশন ন্যাপ' গঠন করা হবে। ২২ মে ভাসানী এর একটা জবাব দেন। ভাসানী তাঁর বিবৃতিতে উল্লেখ করেন :

> রাশেদ মেননের প্রেস কনফারেন্সের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় আমি শুধু দেশবাসীর নিকট ইহাই বলিতে চাই যে, তথাকথিত বিপ্লবী নামধারী কমিউনিস্টরা গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ আমার ঘাড়ে সওয়ার হইয়া রাজনীতি করিয়া বাজিমাত করিতে চায়। কিন্তু তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা মোটেই পূরণ করিতে পারে নাই। কারণ আমি কোনোকালেই কমিউনিস্ট ছিলাম না এবং বর্তমানেও নহি। ইনশা আল্লাহ ভবিষ্যতেও হইব না।...
>
> আমি বারবার তাহাদিগকে বলিয়াছি, আমার পাছে ঘুরিয়া তথাকথিত কমিউনিজম প্রচার করিয়া কোনো লাভ হইবে না। তোমরা নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী পৃথকভাবে নিজেদের সংগঠন গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করো।...চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী আমার ছত্রচ্ছায়ায় যাহারা রাজনীতি করে, তাহারাই আবার আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে, তাহাতে আমি মোটেও দুঃখিত নই।[১১]

এর কিছুদিন পর কাজী জাফর আহমেদ, রাশেদ খান মেননসহ বেশ কয়েকজন নেতা ন্যাপ ছেড়ে ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (ইউপিপি) নামে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন।

একটা 'থিসিস' গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে জাসদের রাজনীতিতে কিছুটা পরিবর্তন এল। জাসদ অফিসে আখলাকুর রহমান ও সিরাজুল আলম খান রাজনৈতিক ক্লাস নেওয়া শুরু করেছিলেন আগে থেকেই। ঢাকার বাইরে এই উদ্যোগ ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলো। চুয়াত্তরের জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি ভেঙে দিয়ে তৈরি করা হলো একটা 'কেন্দ্রীয় ফোরাম'। এই ফোরামই ছিল প্রস্তাবিত বিপ্লবী পার্টির ভ্রূণ।

তাত্ত্বিক ভিত্তি যখন তৈরি হয়ে গেল, তখন প্রয়োজন হলো একটি কর্মসূচির। যেহেতু দেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী এবং গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত, কৃষি ও কৃষকদের জন্য একটা কর্মসূচি উপস্থাপন করার বিষয়টি অগ্রাধিকার পেল। জাতীয় কৃষক লীগের নামে চুয়াত্তরের অক্টোবরে প্রকাশ করা হলো 'সমাজতান্ত্রিক কৃষি বিপ্লবের কর্মসূচি'। এতে কৃষি বিষয়ে মূল প্রস্তাব ছিল :

১৯৭৪ সালের অক্টোবরে জাতীয় কৃষক লীগ প্রকাশিত 'সমাজতান্ত্রিক কৃষি বিপ্লবের কর্মসূচী' পুস্তিকার প্রচ্ছদ

১. বর্গাচাষ উচ্ছেদ করতে হবে। বর্গাচাষের অধীন সকল জমি বিনা ক্ষতিপূরণে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে।
২. ব্যক্তিগত খামারের সর্বোচ্চ সীমা হবে ২৫ বিঘা।
৩. জমি বেচাকেনা বন্ধ করতে হবে।
৪. কৃষি সমবায়ীকরণের পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহারে বলা হয়, সমাজতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা, অর্থাৎ কৃষিকে সমবায়ীকরণের কর্মসূচির ভিত্তিতে গ্রামে গ্রামে মতাদর্শগত আন্দোলন শুরু করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে 'গণ-কৃষক কমিটি' গড়ে তুলতে হবে। গণকমিটিগুলোই হবে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি।[১২]

সমাজতান্ত্রিক কৃষি বিপ্লবের কর্মসূচির তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে জাসদ এ সময় *বাংলাদেশের কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ* নামে একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করে। বইটি আখলাকুর রহমানের নামে ছাপা হয়, যদিও এটা ছিল দলের একটা যৌথ প্রয়াস। লেনিনের বিখ্যাত গবেষণাধর্মী লেখা 'রাশিয়ার কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ'-এর ছায়া এই বইতে বেশ স্পষ্ট। জাসদের বিশ্লেষণ ছিল, বাংলাদেশের কৃষির মূল চরিত্র ধনতান্ত্রিক। এখানে জমি কেনাবেচা হয়। কৃষক ফসল উৎপাদনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বাজারের কথা চিন্তা

করেন। তবে কৃষিব্যবস্থা ধনবাদী বিকাশের অনুন্নত স্তরে থেকে যাওয়ার কারণে উৎপাদনে স্থবিরতা ও দারিদ্র্য দেখা যায়। সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই এই অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব।[১৩]

জাসদের মধ্য থেকে যখন একটা 'বিপ্লবী পার্টি'র প্রয়োজন অনুভূত হলো, সঙ্গে সঙ্গে একটা 'বিপ্লবী বাহিনী'ও গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দিল। চুয়াত্তরের ১৭ মার্চের ঘটনার পর কেন্দ্রীয় ফোরাম থেকে একটা প্রচারপত্র বের হয়। এর শিরোনাম ছিল, 'গণ-আন্দোলনকে কীভাবে বিপ্লবী আন্দোলনে উন্নীত করা হবে'। এই প্রচারপত্রে বলা হয়, সময়ের দাবি হলো শ্রমিক, কৃষক ও তরুণদের মধ্য থেকে উঠে আসা পেশাদার বিপ্লবীদের নিয়ে এলাকাভিত্তিক গেরিলা ইউনিট গড়ে তোলা। রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রধান রণকৌশল হবে শহরাঞ্চলে উপর্যুপরি গণ-আন্দোলন এবং গ্রামাঞ্চল থেকে অভিযানের সমন্বয়ে একটা বিপ্লবী অভ্যুত্থান সংঘটিত করা। গণ-আন্দোলনের ছত্রচ্ছায়ায় নানা কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়ে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এভাবেই গেরিলা ইউনিটগুলো গড়ে উঠবে। গেরিলা ইউনিটগুলোর কর্তব্য হলো প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে শ্রেণিশত্রুদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা। কাজের মধ্য দিয়েই গেরিলারা তাদের সংখ্যা ও শক্তি বাড়াবে এবং একটি বিপ্লবী সেনাবাহিনীতে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়।[১৪]

চুয়াত্তরের জুন মাসের পর থেকে কেন্দ্রীয় ফোরাম *সাম্যবাদ* নামের একটা গোপন সাময়িকী প্রকাশ করা শুরু করে। সম্ভাব্য বিপ্লবীদের একটা তালিকা তৈরি করে তাঁদের কাছে এটা নিয়মিত পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। *সাম্যবাদ*-এ দ্বিতীয় সংখ্যায় বিপ্লবী বাহিনীর তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং প্রায়োগিক বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা হয়। প্রস্তাবিত বিপ্লবী বাহিনীর নাম দেওয়া হয় 'বিপ্লবী গণবাহিনী'। মাও সে-তুংকে উদ্ধৃত করে বলা হয়, 'যুদ্ধ হচ্ছে বিরোধ মীমাংসার জন্য সংগ্রামের সর্বোচ্চ রূপ।' বিপ্লবী গণবাহিনীর যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে বলা হয় :

> অনেক অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ পুঁজিবাদী ও আধা পুঁজিবাদী দেশে শোষিত জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু থেকেই সশস্ত্র হতে বাধ্য। কারণ, এসব দেশের বুর্জোয়া শ্রেণি ও পেটি বুর্জোয়া শ্রেণির এক অংশ রাষ্ট্রক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আঁতাত করে, সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশ ও পরামর্শে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে এবং তাদের ওপর চালায় অমানুষিক রাজনৈতিক নিষ্পেষণ, নিদারুণ দমননীতির মাধ্যমে শোষিত জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং তাদের রাজনৈতিক দলকে নিঃশেষ ও

নির্মূল করার চেষ্টা করে। তাই এসব দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন ও শ্রেণিসংগ্রাম চালনা করার জন্য চাই সর্বহারার অগ্রণীর নেতৃত্বে শোষিত শ্রেণিগুলোর সুসংগঠিত সশস্ত্র বাহিনী। এমনকি সর্বহারার অগ্রণীকেও হতে হবে সর্বতোভাবে একটি সামরিক পার্টি। লেনিন বলেছেন, বিপ্লবী সেনাবাহিনীর প্রয়োজন এ জন্য যে, কেবল শক্তিবলেই বৃহত্তর ঐতিহাসিক সমস্যার সমাধান সম্ভব এবং আধুনিক সংগ্রামে শক্তি-বল সংগঠনের অর্থই হচ্ছে সামরিক সংগঠন। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে যুদ্ধ অনিবার্য ও অপরিহার্য। যুদ্ধ বিরোধ মীমাংসার জন্য সংগ্রামের সর্বোচ্চ রূপ। পুঁজিবাদী সমাজে জনগণের শোষণকারী ও নির্যাতনকারী শ্রেণিসমূহকে নির্মূল করার যুদ্ধই হচ্ছে একমাত্র আইনসংগত যুদ্ধ।[১৫]

এই বিশ্লেষণে লেনিনের দুটো রচনা থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়। একটি রচনা হচ্ছে, 'মার্ক্সবাদ ও সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান' এবং অন্যটি হচ্ছে 'বিপ্লবী সেনাবাহিনী ও বিপ্লবী সরকার'।[১৬]

গণবাহিনীর লক্ষ্য সম্বন্ধে লেনিনকে উদ্ধৃত করে বলা হয় :

এর উদ্দেশ্য শুধু সামরিক লক্ষ্য অর্জন নয়, জনগণের বিপ্লবী রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা তার প্রধান উদ্দেশ্য। যদি শুধু আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার জন্যই গণবাহিনী ব্যবহার করা হয়, তবে তার বিকাশ ব্যাহত হবে, তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং সামরিক লক্ষ্য অর্জিত হলেও তারা পরিণামে একটি প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীতে রূপান্তরিত হবে।[১৭]

জাসদের নেতৃত্ব গণবাহিনীর 'সামরিক দিকটির সংকীর্ণ লক্ষ্য' সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং যেকোনো ধরনের অ্যাডভেঞ্চারিজমের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তাঁদের মতে এখানে রাজনীতিই মুখ্য, সামরিক মাত্রাটি একটি আনুষঙ্গিক বিষয়, যদিও তা অপরিহার্য। 'অস্ত্র হাতে নিয়ে গণবাহিনীর সদস্য হওয়ার অর্থ রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত হওয়া নয়। পক্ষান্তরে গণবাহিনীর সদস্য হওয়ার অর্থ হচ্ছে আরও ব্যাপকভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়া। কারণ, গণবাহিনীর প্রতিটি কার্যকলাপ জনগণ সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে। অনাদিকাল থেকে অস্ত্রধারী ব্যক্তিরা নানাভাবে জনগণকে উৎপীড়ন করেছে। তারা উৎপীড়িত হয়েছে অস্ত্রধারী ডাকাতের হাতে, উৎপীড়িত হয়েছে অস্ত্রধারী পুলিশের হাতে, উৎপীড়িত হয়েছে অস্ত্রধারী বিভিন্ন সামরিক বাহিনীর হাতে। তারা সেই উৎপীড়নকে ভয় করে। তারা অস্ত্রধারী ব্যক্তিদের ভয় করে।' রাজনীতিতে অস্ত্রবাজির নেতিবাচক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়, 'রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস হচ্ছে বন্দুকের নল, কিন্তু বন্দুক অবশ্যই থাকবে সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টির নিয়ন্ত্রণে ও

কর্তৃত্বে।' মাও সেতুংয়ের রচনা 'যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা' থেকে উদ্ধৃত করে বলা হয়, 'পার্টি বন্দুককে পরিচালনা করে, বন্দুককে কোনোমতেই পার্টিকে পরিচালনা করতে দেওয়া হবে না।'[১৮]

জাসদের নেতৃত্ব এই পুস্তিকাটিতে অন্য বাম রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যকলাপের একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করে। যেসব দল 'সশস্ত্র সংগ্রামের' কথা বলত, তাদের সম্বন্ধে জাসদের পর্যালোচনা ছিল :

> বাংলাদেশের অধিকাংশ মার্ক্সবাদী দলই এ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে সঠিক বিশ্লেষণ করতে পারেনি। কারণ তারা কেতাবি মার্ক্সবাদী। তারা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই জনসাধারণ তাদের শক্তির উৎস নয়। কিছুসংখ্যক মার্ক্সবাদী সশস্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন চালনা করার চেষ্টা করেছেন অথবা করছেন। তাঁদের প্রয়াসও বিক্ষিপ্ত। এবং যেহেতু তাঁদের রাজনৈতিক লাইন ভ্রান্ত, সেহেতু তাঁদের রণনীতি এবং রণকৌশলও ভ্রান্ত। তাঁদের প্রয়াস জনগণকে সক্রিয়ভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি, জনতাকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করতে পারেনি, সংগঠিত করতে পারেনি। স্থানে স্থানে তাঁরা জনগণের নেতিবাচক সমর্থন পেয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁদের প্রয়াস সন্ত্রাসবাদী দুঃসাহসিকতায় পরিণত হতে বাধ্য। এরূপ পেটি বুর্জোয়া অতিবিপ্লবী কার্যকলাপ সব সময়ই বিপ্লবের পরিপন্থী হয়ে ওঠে, প্রতিবিপ্লবীদের শক্তিশালী করার সহায়ক হয়; সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের দালালদের চক্রান্তকে কার্যকর করতে সাহায্য করে।[১৯]

একটা দল বিপ্লবের কথা বললেও কেমন করে 'সন্ত্রাসবাদী দলে' পরিণত হয়ে যেতে পারে, সে ব্যাপারে জাসদের নেতৃত্ব শুরু থেকেই সচেতন ছিলেন বলে উপরিউক্ত উদ্ধৃতি থেকে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো ভিন্ন। জাসদও অন্য অনেক দলের মতো সন্ত্রাসবাদের ফাঁদে পা দিয়েছিল, বুঝে কিংবা না বুঝে। চুয়াত্তরের ডিসেম্বরের শেষে দেশে যখন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়, তখন রাজনীতির চালচিত্র বদলে যায়। ওই সময় গণবাহিনীর অপরিহার্যতা প্রমাণ করার পক্ষে অনেক যুক্তি উপস্থাপিত হয়। সে জন্য 'বিপ্লবীদের এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে' আহ্বান জানানো হয়। বলা হয়, 'বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রত্যেকটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীর কর্তব্য হচ্ছে বিপ্লবী গণবাহিনীতে যোগ দেওয়া, এই বাহিনীকে গঠন, সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী করা। বিপ্লবী গণবাহিনীর কর্তব্য হচ্ছে নিজেকে সর্বহারা শ্রেণির পার্টির অংশ হিসেবে গড়ে তোলা, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া, জনগণকে রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে সংগঠিত করা, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করা

এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উত্তরণের এ সংগ্রামে বিপ্লবী সরকারের প্রধান ভিত্তিরূপে কাজ করা।'[২০]

যদিও বিপ্লবী গণবাহিনীকে একটি বিপ্লবী পার্টির শাখা হিসেবে প্রাথমিকভাবে চিন্তা করা হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে অনেক জায়গায় দেখা যায়, গণবাহিনীর ইউনিটগুলোই প্রকারান্তরে পার্টির ইউনিট হয়ে গেছে। অন্যভাবে বলা যায়, গণবাহিনীর ইউনিটগুলো একটা বিপ্লবী পার্টি হয়ে ওঠার পথে ধাত্রীর কাজ করেছে।

জাসদের এই সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে কিউবার বিপ্লবী অনুশীলনের প্রভাব লক্ষণীয়। এটা উল্লেখ করা যেতে পারে, শুরু থেকেই জাসদ নিজেকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের 'মূলধারা' থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছিল। তাদের সামনে আইকন বা আদর্শ হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন সিমন বলিভার, সানডিনো ও ফিদেল কাস্ত্রো। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তাঁরা প্রায়ই উদাহরণ দিতেন ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন, প্রীতিলতা ও সুভাষ বসুর। জাসদ মনে করত, তারা এসব বীরের উত্তরাধিকার বহন করছে। অন্য কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর সঙ্গে তাদের আরেকটি প্রধান পার্থক্য ছিল, জাসদ তাদের প্রচারপত্রে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার কথা মাঝেমধ্যে বললেও মূলত তারা ছিল জাতীয়তাবাদী। ১৯৭০ সাল থেকেই সিরাজপন্থী ছাত্রলীগের কর্মীদের রাজনৈতিক পাঠ্যসূচিতে চে গুয়েভারার *গেরিলা ওয়ারফেয়ার* এবং রেজিস দেব্রের *রেভল্যুশন ইন দ্য রেভল্যুশন* গ্রন্থ দুটো ছিল। এর ফলে তাদের মধ্যে গোড়া থেকেই একধরনের মনস্তত্ত্ব গড়ে ওঠে, যা ছিল রোমান্টিক, আবেগাশ্রয়ী, সাহসিকতাপূর্ণ ও অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয়।

আরেকটা জিনিস ছিল খুবই লক্ষণীয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, আমলাতন্ত্র ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে একটা মিল দেখা যায়। এসব সংগঠনে পদমর্যাদার বিষয়টি সচেতনভাবে লালন করা হয়। গ্রামের একজন সাধারণ কর্মী, একজন অফিসের পিয়ন কিংবা একজন সেপাই দলের সভাপতি কিংবা মন্ত্রণালয়ের সচিব অথবা সামরিক বাহিনীর জেনারেলের সামনে চেয়ারে বসা তো দূরের কথা, তাঁদের কামরার কাছাকাছিও যেতে পারেন না। জাসদ ছিল এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। যাঁরা গোড়া থেকে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত নন, তাঁদের পক্ষে জাসদের মধ্যকার এ ধরনের অনানুষ্ঠানিক ব্যক্তি-সম্পর্ক বোঝা এবং আত্মস্থ করা খুবই কঠিন। দলের এক অংশকে বাদ দিয়ে আরেক অংশের মধ্যে কানাকানি, উপদলীয় ষড়যন্ত্র, কোটারি রাজনীতি থেকে জাসদ শুরুর দিকে ছিল অনেকটা

মুক্ত। বাহাত্তরের পর থেকে বানের জলের মতো যখন তরুণেরা বিভিন্ন পটভূমি থেকে জাসদের মধ্যে প্রবিষ্ট হতে থাকেন, তখন থেকে এর চরিত্র ধীরে ধীরে পাল্টে যেতে থাকে।

জাসদের মধ্যে সামরিকীকরণ এবং এর ফলে গণবাহিনীর উন্মেষ অস্বাভাবিক ছিল না। জাসদের কর্মীরা বাহাত্তরের অক্টোবরের পর থেকেই বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের শিকার হতে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আক্রমণ আসত আওয়ামী লীগের কাছ থেকে। অনেক জায়গায় আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতারা জাসদের সদস্যদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতে শুরু করেন। আওয়ামী লীগের অনেক নেতাই তখন জীবনে প্রথমবার ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে রীতিমতো উল্লসিত, অধৈর্য ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠছেন। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে তাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদ নয়ছয় করার প্রবণতা। জাসদের কর্মীরা অনেকেই ছিলেন তরুণ, একগুঁয়ে ও প্রতিবাদী। ফলে সংঘর্ষ ছিল অনিবার্য।[২১]

স্বাধীন বাংলাদেশে সম্ভবত রাজনৈতিক প্রতিহিংসার প্রথম শিকার হন ঢাকার নওয়াবগঞ্জ পাইলট স্কুলের শিক্ষক ও জাতীয় কৃষক লীগের নেতা এবং ওই এলাকার সবর্জনশ্রদ্ধেয় মুক্তিযোদ্ধা সিদ্দিক মাস্টার। বাহাত্তরের ১২ নভেম্বরে তাঁকে খুন করা হয়। মানিকগঞ্জ জেলা জাসদের যুগ্ম আহ্বায়ক সাদত হোসেন বাদল তেহাত্তরের ১০ জানুয়ারি নিহত হন। ৪ ফেব্রুয়ারি একদল সশস্ত্র ব্যক্তি বরিশালে মেজর জলিলকে আক্রমণ করলে তিনি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। ২৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর ওপর আরেকটি আক্রমণ হয়। তাতে তিনি এবং জাসদের আরও আটজন কর্মী আহত হন। ২৬ মে জাসদ গণপ্রতিবাদ দিবস পালন করে। ওই দিন নরসিংদীতে আলাউদ্দিন ও মোমেন নামের দুজন নিহত হন। একই দিন বরিশালের উজিরপুরে পুলিশের গুলিতে জাসদের ২০ জন কর্মী আহত হন। ১৭ সেপ্টেম্বর নওয়াবগঞ্জে জাসদ ও ছাত্রলীগের মিছিলে হামলা হয়। গুলিতে অনেকে আহত হন। একই মাসে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক বোরহানউদ্দিন রোকনকে খুন করা হয়। ১৭ অক্টোবর রক্ষীবাহিনীর একটি দল রাজশাহী শহরে জাসদের অফিসে হামলা চালায় এবং সবকিছু তছনছ করে দেয়। চুয়াত্তরের ৩ ফেব্রুয়ারি জাসদের জাতীয় কমিটির সহসভাপতি মোশাররফ হোসেনকে যশোরে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৭ মার্চ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর একটি দল ঢাকায় জাসদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা চালায় এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। ১৭ মার্চের পর জাসদের ওপর আক্রমণ-নির্যাতন আরও বেড়ে যায়।[২২]

জাসদের কর্মীদের প্রতি জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের আচরণ ছিল নির্মম। পাকিস্তান আমলে যেমন স্বাধীনতাসংগ্রামী ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীদের 'দুষ্কৃতকারী' বলা হতো, স্বাধীন বাংলাদেশেও সে আচরণের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। 'জাসদের দুষ্কৃতকারীদের' বিরুদ্ধে রক্ষীবাহিনীর কার্যকলাপ অবস্থার আরও অবনতি ঘটায়। রক্ষীবাহিনীর হাতে নির্যাতিত জাসদের কর্মীদের অভিজ্ঞতা ছিল ভয়াবহ। 'রাজনৈতিক চরমপন্থীদের' শায়েস্তা করার জন্য রক্ষীবাহিনীর হাতে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়।

বগুড়ায় জাসদের কর্মকাণ্ডের পরিধি ছিল ব্যাপক। রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে জাসদের কর্মীদের 'সংঘর্ষ' ছিল নিয়মিত ঘটনা। তেহাত্তর সালে এসব 'সংঘর্ষে' জাসদের ২৩ জন কর্মী নিহত হন বলে দলীয় সূত্রে জানা যায়। জাসদের কর্মী খুঁজে বের করে গুলি করে হত্যা করার অভিযোগ ছিল রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে। এরকম একটি হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন বগুড়া আজিজুল হক কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্র এমদাদুল হক শ্যামল। শ্যামলদের বাসা ছিল শহরের জলেশ্বরীতলায়। স্থানীয় যুবলীগের কয়েকজন তাঁর বিরুদ্ধে রক্ষীবাহিনীকে লেলিয়ে দেন বলে জানা যায়। শ্যামল পালিয়ে গিয়ে সারিয়াকান্দি থানার বোহাইল ইউনিয়নের মধুখালী গ্রামে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের বাড়িতে আত্মগোপন করেন। এটা জানাজানি হয়ে গেলে রক্ষীবাহিনী ওই গ্রামে হামলা চালায়। শ্যামল ঘর থেকে বেরিয়ে আখখেতে লুকিয়ে থাকেন। রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা আখখেত ঘেরাও করে তাঁকে ধরে ফেলেন এবং তখনই তাঁকে গুলি করে হত্যা করেন। এ সময় বগুড়া যুবলীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা খসরু, শাহেদ ও রানা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শ্যামলের লাশ সারিয়াকান্দি থানায় এনে রেখে দেওয়া হয় এবং পরে তাঁর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। রমজান মাসে এই ঘটনা ঘটে।[২৩]

রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের হাতে কত মানুষ গুম কিংবা খুন হয়েছে, তার সত্যিকার হিসাব হয়তো কখনো পাওয়া যাবে না। ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ের অধিবাসী, বাংলাদেশ সরকারের একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আবদুল গনি আকন্দ তাঁর ছেলে প্রসঙ্গে রক্ষীবাহিনীর কর্মকাণ্ডের একটা নমুনা বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> এক মিথ্যা ও ভুয়া সংবাদ পাইয়া একদল রক্ষী সৈন্য রাত একটায় আমার গৃহের দরজায় নক করে ও ডাক দেয়। আমি দরজা খুলিয়া অবাক, আমার দরজায় রাইফেল কাঁধে রক্ষীবাহিনী। জিজ্ঞাসা করি, 'আপনারা কে, কেন আসিয়াছেন?' প্রশ্ন করিল, 'খায়রুল বাশার কোথায়? আমরা তাকে নিতে

আসিয়াছি, তাহার বিরুদ্ধে এলিগেশন আছে।' এই বলিয়া তাহারা খায়রুল বাশারকে ঘুম হইতে জাগাইয়া রশি দ্বারা বাঁধিয়া ফেলিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, 'বন্দুকটি কোথায়?' খায়রুল তখন নেহাত বালক। সর্বহারা পার্টির সহিত জড়িত বলিয়া উহারা সন্দেহ প্রকাশ করিল বারবার। অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। প্রায় অর্ধঘণ্টা যাবৎ বাক্স, সিন্দুক, আলমারি তছনছ করিল, কোথায়ও আপত্তিকর কিছু না পাইয়া খায়রুলকে গফরগাঁও রক্ষী ক্যাম্পে নিয়া গেল। রাত্র প্রভাত হইলে ওয়াপদা বিল্ডিংয়ে অবস্থিত রক্ষী ক্যাম্পে যাই ও সেখানে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন অন্যান্য বন্দীর সহিত খায়রুলকে দেখিতে পাই। খায়রুলের বয়স তখন পনেরো। কমান্ডার সাহেবের সম্মতিতে খায়রুলের জন্য নাশতা-খাবার, কাপড়চোপড়, বিছানাপত্র বাসা হইতে আনিয়া ক্যাম্পে পৌঁছাইয়া দেই। ওই দিনই বৈকালে খাবার নিয়া গেলে খায়রুল আমাকে জানাইল, যেন খাবার বেশি পরিমাণে পাঠাই—কারণ, ক্যাম্পের অনেকেরই খাবার দিবার মতো কেহ নাই। এই জন্য একটা বড় টিফিন ক্যারিয়ার ব্যবহার করিতাম। পাঁচ দিন পর খায়রুল জানাইল, 'বাবা, বেশি খাবার আনিবেন না, উহাদেরকে মারিয়া ব্রহ্মপুত্র নদীতে ফেলিয়া দিয়াছে, এখন আমরা মাত্র নয়জন বন্দী আছি, আমাদিগকে ময়মনসিংহ পাঠাইয়া দিবে।' যাহারা এই বাহিনীর হাতে গফরগাঁও ক্যাম্পে নিহত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অত্র এলাকার মুক্তিযোদ্ধা জসিমুদ্দিনও ছিল। ইহাদের কাহারও লাশ পাওয়া যায় নাই।[২৪]

জাসদের উদ্যোগে চুয়াত্তরের ১৭ মার্চের পর বিভিন্ন স্থানে 'সন্ত্রাসবিরোধী স্কোয়াড' গড়ে তোলা হতে থাকে। প্রধানত ছাত্রলীগের সদস্যরাই এসব স্কোয়াডের সদস্য ছিলেন। চুয়াত্তরের জুলাই মাস থেকে কেন্দ্রীয় ফোরামের উদ্যোগে বিভিন্ন জেলায় 'পার্টি ফোরাম' গড়ে তোলা শুরু হয়। 'বিপ্লবী গণবাহিনী'র কর্মকাণ্ডও বিচ্ছিন্নভাবে শুরু হয় এ সময়। বিভিন্ন জেলার পার্টি ফোরাম থেকেই গণবাহিনীর উদ্ভব। মার্কিন লেখক লরেন্স লিফৎশুলজ অবশ্য দাবি করেছেন, চুয়াত্তরের জুলাই মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে গণবাহিনী প্রতিষ্ঠা করা হয়।[২৫]

গণবাহিনীর একটা সাংগঠনিক কাঠামো দাঁড় করানো হয়। রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি মো. শাজাহানকে গণবাহিনীর 'সুপ্রিম কমান্ডার' নিয়োগ করা হয়। তাঁর পদবি হয় 'রাজনৈতিক কমিসার'। সাংগঠনিক কাঠামোটি গড়ে তোলা হয় অনেকটা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন লাল ফৌজের আদলে। লে. কর্নেল (অব.) আবু তাহেরকে গণবাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার এবং জাতীয় কৃষক

লীগের সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনুকে ডেপুটি কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।[২৬] বাংলাদেশকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করে প্রতিটি অঞ্চলের জন্য একজন রাজনৈতিক কমিসার ও কমান্ডার মনোনীত করা হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের (খুলনা বিভাগ) রাজনৈতিক কমিসার হলেন শরীফ নুরুল আম্বিয়া এবং কমান্ডার হলেন কামরুজ্জামান টুকু। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের (রাজশাহী বিভাগ) রাজনৈতিক কমিসার ও কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে মনিরুল ইসলাম এবং এ বি এম শাহজাহান। মধ্যাঞ্চলের দায়িত্ব হাসানুল হক ইনুর হাতেই থাকে। অবশ্য পূর্বাঞ্চলে (সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম অঞ্চল) কাজী আরেফ আহমেদকে রাজনৈতিক কমিসার করা হলেও কাউকে কমান্ডার মনোনীত করা হয়নি। এই অঞ্চলে গণবাহিনীর সংগঠনগুলো এবং তাদের কার্যক্রম শুরু হয় দেরিতে এবং তারা ছিল তুলনামূলকভাবে দুর্বল। বিপ্লবী গণবাহিনীর একটি ১০ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমান্ড ছিল, যার মধ্যে ছিলেন কাজী আরেফ আহমেদ, মো. শাজাহান, মনিরুল ইসলাম, লে. কর্নেল এম এ তাহের, হাসানুল হক ইনু, শরীফ নুরুল আম্বিয়া, কামরুজ্জামান টুকু এবং এ বি এম শাহজাহান।

রাজনীতিতে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল। ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল ক্রমে প্রকাশ্য সংঘাতে রূপ নেয়। ফলে চুয়াত্তরের ৩ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলে টেলিভিশন কক্ষের সামনের করিডরে সাতজন ছাত্রকে হাত-পা বেঁধে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করা হয়। পুরোনো এক ঝগড়ার জের ধরে সূর্য সেন হলের বিভিন্ন কামরা থেকে তাঁদের ধরে আনা হয়েছিল। উভয় গ্রুপই ছিল সরকারি ছাত্রলীগের সদস্য। হত্যাকারীদের নেতৃত্ব দেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম প্রধান। বেশ কিছুদিন যাবৎ ছাত্রলীগ থেকে আওয়ামী লীগের কথিত দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে শুদ্ধি অভিযানের হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। ছাত্রলীগের সভাপতি মনিরুল হক চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম প্রধান এই শুদ্ধি অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তাঁদের প্রতি আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুর রাজ্জাকের আশীর্বাদ ছিল। যাঁরা নিহত হন, তাঁরা ছিলেন শেখ ফজলুল হক মনির লোক। তাঁদের কয়েকজন ছিলেন শেখ কামালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব ওই সময় চিকিৎসার জন্য মস্কোতে ছিলেন। খুনিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি করে শফিউল আলম প্রধানের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে মিছিল হয়। কয়েক দিন পর এই হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে প্রধানসহ কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বিচারে

তাঁদের ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। বছর দুয়েক পরে আবদুর রাজ্জাক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক থাকা অবস্থায় ওই হত্যাকাণ্ডে সাজাপ্রাপ্তদের অন্যতম আব্বাসউদ্দিন আফসারিকে দেখতে পেয়ে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, 'হলের ভেতরে মারতে গেলি কেন? ওদের ডেমরা-টেমরা নিয়ে ফেলে দিয়ে আসলেই তো হতো?'[২৭]

ত্রিদলীয় গণ-ঐক্যজোটেও ভাঙন ধরে। এ সম্পর্কে ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক রিপোর্টে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ব্যাখ্যায় বলা হয় :

> দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর দেশের পরিস্থিতি বিশেষত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সংকটজনক হয়ে উঠতে শুরু করে।...এ অবস্থায় আমরা গণ-ঐক্যজোটকে কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করি।...কিন্তু গণ-ঐক্যজোটকে সক্রিয় করে গণজীবনের সমস্যাগুলো সমাধানের ব্যাপারে সে সময় আওয়ামী লীগ উৎসাহিত ছিল না, বরং তারা ধীরে ধীরে আবার একলা চলার নীতিতে ফিরে যাচ্ছিল।...
>
> গণ-ঐক্যজোট কার্যত অকার্যকর হয়ে যাওয়ার ফলে '৭৪ সালের মে মাসের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সমগ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে একটি নতুন রাজনৈতিক প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করি।...ওই প্রস্তাবে গণ-ঐক্যজোটের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছিল যে, 'গণ-ঐক্যজোট যে জনগণের জীবনের আশু সমস্যাসমূহ মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, ইহার প্রধান কারণ গণ-ঐক্যজোটের মূল শরিক দল আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংকট এবং গণ-ঐক্যজোটের ক্ষমতা ও এখতিয়ারের সীমাবদ্ধতা।'[২৮]

চুয়াত্তরের জুলাই-আগস্ট মাসে ভয়াবহ বন্যা হয়। ৬ আগস্ট সর্বকালের রেকর্ড ভেঙে মেঘনা নদীর পানি বিপৎসীমার পাঁচ ফুটের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। ৮ আগস্ট এক সরকারি তথ্যবিবরণীতে বন্যায় এক হাজারের বেশি মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কা করা হয়। ১ আগস্ট চট্টগ্রাম ও সিলেটের সঙ্গে এবং ১১ আগস্ট উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে ঢাকার সড়ক ও রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[২৯] জিনিসপত্রের দাম চলে যায় সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। চালের সের ১০ টাকা হয়ে যায়। গ্রামের মানুষ না খেতে পেয়ে দলে দলে ঢাকায় এসে ভিড় করে। দেশ একটা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে।

সরকারের হিসাবমতে, দুর্ভিক্ষে ২৬ হাজার থেকে ৩৭ হাজার লোক মারা যায়। বিআইডিএস গবেষক মহিউদ্দিন আলমগীর মৃতের সংখ্যা ১৫ লাখ বলে

উল্লেখ করেছিলেন। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন অবশ্য বলেছিলেন, মৃতের সংখ্যা আরও অনেক বেশি ছিল এবং ত্রাণ তৎপরতা ছিল খুবই কম।[৩০] এ সময় কুড়িগ্রামের এক অজপাড়াগাঁয়ের মেয়ে বাসন্তীর জাল গায়ে দেওয়া ছবি *ইত্তেফাক*-এ ছাপা হলে হইচই পড়ে যায়। কেউ কেউ বলেন, ছবিটি ফরমাশ দিয়ে তোলা হয়েছে সরকারকে বিব্রত করার জন্য, শাড়ির চেয়ে জালের দাম তো বেশি ইত্যাদি। সাংবাদিক মোনাজাত উদ্দিন খোঁজখবর নেওয়ার জন্য বাসন্তীর গ্রামে যান এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত করেন যে, ছবিটা আসল। গেরস্তের ঘরে দু-একটা জাল থাকেই। ঘটনাটি তিনি তাঁর *পথ থেকে পথে* বইতে উল্লেখ করেছেন।

চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ সর্বস্তরের মানুষকে নাড়া দিয়েছিল। ১১ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবে এক বুদ্ধিজীবী সমাবেশে বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং 'মন্বন্তর প্রতিরোধ আন্দোলনের' ব্যানারে ১ নভেম্বর বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে একটি গণজমায়েত অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেওয়া হয়। ৮২ জন বুদ্ধিজীবী স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বলা হয় :

> বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দেশের বর্তমান সংকটকে 'সাময়িক' বলে অভিহিত করেছেন এবং দুর্ভিক্ষের রাজনীতিতে লিপ্ত না হবার জন্য বিরোধী দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তিতে কোনো রকম দূরদর্শিতা ও বাস্তববোধের পরিচয় আছে বলে আমরা মনে করি না।...
>
> আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে বাংলাদেশের বর্তমান মন্বন্তর মনুষ্য সৃষ্ট এবং উৎপাদন যন্ত্রের সাথে সম্পর্কবিহীন একশ্রেণির মজুতদার, চোরাচালানি ও রাজনৈতিক সমর্থনপুষ্ট ব্যবসায়ীরাই এই মারি ও মন্বন্তরের জন্য দায়ী। এক কথায় বর্তমান শাসকগোষ্ঠী এই শ্রেণিরই প্রতিনিধি এবং তাদের স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত।...গত তিন বছর ধরে মানুষ নামধারী একশ্রেণির রাজনৈতিক ক্ষমতাবান অমানুষের নির্লজ্জ শোষণ, তস্করবৃত্তি, সন্ত্রাসবাদ, চাটুকারিতা, প্রতারণা ও দুঃশাসনের যে প্রতিযোগিতা চলছে, তারই ফল বর্তমান মন্বন্তর। এক কথায় বাংলাদেশের বর্তমান দুর্ভিক্ষ ও অর্থনৈতিক সংকট গত তিন বছরের লুটেরা শাসন, শোষণ ও অর্থনৈতিক নিষ্পেষণেরই ফল।...
>
> আমরা বলতে চাই যে, শোষকশ্রেণি ও শোষণ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে অনাহার ও মৃত্যুকে পরাস্ত করা যাবে না। এ জন্য দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের প্রয়োজন এবং যে সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধভাবে।...

বিবৃতিতে স্বাক্ষরদানকারীদের মধ্যে ছিলেন সিকান্‌দার আবু জাফর, আনিসুর রহমান, আহমদ শরীফ, মির্জা গোলাম হাফিজ, কামরুন্নাহার লাইলী, মহিউদ্দিন আলমগীর, বদরুদ্দীন উমর, প্রাণেশ সমাদ্দার, গিয়াস কামাল চৌধুরী, মওদুদ আহমদ, হেলাল হাফিজ, ওয়াহিদুল হক, এনায়েতুল্লাহ খান,

"মন্বন্তর প্রতিরোধ আন্দোলন"

বিগত ১২ই অক্টোবর জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বুদ্ধিজীবীদের এক প্রাথমিক সভায় বর্তমান মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় নিম্নলিখিত বক্তব্য অনুমোদিত হয় এবং এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে আগামী পহেলা নভেম্বর বিকেল তিনটায় বায়তুল মোকাররমে ঢাকা নগরীর বিভিন্ন পেশাগত প্রতিষ্ঠান, মহিলা সংগঠন এবং সর্বশ্রেণী ও পর্যায়ের বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে এক গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এই গণসমাবেশে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করবার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার উদ্যোগের জন্য আহ্বান জানানো হবে এবং একটি আশু কর্মসূচী নির্ধারণ করা হবে। উদ্যোক্তারা ঢাকা নগরীর বিভিন্ন পেশায় কর্মরত শ্রমজীবী নাগরিকদের এই সমাবেশে অংশীদার হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

বিবৃতি

বাংলাদেশ আজ ভয়াল মন্বন্তর, সর্বগ্রাসী আকাল ও মহামারী এবং চরম জাতীয় দুর্যোগের কবলে নিপতিত। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে বাংলাদেশের বর্তমান খাদ্যাভাব ও অর্থনৈতিক সংকট অতীতের সবচাইতে বড় সংকটকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবং ১৯৪৩ সালের সর্বগ্রাসী মন্বন্তরের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

আজ বাংলাদেশের সরকার জনসাধারণের দুর্দশার প্রতি চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে বর্তমান পরিস্থিতিকে অভিহিত করেছেন 'প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা' বলে। অন্যদিকে মন্বন্তরের মোকাবিলায় দেশের বিভিন্ন সামাজিক শক্তিসমূহের উপর কোন প্রকার আস্থা প্রকাশ না করে সরকার সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছেন কতিপয় বৈদেশিক শক্তির সাহায্য ও ঋণের উপর এবং আত্মসর্বস্ব এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ, টাউট, মজুতদার ও অনুশোচনাহীন আত্মসাৎকারীদের উপর।

বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী দেশের বর্তমান সংকটকে 'সাময়িক' বলে অভিহিত করেছেন এবং

নাগরিক কমিটির 'মন্বন্তর প্রতিরোধ আন্দোলন'-এর প্রচারপত্র, অক্টোবর ১৯৭৪

আহমদ ছফা, নাজিমুদ্দিন মানিক, আবুল কাসেম ফজলুল হক, মনসুর মুসা, ফয়েজ আহমদ, বিনোদ দাশগুপ্ত, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, স্বপন আদনান, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আফতাবউদ্দিন আহমদ, আনোয়ার জাহিদ, জেরিনা খাতুন, আনিছা করিম, গাজীউল হক, সৈয়দা আছিয়া খাতুন, রেখা আহমেদ, মো. আসাদুজ্জামান প্রমুখ।[৩১]

'এই কি সোনার বাংলা—শেখ মুজিব জবাব দাও' শিরোনামে জাসদের এক প্রচারপত্রে 'বাংলাদেশে আজ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ' বলে উল্লেখ করা হয়। প্রচারপত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল :

> গত ২৫ মাসে গুম ও খুন হয়েছে প্রায় ৩০ হাজার। রক্ষীবাহিনী ও পুলিশের হামলা হয়েছে প্রায় ২৪ হাজার পরিবারে। জেলে রাজবন্দী আছে ১৮ হাজারের ওপর। হুলিয়া আছে প্রায় ২৫ হাজার নেতা ও কর্মীর নামে। বাড়ি পুড়েছে প্রায় আড়াই হাজার। নারী ধর্ষণ অসংখ্য।
>
> প্রগতিশীল নেতা ও কর্মীদের গুম ও খুন করার জন্য এক ঢাকা শহরেই নামানো হয়েছে প্রায় দেড় শ স্কোয়াড। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো আজ খুনের আড্ডা।

> ১৯৭৩-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যত ভোট পেয়েছে, তার শতকরা ৫২ ভাগ জাল, আর প্রায় ২০ ভাগ মানুষের দারিদ্র্যের সুযোগে লোভ-লালসার মাধ্যমে ঠকিয়ে নেওয়া। উপনির্বাচন এবং স্কুল-কলেজের নির্বাচনও বস্তুত ব্যালট বাক্স ছিনতাই ও বুলেট ব্যবহারের নির্বাচন।
>
> সভা, জমায়েত, মিছিল, ধর্মঘট ইত্যাদি জনগণের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মৌলিক অধিকার। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব ফরমান জারি করে সেগুলোও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, যাতে জনগণ কুকুরের মতো মরতে থাকলেও আর প্রতিবাদ করতে না পারে। যত্রতত্র জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা; হয়রানি চলছে নিরীহ মানুষদের। এটাই মুজিববাদী গণতন্ত্রের স্বরূপ।[৩২]

জাসদের জাতীয় কমিটি চুয়াত্তরের ৮ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত এক বর্ধিত সভায় সর্বদলীয় জাতীয় সরকার গঠনের আহ্বান জানায়। জাতীয় সরকার যে দলগুলোর সমন্বয়ে গঠন করতে হবে বলে দাবি করা হয়, সেই দলগুলো হলো : ন্যাপ (ভাসানী), ন্যাপ (সুধারামী), বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, বাংলা জাতীয় লীগ, জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন, লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় গণতন্ত্রী দল, লেবার পার্টি এবং আবদুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, মোহাম্মদ আলাউদ্দিন ও আবদুল মতিনের নেতৃত্বাধীন সব সংগঠন। জাসদের প্রস্তাবিত জাতীয় সরকারে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফ্‌ফর) এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির স্থান ছিল না। কীভাবে এই 'সর্বদলীয় জাতীয় সরকার' গঠন করা হবে, তার কোনো নির্দেশনা ছিল না প্রস্তাবে। বলা হয়েছিল, 'ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমেই' এই দাবি বাস্তবায়ন করতে হবে।[৩৩] দাবিটি ছিল নিতান্তই অবাস্তব। কেননা, যে দলগুলোর সমন্বয়ে সর্বদলীয় সরকার গঠনের কথা বলা হয়, তাদের মধ্যে অনেকগুলো দল জাসদকে শত্রু মনে করত এবং জাসদের সঙ্গে কোনো রকমের জোট বাঁধার আগ্রহ তাদের ছিল না। জাসদের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল মুখ্যত অন্য দলগুলোর কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরা।

চুয়াত্তরের ২৭, ২৮ ও ২৯ অক্টোবর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ একটি রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। রিপোর্টটি কেন্দ্রীয় কমিটি অনুমোদন করে। রিপোর্টে বলা হয় :

> দেশে গভীর সংকট বিরাজ করিতেছে। সরকার কেবল শাসকদল আওয়ামী লীগ ও প্রশাসনযন্ত্রের উপর নির্ভরশীল, বাকিরা বর্তমানে প্রচলিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মাধ্যমে সংকট মোকাবিলা করিয়া দেশকে অগ্রগতির পথে অগ্রসর করিয়া নিতে পারিতেছে না। তাই অনতিবিলম্বে দেশে রাজনৈতিক-

> প্রশাসনিক ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা একান্ত জরুরি বলিয়া বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি মনে করিতেছে।[৩৪]

চুয়াত্তরের ২ নভেম্বর এক বিবৃতিতে জাসদের কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ সর্বদলীয় ঐক্যের পক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'আগামী ৮ নভেম্বরের মধ্যে ঐক্যের কথা ঘোষণা করা হবে। যদি সকলে মতৈক্যে পৌঁছতে না পারেন, তবে জাসদ এককভাবেই পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবে।' নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারের পরিবর্তন আনতে তাঁদের আপত্তি কেন, এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমরা যেহেতু সংগ্রামে বিশ্বাস করি, তাই আমরা নির্বাচনের কথা বলি না। জাতীয় সরকার গঠিত হলে নির্বাচনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।'[৩৫]

চুয়াত্তরের ৩ নভেম্বর পল্টন ময়দানে ভাসানী-ন্যাপের এক জনসভায় 'জাতীয় সরকার' গঠনের দাবি জানানো হয়।[৩৬] ১৭ নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি 'অবিলম্বে বর্তমান সরকারের পরিবর্তে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দুর্নীতিমুক্ত একটি নতুন শক্তিশালী, দৃঢ়চিত্ত ও দক্ষ দেশপ্রেমিক সরকার গঠন করতে হবে' বলে দাবি জানায়।[৩৭]

২২ নভেম্বর খাদ্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে খাদ্যমন্ত্রী আবদুল মমিন জাতীয় সংসদে একটি বিবৃতি দেন। খাদ্যঘাটতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> মাননীয় স্পিকার সাহেব, কথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, দেশে বন্যার দরুন যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ খাদ্যের অভাবে যখন কষ্ট পাচ্ছিল, সেই সময় সেই ঘাটতি পূরণের জন্য যে খাদ্যের দরকার ছিল, তখন আমাদের হাতে সেই পরিমাণ খাদ্য মজুত ছিল না। স্বাভাবিক অবস্থা মোকাবিলার জন্য আমাদের হাতে যদিও যথেষ্ট খাদ্য মজুত ছিল, কিন্তু ভয়াবহ অবস্থা মোকাবিলার জন্য আমাদের যথেষ্ট খাদ্য মজুত ছিল না।

খাদ্যমন্ত্রীর বিবৃতির পর জাসদের সাংসদ আবদুল্লাহ সরকার 'অনাহার ও ব্যাধির কারণে যারা মারা গিয়েছে, তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে সংসদে পাঁচ মিনিট নীরবতা পালনের' প্রস্তাব করেন। জাসদের অপর সাংসদ ময়নুদ্দিন আহমেদও প্রস্তাবটির পক্ষে কথা বলেন। আওয়ামী লীগের সাংসদ ও শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং সাংসদ ডা. আসহাবুল হক প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। স্পিকার সিদ্ধান্ত দেন, 'অনেস্ট উইশেস অব দ্য হাউস হিসেবে প্রসিডিংস-এ প্রস্তাবটি এভাবে উল্লেখ করা হবে: দুর্ভিক্ষজনিত কারণে, অনাহারে অথবা বন্যায় অথবা ব্যাধিজনিত কারণে বাংলাদেশে যেসব মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তাদের প্রতি এই সংসদ সহানুভূতি প্রকাশ করছে।'[৩৮]

জাসদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সর্বদলীয় ঐক্যজোট হয়নি। জাসদ নিজের পথ নিজেই ঠিক করে নেয়। চুয়াত্তরের ২৬ নভেম্বর হরতাল আহ্বান করা হয়। হরতালের প্রস্তুতি চলতে থাকে।

তথ্যনির্দেশ

১. বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (১৯৭৩), বার্ষিক কার্যবিবরণী ১৯৭২-৭৩, ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি ঢাকা, পৃ. ৪-১০।
২. হাবিবুল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপচারিতা।
৩. মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর সঙ্গে আলাপচারিতা।
৪. Ahmed, p. 308.
৫. মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর সঙ্গে আলাপচারিতা।
৬. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (১৯৮০), ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারিতে তৃতীয় কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক রিপোর্ট, ঢাকা, জুন ১৯৮০, পৃ. ৫-৬।
৭. মোশাররফ, খালেদ (২০১৩), *মুক্তিযুদ্ধে ২ নং সেক্টর এবং কে ফোর্স*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ২১৮।
৮. খসড়া থিসিস-পরিমার্জিত (১৯৭৬), ঢাকা, পৃ. ৩৭।
৯. ওই, পৃ. ১৬-৪৬।
১০. রহমান (২০০৪), পৃ. ২২১।
১১. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ২৩ মে ১৯৭৪।
১২. জাতীয় কৃষক লীগ (১৯৭৪), 'সমাজতান্ত্রিক কৃষিবিপ্লবের কর্মসূচি', ঢাকা, পৃ. ২৩।
১৩. আখলাকুর রহমান (১৯৭৪), *বাংলাদেশের কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ*, ঢাকা।
১৪. কেন্দ্রীয় ফোরাম (১৯৭৪), 'গণ-আন্দোলনকে কীভাবে বিপ্লবী আন্দোলনে উন্নীত করা হবে', জুন ১৯৭৪, পৃ. ৩।
১৫. *সাম্যবাদ*-২, পৃ. ১-৩।
১৬. Lenin, V.I. (1964). *Collected Works*, Volume 26. Moscow, p. 25.
১৭. Lenin V.I. (1965). *Collected Works*, Volume 8. Moscow, p. 565.
১৮. *সাম্যবাদ*-২, পৃ. ৫।
১৯. ওই।
২০. ওই, পৃ. ৯।
২১. *গণকণ্ঠ*-এ প্রকাশিত দৈনন্দিন প্রতিবেদন।
২২. আহমদ, পৃ. ১৮৭।
২৩. শ্যামলের পারিবারিক সূত্রে পাওয়া তথ্য।

২৪. আকন্দ, মো. আবদুল গনি (২০১৪), *স্মৃতি সতত বিরাজে*, পড়ুয়া, ঢাকা, পৃ. ২০৩-২০৪।

২৫. Lifschultz, Lawrence (1979). *Bangladesh: The Unfinished Revolution*, Zed Press, London, p. 43.

২৬. খায়ের এজাজ মাসুদের সঙ্গে আলাপচারিতা।

২৭. আব্বাসউদ্দিন আফসারির সঙ্গে আলাপচারিতা। আফসারি ছিলেন হত্যাকাণ্ডে জড়িত অভিযুক্তদের অন্যতম। জেলখানায় তাঁদের মধ্যে কথাবার্তার সময় আকা ফজলুল হক সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

২৮. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (১৯৮০), তৃতীয় কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক রিপোর্ট, জুন ১৯৮০, পৃ. ৭-১৩।

২৯. মিয়া, পৃ. ১৮৫-১৮৬।

৩০. Sen, Amartya (1981), *Poverty and Famine: Eassay on Entitlements and Deprivation*, Clarendon Press, Oxford, p. 134.

৩১. 'মন্বন্তর প্রতিরোধ আন্দোলন' শিরোনামে ৮২ জন বুদ্ধিজীবীর স্বাক্ষরিত বিবৃতি, ঢাকা, অক্টোবর ১৯৭৪।

৩২. রহমান (২০০৪), পৃ. ৩১২-৩১৩।

৩৩. *গণকণ্ঠ*, ১৫ অক্টোবর ১৯৭৪।

৩৪. *একতা*, ১ নভেম্বর ১৯৭৪।

৩৫. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ৩ নভেম্বর ১৯৭৪।

৩৬. *দৈনিক বাংলা*, ৪ নভেম্বর ১৯৭৪।

৩৭. *একতা*, ২২ নভেম্বর ১৯৭৪।

৩৮. রহমান (২০০৪), পৃ. ২৯৯-৩০৯।

বিদ্রোহ

বিপ্লবী গণবাহিনীর তাত্ত্বিক ধারণা ও কেন্দ্রে একটা সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে উঠলেও আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে এর কোনো সদস্য সংগ্রহের কার্যক্রম তখনো শুরু হয়নি। দিনক্ষণ ঠিক করেও এর কোনো পরিকল্পনা ও কার্যক্রম নেওয়া হয়নি। গণবাহিনী ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে। কেউ কাউকে বলে দেয়নি, 'তুমি গণবাহিনীর সদস্য।' ব্যাপারটা হয়ে উঠেছে। প্রথাগত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সংগ্রামের বাইরে গিয়ে অন্য কোনোভাবে কিছু কার্যক্রম নেওয়াটাকেই দেখা হতো 'বিপ্লবী' কর্মকাণ্ড হিসেবে। আর যাদের বিরুদ্ধে এসব কার্যক্রম পরিচালিত হতো, তাদের দৃষ্টিতে গণবাহিনী ছিল 'অগণতান্ত্রিক' ও 'বেআইনি'।

নিখিল রঞ্জন সাহা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্নাতক। মেধাবী এই তরুণ সবেমাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যন্ত্রকৌশল বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগ দিয়েছেন। উনসত্তর সাল থেকেই তিনি ছাত্রলীগের সিরাজপন্থীদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। চুয়াত্তরের ২৬ নভেম্বরের হরতালের প্রস্তুতি উপলক্ষে ঢাকা শহরে একটা শক্তির মহড়া দেওয়ার পরিকল্পনা হয়। নিখিল দায়িত্ব নেন বোমা বানানোর।

নিখিল এর আগেও বোমা তৈরি করেছেন, পদ্ধতিটি ছিল খুবই স্থূল। পাতলা এক টুকরা মার্কিন কাপড় চিনি দিয়ে ভিজিয়ে এবং পরে শুকিয়ে মাড় দেওয়া কাপড়ের মতো শক্ত করা হতো। এর ভেতরে ধাতব স্প্লিন্টার ঢুকিয়ে দেওয়া হতো। এর সঙ্গে মেশানো হতো পটাশিয়াম ক্লোরেট। পরে জিনিসটা একটা জ্যাকেটের মধ্যে পুরে দেওয়া হতো। জ্যাকেটের মধ্যে কয়েকটা

ফোকর রাখা হতো। প্রতিটি ফোকরে অ্যাম্পুলের ভেতরে থাকত সালফিউরিক অ্যাসিড। এটা ডেটোনেটরের কাজ করত। টাইম বোমা বানানোর জন্য কনডম ব্যবহার করা হতো। অ্যাম্পুলগুলো কনডমের ভেতরে রাখা হতো। পরীক্ষা করে দেখা গেল, অ্যাম্পুল ফেটে গেলে অ্যাসিড একটা কনডম থেকে বেরিয়ে আসতে প্রায় দুই মিনিট সময় নেয়। যদি পরিকল্পনা থাকত বোমাটা চার মিনিট পরে ফাটানো হবে, তাহলে দুটো কনডম ব্যবহার করা হতো। জ্যাকেটের মুখে একটা সলতে দেওয়া হতো। সলতের মধ্যে আগুন দিয়ে জ্যাকেটবন্দী বোমাটি ছুড়ে ফেলে দিলে বিস্ফোরণ হতো। কনডম না থাকলে বিস্ফোরণ হতো তাৎক্ষণিক।

চুয়াত্তরের ২৪ নভেম্বর রাতে যাত্রাবাড়ীতে গফুর মেম্বারের বাড়িতে নিখিল তাঁর দুই সহযোগী গোলাম মোরশেদ নয়ন ও কাইয়ুমকে নিয়ে বোমা বানানো শুরু করেন। বেশ কয়েকটি বোমা বানানো হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটে। একটি বোমা ভুলক্রমে বিস্ফোরিত হয়ে যায়। তারপর আরও কয়েকটি। কাইয়ুম ঘটনাস্থলেই মারা যান। নিখিল আহত হন। তাঁর শরীরের বেশ কিছু অংশ ঝলসে যায়। নয়ন নিখিলকে কাঁধে নিয়ে প্রথমে পোস্তগোলা যান। সেখান থেকে একটা অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করে নিখিলকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। ২৫ তারিখ ঢাকা নগর গণবাহিনীর সদস্য বাদল খান হাসপাতালে নিখিলকে দেখতে যান। নিখিল তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'আমার ডায়েরিটা সম্ভবত পুলিশের হাতে পড়েছে। রাতে বাড়িতে থেকো না।' ২৬ নভেম্বর হাসপাতালে নিখিলের মৃত্যু হয়। দলের মধ্যে কেউ কেউ সন্দেহ করেন, নিখিল বেঁচে থাকলে অনেক গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে। তাই তাঁকে হাসপাতালেই মেরে ফেলা হয়। নিখিলের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর থানার বিটঘর গ্রামে। পরিবারটি ছিল হতদরিদ্র। নিখিলের বাবা ছিলেন খেতমজুর। নিখিলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবারটির স্বপ্নের মৃত্যু হলো।

কাইয়ুম পলাশী কলোনিতে থাকতেন। রেডিওতে খবর শুনে তাঁর মা গফুর মেম্বারের বাড়ির কাছে যান। সেখানে তখন আরও মানুষ ভিড় করেছিল। কাইয়ুমের বাবা ছিলেন সরকারি কর্মচারী। তাঁরা সরকারি কোয়ার্টারে থাকতেন। চাকরি এবং সরকারি বাসা নিয়ে ঝামেলা হতে পারে বলে কাইয়ুমের মা সন্তানের পরিচয় পর্যন্ত দেননি, তাঁর লাশ নিয়ে আসার সাহস পাননি। বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে কাইয়ুমকে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে দাফন করা হয়।[১]

ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলায়, বিশেষ করে ছোট শহরগুলোতে জাসদের কর্মীদের প্রায় সবাইকে তখন পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী খুঁজছে। পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তবু রক্ষা, তাঁদের থানাহাজতে কিংবা জেলখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু রক্ষীবাহিনীর হাতে ধরা পড়লে জীবিত ফিরে আসার সম্ভাবনা ছিল কম। কতজনকে যে তারা গুলি করে বা পিটিয়ে মেরেছে, তার কোনো হিসাব নেই। 'এনকাউন্টার' শব্দটা তখনই চালু হয়। 'বেআইনি অস্ত্র নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময়' কিংবা 'আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে' 'কতিপয় দুষ্কৃতকারী নিহত হয়েছে', রক্ষীবাহিনীর এই বয়ান ছিল গৎবাঁধা।

চুয়াত্তরের নভেম্বরের শেষে কুষ্টিয়ায় একটা ঘটনা ঘটে। এটা ছিল রীতিমতো একটা যুদ্ধ। রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারে জাসদের কর্মীরা কেউ বাড়িতে থাকতে পারতেন না। স্থানীয় সংসদ সদস্যরা সব সময় তাঁদের পেছনে রক্ষীবাহিনী লেলিয়ে দিতেন বলে অভিযোগ ছিল। এ ব্যাপারে একটা হেস্তনেস্ত করার জন্য জাসদের কর্মীরা অধৈর্য হয়ে পড়েন। তাঁদের মূল অভিযোগ ছিল স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা আব্বাস উকিল, শামসুল হুদা দুদু, আহসান, আফাজ ও কোব্বাতের বিরুদ্ধে। তাঁদের প্ররোচনায় রক্ষীবাহিনী জাসদের কর্মীদের হয়রানি করত বলে ধারণা করা হয়। জাসদের কর্মীরা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল প্রস্তাব করে, আওয়ামী লীগের সব সংসদ সদস্যকে মেরে ফেলা ছাড়া উপায় নেই। আরেক দলের প্রস্তাব হলো, রক্ষীবাহিনীর ওপর হামলা করে তাদের শিক্ষা দেওয়া দরকার।

স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাদের মধ্যে তাঁদের প্রধানতম শত্রু ছিলেন কুষ্টিয়া জেলার খোকসা-কুমারখালী অঞ্চলের সংসদ সদস্য গোলাম কিবরিয়া। তাঁর বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের জমি দখল এবং নানা ধরনের অনাচারের অভিযোগ ছিল। কুষ্টিয়া জেলা মুজিব বাহিনীর অন্যতম কমান্ডার এবং গণবাহিনীর নেতা মারফত আলীর প্রস্তাব অনুযায়ী গোলাম কিবরিয়াকে 'মৃত্যুদণ্ড' দেওয়া হয়। এই প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য ঢাকায় জাসদের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান নেতা নূরে আলম জিকুর কাছে পাঠানো হয়। নূরে আলম জিকুর সঙ্গে জাসদের কর্মী শাহাবুব আলম চিরকুট আদান-প্রদান করেন। ঢাকায় গণবাহিনীর হাইকমান্ডের সঙ্গে আলাপ করে জিকুকে 'হ্যাঁ' অথবা 'না'—এই সিদ্ধান্ত দিতে বলা হয়। সিদ্ধান্ত আসে 'হ্যাঁ'।

একদিন রাতে গণবাহিনীর ৭৩ জন সদস্য কুষ্টিয়ার মিরপুর থানার ছাতারপাড়া গ্রামে মরা নদীর পারে সমবেত হন। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রক্ষীবাহিনীর

ওপর কীভাবে আক্রমণ করা হবে, তার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করাই ছিল এ সমাবেশের উদ্দেশ্য। হঠাৎ তাঁরা বুঝতে পারেন, রক্ষীবাহিনী তাঁদের ঘেরাও করে ফেলেছে। শুরু হয় 'যুদ্ধ'। গোলাগুলি চলে আড়াই ঘণ্টা। গণবাহিনীর মূল নেতা শামসুল হাদীসহ সাতজন নিহত হন। নিহত অন্য ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন মুসা, উম্মত, খলিল, জিলানী, কুদ্দুস ও ছোট মন্টু। তাঁরা সবাই ছিলেন একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা। আহত হন ছয়জন। রক্ষীবাহিনীর ১৭ জন নিহত হন। গোলাগুলিতে তিনজন নিরীহ কৃষক মারা যান। তাঁরা মাথায় করে পাট নিয়ে যাচ্ছিলেন।

গণবাহিনী গোলাম কিবরিয়ার 'মৃত্যুদণ্ড' কার্যকর করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। তাদের পরিকল্পনা ছিল, দিনের বেলায় প্রকাশ্যে তাঁকে হত্যা করা হবে। অবশেষে চুয়াত্তরের ২৫ ডিসেম্বর সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। সেদিন ছিল কোরবানির ঈদ।

এই অপারেশনে গণবাহিনীর মোট ৪৩ জন অংশ নেন। এর আগে কুমারখালী ও খোকসা থানার পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করার পরিকল্পনা করা হয়। হান্নান, আলাউদ্দিন, অধীর, মজনু ও গনি কুমারখালী থানায় গিয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বলেন, 'সারেন্ডার করবেন, না আমরা থানা দখল করব?' ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বললেন, 'আমাদের জানে মারবেন না। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে কিছু বলব না। প্রয়োজনে একটি-দুটি ফাঁকা আওয়াজ করব।' কুমারখালী থানার ওসি নজরুল ইসলাম এভাবেই পুলিশের ২২ জন সদস্যসহ আত্মসমর্পণ করেন। একই পদ্ধতি নেওয়া হলো খোকসা থানার ক্ষেত্রেও। সেখানে আবুল দারোগাসহ ১৮ জন পুলিশ সদস্য আত্মসমর্পণ করেন।

কুমারখালী থানার সামনে ঈদগাহ। থানার নিয়ন্ত্রণ নেওয়া হয় রাত একটায়। ২৫ ডিসেম্বর বুধবার সকালে ঈদের জামাত। লোকে লোকারণ্য, হাজার দশেক মানুষ। জামাত শুরু হবে, সবাই দাঁড়িয়ে গেছেন। সবার সামনে দিয়ে কয়েকজন হেঁটে গেলেন। তাঁদের পরনে শার্ট-লুঙ্গি, গায়ে চাদর। সামনের কাতারে দাঁড়ানো গোলাম কিবরিয়ার বুকে অস্ত্র ঠেকিয়ে একজন গুলি করলেন। ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন। তাঁর দেহরক্ষী আজম খান ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। মানুষ যে যেদিকে পারে ছুটে পালায়। ঈদের জামাত আর হয়নি।

পুরো অপারেশনটি কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ হয়। দলটি গড়াই নদ পার হয়ে সোনাদিয়া বাজারে চলে যায়। সেখান থেকে একেকজন একেক জায়গায়।

গোলাম কিবরিয়া শেখ মুজিবের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। শেখ মুজিব তাঁকে 'মিয়াভাই' বলে সম্বোধন করতেন। এই ঘটনায় তিনি খুবই মর্মাহত হন। পরে পুলিশ-রক্ষীবাহিনী এক হাজারের বেশি লোককে গ্রেপ্তার করে। ২৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়। কালু নামের একজনকে রাজসাক্ষী করা হয়।

পরে বিভিন্ন 'এনকাউন্টারে' গণবাহিনীর আনসার, জিলানী ও কুদ্দুস নিহত হন। হামলা এড়াতে শাহাবুব আলম একবার ২৪ ঘণ্টা পানিতে ডুবে ছিলেন।[২]

২৫ ডিসেম্বরের ঘটনার প্রতিক্রিয়া ছিল সুদূরপ্রসারী। তিন দিন পর, ২৮ ডিসেম্বর, দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক তথ্যবিবরণীতে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পটভূমি বর্ণনা করে বলা হয়,

> ...রাষ্ট্রবিরোধী মহলের তৎপরতার ক্রমবর্ধমান প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি ঘটিয়াছে এবং জনগণের অর্থনৈতিক দুর্দশা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সকল শক্তি হত্যাকাণ্ড চালাইয়া যাইতেছে।...তাহারা বহুসংখ্যক দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতাকে গুপ্ত কায়দায় হত্যা করিয়াছে।...পাঁচজন নির্বাচিত সংসদ সদস্য রাষ্ট্রবিরোধী মহলগুলোর বর্বর হত্যাকাণ্ডের শিকারে পরিণত হইয়াছেন। রাষ্ট্রবিরোধী মহলগুলি এমনকি উপাসনালয়ের প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে নাই এবং গত ২৫ ডিসেম্বর দুইটি পৃথক পৃথক ঈদের জামাতে নামাজ আদায় করার সময় কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত অন্যতম সংসদ সদস্য জনাব গোলাম কিবরিয়া এবং ইউনিয়ন পরিষদের জনৈক চেয়ারম্যানকে তাহারা নৃশংসভাবে হত্যা করে।...
>
> বিগত তিন বৎসর যাবৎ সংবিধান দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশের নিশ্চয়তা দিয়াছে। সরকারও তাহা দৃঢ়ভাবে সমুন্নত রাখিয়াছে। কিন্তু সমাজবিরোধী মহলগুলি সংবিধানের দ্বারা নিশ্চিতকৃত সকল মৌলিক অধিকার সংগঠিত উপায়ে ক্রমাগতভাবে অপব্যবহার করিয়া আসিতেছে এবং বারংবার হত্যাকাণ্ড, হিংসাত্মক, নাশকতামূলক ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হইয়া সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধি করিয়াছে। জনগণের ইচ্ছার বলে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাদের নিরাপত্তা বিধান ও কল্যাণসাধনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো সরকারই এইরূপ কোনো পরিস্থিতিতে নীরব দর্শক হইয়া থাকিতে পারে না। আর এই পরিস্থিতিতে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা ছাড়া সরকারের হাতে আর কোনো বিকল্প নাই।[৩]

শেখ মুজিব বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। কিন্তু চুয়াত্তরের মাঝামাঝি তাঁর জনপ্রিয়তা অনেক কমে গিয়েছিল। চাটুকার-পরিবেষ্টিত থাকার কারণে তিনি তা বুঝতে অক্ষম ছিলেন। আওয়ামী লীগ ও তার মিত্র রাজনৈতিক দলগুলো সব সময় ষড়যন্ত্র-তত্ত্বের সন্ধান

করত। শেখ মুজিব নিজেও মনে করতেন, তাঁর বিরুদ্ধে 'বিদেশি শত্রু ও তাদের এজেন্টরা' চক্রান্ত করছে। পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির 'সন্ত্রাসী' তৎপরতায় তিনি খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন।

একাত্তরের জুন মাসে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের নাম পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি রাখা হয়। বাহাত্তর সাল থেকেই এই দলটি আওয়ামী লীগ সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই সহিংসতার আশ্রয় নেয়। পুলিশ ফাঁড়ি ও থানায় আক্রমণ, ব্যাংক লুট ইত্যাদি হয়ে পড়ে প্রায় নিয়মিত ব্যাপার। আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মী তাদের হাতে নিহত হন।

আওয়ামী লীগের এই আক্রান্ত ব্যক্তিরা অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয়ভাবে দুর্বৃত্তায়ন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ এবং বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর নির্যাতন ও হত্যার অভিযোগ ছিল। আইনগতভাবে এসব নির্যাতনের প্রতিকার পাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব ছিল না। শেখ মুজিব এই পরিস্থিতির যথাযথ মূল্যায়ন করেছিলেন বলে মনে হয় না। সর্বহারা পার্টির দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের লড়াই ছিল 'শ্বেত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লাল সন্ত্রাস' ছড়িয়ে দেওয়া। জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে আইন করে সুরক্ষা দেওয়ার ফলে তাদের হাতে বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের নিগ্রহ অনেক বেড়ে যায়। তাদের হাতে সর্বহারা পার্টির অনেক কর্মী ও সমর্থক নিহত হন। সর্বহারা পার্টির কর্মীদের হাতে রক্ষীবাহিনী ও আওয়ামী লীগের অনেক সদস্যও নিহত হন বলে সরকার ও রক্ষীবাহিনীর দাবি ছিল। জাসদ ও গণবাহিনী গঠিত হওয়ার পর জাসদের সদস্যরাও রক্ষীবাহিনীর টার্গেট হন। তত দিনে জাসদের ভেতরে সর্বহারা পার্টির অনেকেই অনুপ্রবেশ করতে সমর্থ হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন লে. কর্নেল (অব.) আবু তাহের এবং তাঁর ছোট ভাই আবু সাঈদ ও আনোয়ার হোসেন।

ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন গ্রুপ) মধ্য থেকে সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে ১৯৬৭ সালে গঠিত হয় 'মাও সে-তুং রিসার্চ সেন্টার'। ১৯৬৮ সালের মার্চ-এপ্রিলে সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে ১১ জনের একটি দল টেকনাফে যায়। দলের একজন—রাব্বী—টেকনাফ থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন। সিরাজ শিকদার, রওশন আরা (শিকদারের স্ত্রী) এবং মুজিবুর রহমান টেকনাফে দলের গিলাতলি ক্যাম্পে অপেক্ষায় থাকেন। বাকি সাতজন নাফ নদী পেরিয়ে বার্মায় (বর্তমানে মিয়ানমার) যান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আনোয়ার হোসেন, আবু ইউসুফ, আকা ফজলুল হক, সামিউল্লাহ আজমি, রাজিউল্লাহ আজমি, আমান, মতিউর রহমান ও এনায়েত হোসেন। উদ্দেশ্য ছিল বার্মার কমিউনিস্ট

পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করা। বার্মায় তখন কমিউনিস্ট পার্টিতে দুটো উপদল। একটা 'রেড ফ্ল্যাগ' নামে পরিচিত। এরা ট্রটস্কিপন্থী। অন্যটি ছিল পিকিংপন্থী 'হোয়াইট ফ্ল্যাগ'। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পিকিংপন্থী উপদলটির সঙ্গে যোগাযোগ করা। আরাকানে তখন মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে স্বাধীনতাকামী একটি গ্রুপ সংগঠিত হচ্ছিল। এদের সঙ্গে হোয়াইট ফ্ল্যাগ গ্রুপের সম্পর্ক ছিল। এ সময় এই দুই গ্রুপের মধ্যে গোলমাল শুরু হয়ে গেলে সিরাজ শিকদারের পাঠানো দলটি ফিরে আসে। ইতিমধ্যে রওশন আরা গিলাতলি ক্যাম্পে একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। মেয়েটির নাম রাখা হয় 'শিখা'। এই গ্রুপ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম নিয়েছিল পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন এবং পরবর্তী সময়ে পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি।[৪]

আনোয়ার হোসেন তাঁর একটি লেখায় উল্লেখ করেছেন, দলে তাঁরা ১৫ জন ছিলেন এবং সময়টা ছিল ১৯৬৭ সাল। পরে আনোয়ার হোসেনের উদ্যোগে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের পাশে সরকারি সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে কর্মরত ড. হুমায়ুন আবদুল হাইয়ের বাসায় সিরাজ শিকদারের সঙ্গে আনোয়ারের বড় ভাই মেজর আবু তাহেরের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৯ সালে ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনের সময় তাহের ছুটি নিয়ে ঢাকার কলাবাগানে আনোয়ারের অপর বড় ভাই আবু ইউসুফের বাসায় সিরাজ শিকদারের অনুগত স্বাধীনতা-প্রত্যাশী যুবকদের রাজনৈতিক-সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেন। এক মাস পার না হতেই সিরাজ শিকদার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বন্ধ করে দেন।[৫] তাহের আবু সাঈদকে আবার আরাকানে পাঠান একটা 'বেইজ' তৈরির সম্ভাবনা যাচাই করে দেখতে। সাঈদ সেখানে মাস তিনেক ঘোরাঘুরি করেন। পরে তিনি নকশালবাড়ি যাওয়ার জন্য ১৯৬৯ সালে কলকাতায় যান। কিন্তু কোনো নির্ভরযোগ্য সঙ্গী না পেয়ে দেশে ফিরে আসার পথে তিনি ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন ও তিন মাস আলীপুর জেলে বন্দী থাকেন।[৬]

মেজর জলিলের সঙ্গে সিরাজ শিকদারের যোগাযোগ হয় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়। জলিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত থাকা অবস্থায় ছুটি কাটাতে বাড়ি আসেন। ওই সময় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তিনি বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করে প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। তাঁর সঙ্গে যাঁরা প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই ছিলেন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত। জলিলের প্রতিরোধ একপর্যায়ে ভেঙে পড়লে তিনি তাঁর অস্ত্রের ভাণ্ডার শ্রমিক আন্দোলনের সহযোদ্ধাদের কাছে রেখে

সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে সীমান্তের দিকে চলে যান। ওই সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের নেতা সিরাজ শিকদার বেশ কিছুদিন প্রতিরোধ চালিয়ে যান। তাঁর সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন আকা ফজলুল হক, হুমায়ুন কবির, গৌরাঙ্গলাল আইচ, এনায়েত, মাহবুব প্রমুখ। গৌরাঙ্গলাল আইচ সংক্ষেপে জি এল আইচ নামে পরিচয় দিতেন এবং অবশেষে জুয়েল আইচ নামেই পরিচিতি পান। দলে তিনি কমরেড জাহিদ নামে পরিচিত ছিলেন। একাত্তরের ৩ জুন পিরোজপুরের পেয়ারাবাগানে এক গোপন সভায় পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের নাম পালটে পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি রাখা হয়। জলিলের দেওয়া অস্ত্রগুলো ছিল তাঁদের প্রধান সম্বল। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের মুখে তাঁরা বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়েন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও আবু তাহের, আবু সাঈদ ও আনোয়ার হোসেন সর্বহারা পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আনোয়ারকে দলের মধ্যে 'বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ' হিসেবে গণ্য করা হতো। তাহেরের সহকর্মী লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিনও সর্বহারা পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। বাহাত্তরের ২০ আগস্ট সাপ্তাহিক *হলিডে* পত্রিকার প্রথম পাতায় 'হিডেন প্রাইড অব ফ্রিডম ফাইটার্স' শিরোনামে জিয়াউদ্দিনের একটি লেখা ছাপা হয়। লেখায় 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে বেইমানি' করার জন্য সরকারকে অভিযুক্ত করা হয়। এই লেখার জন্য সরকারের তরফ থেকে তাঁকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে বলা হয়। জিয়াউদ্দিন রাজি হননি। জিয়াউদ্দিনকে সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলে তিনি সরাসরি সর্বহারা পার্টির কাজে পার্বত্য চট্টগ্রামে চলে যান। আবু তাহের সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি নিয়ে কিছুদিন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল কর্তৃপক্ষের সি-ট্রাক ইউনিটে কাজ করেন এবং পরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ড্রেজার অধিদপ্তরের পরিচালক পদে নিয়োগ পান। এই দপ্তরের অফিস ছিল নারায়ণগঞ্জে। আবু তাহের নারায়ণগঞ্জেই সরকারি বাসায় থাকতেন এবং জাসদের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। একই সঙ্গে তিনি সর্বহারা পার্টির সঙ্গেও সংযুক্ত থাকেন। আবু তাহেরের সঙ্গে সর্বহারা পার্টির যোগাযোগের দায়িত্ব ছিল গোলাম মহিউদ্দিন বাহারের। মহিউদ্দিন বাহার সর্বহারা পার্টিতে জামিল নামে পরিচিত ছিলেন।'[৭]

তাহের এবং লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিন দুজনই মনে করতেন, বাংলাদেশ ভারতের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ১৯৭২ সালের মার্চে সর্বহারা পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত একটি দলিলে বাংলাদেশকে ভারতের উপনিবেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। বলা হয় :

> পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়াশীল আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী ও সামন্তবাদীরা নিজেদের শক্তির ওপর নির্ভর করে পূর্ব বাংলা মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়ে ক্ষমতার লোভে সাড়ে সাত কোটি জনগণের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, বাংলাকে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের নিকট বিক্রি করে দেয়, পাকিস্তানি সামরিক ফ্যাসিস্টদের উৎখাতের জন্য তাদের ডেকে আনে।...এভাবে পূর্ব বাংলা ভারতের উপনিবেশে রূপান্তরিত হয় এবং পূর্ব বাংলার জনগণ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। পূর্ব বাংলার লাখ লাখ দেশপ্রেমিক জনগণের রক্তপাত বৃথা যায়।[৮]

তাহের সর্বহারা পার্টিকে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতেন। তাঁর ওপর সিরাজ শিকদারের ছিল অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস। সিরাজ শিকদার ছিলেন খুঁতখুঁতে স্বভাবের মানুষ। তিনি শতভাগ নিশ্চিত না হয়ে কারও বাড়িতে যেতেন না এবং তা শেল্টার হিসেবে ব্যবহার করতেন না। ১৯৭২ সালে কুমিল্লা সেনানিবাসে তাহেরের বাসায় তিনি মাঝেমধ্যে যেতেন ও থাকতেন। একপর্যায়ে তাহের সর্বহারা পার্টিকে একটি ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটার জোগাড় করে দেন। তাঁর অনুজ আবু সাঈদ এটা পৌছে দেন। তাহেরের সঙ্গে জাসদের যোগাযোগ আছে, এটা সর্বহারা পার্টির নেতাদের কাছে অজানা ছিল না। তবে যোগাযোগ যে কতটা উঁচু পর্যায়ে, তা তাঁরা বুঝতে পারেননি।[৯] আবার সর্বহারা পার্টির সঙ্গে যে তাহেরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, এটাও জাসদের কাছে অজানা ছিল না। বাহাত্তরের শেষ দিকে মেজর জলিল তাহেরকে সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তী

লে. কর্নেল (অব.) আবু তাহেরের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে লে. কর্নেল (অব.) জিয়াউদ্দিন

সময়ে তাহেরের ছোট ভাই আনোয়ার হোসেন সরাসরি গণবাহিনীর সঙ্গে 'ভ্রাতৃসূত্রে' যুক্ত হন।[১০]

সেনাবাহিনীতে সর্বহারা পার্টির কাজ ছিল অফিসারদের মধ্যে। পুলিশ বাহিনীতেও তাদের অনেক লোক ছিল, যারা নিয়মিত তথ্য সরবরাহ করত। সেনাবাহিনীতে লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিন, লে. কর্নেল আবু তাহের, মেজর শরিফুল হক ডালিম, মেজর নূর চৌধুরী, ফ্লাইট লে. সালাহউদ্দিন ও মেজর জিয়াউদ্দিন সর্বহারা পার্টির সদস্য ছিলেন অথবা পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। মেজর জিয়াউদ্দিন ছিলেন সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআইয়ের (তখন নাম ছিল ডিএফআই) ঢাকা শহরের দায়িত্বে।[১১]

সর্বহারা পার্টির নজরদারিতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অনেক নেতাই ছিলেন। জাসদের অনেক কর্মকাণ্ডের তথ্যই তাঁরা পেতেন। একবার তাঁরা জানতে পারলেন, সচিবালয়ের সামনে আবদুল গনি রোডে ড্রেনের মধ্যে বোমা রেখে দেওয়ার একটা পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের গাড়ি ওই পথে যাওয়ার সময় বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। এটা ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি সময়ের ঘটনা। ১৯৭৭ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সর্বহারা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আকা ফজলুল হক ঢাকা নগর গণবাহিনীর কমান্ডার আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে পুরোনো 'বিশ সেলের' বিশ নম্বর সেলে কিছুদিন একসঙ্গে ছিলেন। আকা ফজলুল হক আবদুল গনি রোডে বোমা ফাটানোর পরিকল্পনাটির কথা যাচাই করতে চাইলে আনোয়ার এর সত্যতা স্বীকার করেন।[১২]

শেখ মুজিব তাঁর পরিবারের কিছু সদস্যকে নিয়ে বিপাকে ছিলেন। বিশেষ করে, শেখ ফজলুল হক মনি ও শেখ কামালের কিছু কিছু কাজের ফলে তাঁরা শুধু নিজেরাই বিতর্কিত হননি, এর দায় নিতে হয়েছে শেখ মুজিবকে। পিতা শেখ মুজিবের প্রতি পুত্র কামালের ছিল প্রচণ্ড আবেগ ও ভালোবাসা। এ জন্য শেখ কামাল অতি উৎসাহে অনেক কিছুই বলতেন বা করতেন, যার জন্য শেখ মুজিবকে যথেষ্ট বিব্রত হতে হতো। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, চুয়াত্তরের ৩ জুন দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সর্বহারা পার্টি পরপর দুই দিন হরতাল ঘোষণা করেছিল। স্বভাবতই নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো এ উপলক্ষে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেবে, যাতে জনজীবন ব্যাহত না হয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী-পুত্র শেখ কামাল এই হরতালকে ব্যক্তিগতভাবে নিলেন এবং ২ জুন রাতে দলবল নিয়ে একটা মাইক্রোবাসে চেপে 'সর্বহারা' ধরতে বের হলেন। তাঁরা সশস্ত্র ছিলেন। মাঝরাতে এরকম একটা মাইক্রোবাস দ্রুতগতিতে যেতে

দেখে পুলিশের সন্দেহ হয় এবং একটা পুলিশের গাড়ি মাইক্রোবাসটিকে ধাওয়া করে। পুলিশের সন্দেহ ছিল, ওই মাইক্রোবাসে 'সর্বহারা' বা অন্য কোনো 'দুষ্কৃতকারী' থাকতে পারে। পুলিশের গাড়ি থেকে মাইক্রোবাসে গুলি করা হয়। কামাল গুলিতে গুরুতর আহত হন। পুলিশ কামালকে শনাক্ত করে এবং তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

বেলা ১১টায় পুলিশের মহাপরিদর্শক আবদুর রহিম এনএসআইয়ের প্রধান মেসবাহউদ্দিনকে নিয়ে শেখ মুজিবের বাসায় যান এবং ঘটনার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চান। শেখ মুজিব রহিমকে বলেন, 'এতে দুঃখ প্রকাশের কী আছে? সে যদি মারাও যেত, তাহলেও আমার দুঃখ হতো না। কে তাকে মাঝরাতে দুষ্কৃতি ধরতে যেতে বলেছে? আমি তো তাকে হাসপাতালে দেখতেও যাইনি? আমাকে তোমরা কী মনে করো, মোনেম খান (মোনেম খানের ছেলে খসরু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে গুন্ডামি করত বলে অনেক অভিযোগ ছিল)?' আবদুর রহিমের ডায়েরি থেকে এস এ করিম এই ঘটনাটি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। শেখ মুজিব দুই দিন পর হাসপাতালে কামালকে দেখতে যান।[১৩] ওই সময় একটা প্রচার ছিল যে, কামাল 'বাংলাদেশ ব্যাংক' লুট করতে যাচ্ছিলেন। অনেকেই এই প্রচারণা বিশ্বাস করেছিলেন। তাঁরা একটু ভেবে দেখলেন না, প্রধানমন্ত্রী-পুত্র চাইলে তাঁর পায়ের কাছে থলেভর্তি টাকা রেখে দেওয়ার লোকের অভাব ছিল না। তিনি কেন এত ঝুঁকি নিয়ে ব্যাংক লুট করতে যাবেন?
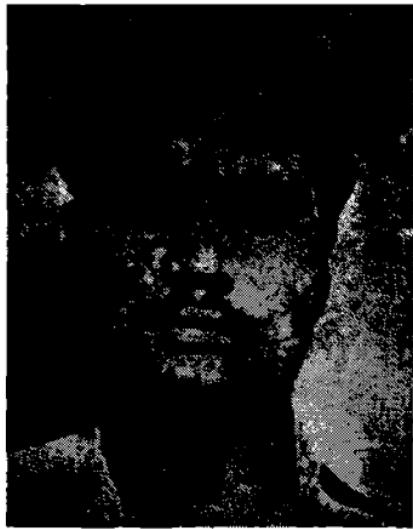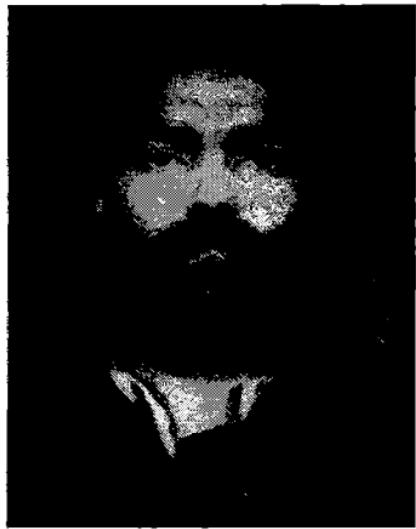
পঁচাত্তরের ১ জানুয়ারি সিরাজ শিকদারকে চট্টগ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ কর্মকর্তা মারুফুল হক তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। তাঁকে হাতকড়া পরিয়ে চোখ বেঁধে বিমানে করে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। তেজগাঁও বিমানবন্দরে তাঁকে নামানো হলে পুলিশের ইন্সপেক্টর কায়কোবাদ তাঁর বুকে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দেন। মালিবাগে স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসে কিছুক্ষণ রাখার পর অতিরিক্ত নিরাপত্তার কারণে তাঁকে শেরেবাংলা নগরে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হয়। ঢাকার পুলিশ সুপার মাহবুব উদ্দিন আহমদকে জিজ্ঞাসাবাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদের পদ্ধতি নিয়ে মাহবুবের তেমন 'সুখ্যাতি' ছিল না। ওই রাতেই তাঁকে হত্যা করা হয়। লেখা হয় 'ক্রসফায়ারের' চিত্রনাট্য। একটা প্রেস নোটে বলা হয়, পুলিশ তাঁকে নিয়ে অস্ত্রের সন্ধানে সাভারে গিয়েছিল। গাড়ি থেকে লাফিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের গুলিতে সিরাজ শিকদার নিহত হন।[১৪] দিনটা ছিল পঁচাত্তরের ২ জানুয়ারি। পুলিশ সুপার মাহবুব ও সিরাজ শিকদার ছিলেন ছোটবেলার বন্ধু।

তাঁরা দুজনই বরিশালে একসময় লেখাপড়া করেছেন। কুদরত (মাহবুবের ডাকনাম) এবং সেরা (সিরাজ শিকদার), এই দুজনের বন্ধুত্বের কথা বরিশাল শহরের অনেকেই জানতেন।[১৫] জীবনের শেষ প্রহরে সেরা তাঁর বাল্যবন্ধু কুদরতের সঙ্গে আবার মিলিত হলেন। তবে অন্যভাবে। ৩২ বছর বয়সের মোস্ট ওয়ান্টেড এই তরুণের এভাবেই জীবনের করুণ সমাপ্তি ঘটে। সিরাজ শিকদারের লাশ তাঁর মা-বাবার কাছে হস্তান্তর করা হয়।[১৬] ঢাকার মোহাম্মদপুরে তাজমহল রোডের পাশে জামে মসজিদ-সংলগ্ন গোরস্থানে পুলিশ পাহারায় তাঁকে দাফন করা হয়।

সিরাজ শিকদারের মৃত্যু নিয়ে পরবর্তী সময়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছে। 'কোথায় আজ সিরাজ শিকদার', শেখ মুজিবের জাতীয় সংসদে দেওয়া বক্তব্যের এই একটিমাত্র বাক্য উদ্ধৃত করে তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হয়েছিল এবং এর মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছিল, সিরাজ শিকদারকে বুঝি শেখ মুজিবের নির্দেশেই হত্যা করা হয়েছে। অথচ সংসদে শেখ মুজিব এ প্রসঙ্গে অনেক কথাই বলেছিলেন, যা থেকে বোঝা যায়, তিনি দেশের 'অরাজক পরিস্থিতি এবং দুর্বৃত্তদের' সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে সিরাজ শিকদারের প্রসঙ্গ টেনেছিলেন। তাঁর বক্তব্যটি ছিল এরকম :

> বিপ্লবের বিরোধিতা করে এবং শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজ দেশবাসীকে যারা হত্যা করে, কোনো জাতি তাদের কখনো ক্ষমা করে না। আমরা করেছি। আমি তাদের বলেছিলাম, তোমার লোকদের ভালোবাসো, দেশের জন্য কাজ করো এবং স্বাধীনতা মেনে নাও। এখানে থাকো। কিন্তু তারা বদলায়নি। তারা বিদেশ থেকে টাকা নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। তারা ভাবে, আমি কিছুই জানি না। যারা ডাকাতের মতো রাতের বেলায় মানুষ খুন করে, তারা মনে করে কেউ তাদের ধরতে পারবে না। কোথায় আজ সিরাজ শিকদার? যদি তাকে পাকড়াও করা যায়, যদি তার লোকদের ধরা যায়, তাহলে ঘুষখোর কর্মকর্তাদেরও আমরা ধরতে পারব। যারা গোপনে বিদেশ থেকে টাকা পায়, আমরা কি তাদের খুঁজে বের করতে পারব না? যারা সম্পদ লুট করে, তাদের কি আমরা ধরতে পারব না? মজুতদারদের ধরতে পারব না, কিংবা কালোবাজারিদের? নিশ্চয়ই পারব।[১৭]

সিরাজ শিকদারকে হত্যা করার ব্যাপারে শেখ মুজিবের হাত ছিল—জনমনে এ ধরনের একটা ধারণা তৈরির চেষ্টা করেছেন অনেকেই। কিন্তু সত্যি কি তা-ই? আটক অবস্থায় নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীর অতি উৎসাহী কোনো কর্মকর্তা যে তাঁকে হত্যা করতে পারেন, এই আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সিরাজ শিকদারের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে

অন্য ধারার রাজনীতির দুই কুশীলব, সিরাজুল আলম খান ও সিরাজ শিকদার—দুজনের মধ্যে দেখা হয়নি কখনো

একজন পুলিশ কর্মকর্তা শেখ মুজিবের কাছে গেলে তিনি রেগে গিয়ে বলেছিলেন, 'তোরা ওকে মেরে ফেললি?'[১৮]

সিরাজ শিকদারকে নিয়ে পরবর্তী সময়ে যাঁরা প্রচুর অশ্রু বিসর্জন করেছেন, সেসব রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী এই হত্যাকাণ্ডের পর নিশ্চুপ ছিলেন। ব্যতিক্রমও ছিল। ৪ জানুয়ারি *গণকণ্ঠ* সিরাজ শিকদারের স্মরণে একটা সম্পাদকীয় ছেপেছিল। দৈনিক *জনপদ*-এর প্রথম পৃষ্ঠায় সিরাজ শিকদারকে নিয়ে সম্পাদক আব্দুল গাফফার চৌধুরী স্বনামে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন।[১৯]

জাসদের বিরুদ্ধে অন্য 'বাম' দলগুলোর প্রবল সমালোচনা সত্ত্বেও সর্বহারা পার্টি কখনো প্রকাশ্যে জাসদের বিরুদ্ধে কিছু বলেনি। এ সময়ের একটা সাড়া জাগানো দেয়াললিখনে সর্বহারা পার্টি তার বক্তব্য তুলে ধরেছিল এভাবে :

> ছয় পাহাড়ের দালালদের খতম করুন : জাতীয় বিশ্বাসঘাতক শেখ মুজিব, সংশোধনবাদী মনি-মোজাফফর, নয়া সংশোধনবাদী হক-তোয়াহা, ট্রটস্কিবাদী মতিন-আলাউদ্দিন, সুবিধাবাদী দেবেন-বাশার এবং ষড়যন্ত্রকারী জাফর-মেনন চক্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলুন।

সর্বহারা পার্টির ভেতর এমন আলোচনাও ছিল যে, যখন তারা গোপন কার্যক্রম থেকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে এবং মিছিল ও হরতালের মতো কর্মসূচি দিচ্ছে, ঠিক সে সময় জাসদ কেন প্রকাশ্য রাজনীতি ছেড়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে যাচ্ছে।[২০]

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হচ্ছিল। শেখ মুজিব প্রচলিত ব্যবস্থায় আস্থা হারিয়ে ফেলছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন, তাঁর পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের একটা বিশেষ সম্পর্ক ছিল, যা শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল। ঢাকায় সিরাজ যে জায়গায় থাকতেন, সেখানে আসা-যাওয়ার পথে জাসদের অনেক নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছেন। কিন্তু তাঁর বাসায় কখনো পুলিশ যায়নি। এ ব্যাপারে শেখ মুজিবের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল। তিনি সিরাজকে বলেছিলেন, 'তোর এখন এখানে থাকাটা নিরাপদ নয়।'[২১]

চুয়াত্তরের ডিসেম্বরে শেখ মুজিব তাঁর আস্থাভাজন সাইদুর রহমানকে সিরাজুল আলম খানের কাছে পাঠালেন। সাইদুর রহমান ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি কোনো রাজনীতি করতেন না। তবে শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সিরাজের সঙ্গেও তাঁর ভালো সম্পর্ক ছিল। তাঁর বাড়িতে জাসদের বৈঠক হয়েছিল কয়েকবার। তিনি আজিমপুরে চায়না বিল্ডিংয়ের গলিতে সিরাজুল আলম খানের বাসায় যান। সিরাজ তাঁকে ইংরেজিতে টাইপ করা কয়েক শিট কাগজ দেন। কাগজে বাংলাদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচি সম্পর্কে সিরাজের চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ছিল।[২২]

কয়েক দিন পর শেখ মুজিব সিরাজুল আলম খানকে ডেকে পাঠান। অনেক দিন পর গুরু-শিষ্যের দেখা হলো। দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন। শেখ মুজিব অনুযোগ করে বললেন, 'সিরাজ, তুই সবাইকে নিয়ে চলে গেলি?' তিনি সিরাজকে বললেন, তিনি একটা 'জাতীয় দল' গঠন করতে চান। এত দলের দরকার নেই। সিরাজ বললেন, এতে তাঁর সম্মতি নেই। তিনি চান একটা জাতীয় সরকার, যেখানে সব দলের অংশগ্রহণ থাকবে। শেখ মুজিবের এই প্রস্তাব পছন্দ হলো না। তিনি বললেন, 'তার মানে কোয়ালিশন সরকার? ছাপ্পান্ন সালের অভিজ্ঞতা খুবই খারাপ।' তিনি সিরাজকে অনুরোধ করলেন, 'সবাইকে নিয়ে একটা দল করতে চাই, জলিল ও রবকে তুই আমার দলে দে।'[২৩]

সিরাজুল আলম খান প্রস্তাবটি নিয়ে দলের কয়েকজন নেতার সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করলেন। আ স ম আবদুর রব তখন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের নতুন 'বিশ সেল'-এর বাসিন্দা। সিরাজ তাঁর কাছে মতামত চেয়ে চিরকুট পাঠালেন। রব কারাগারে সহবন্দী মো. শাজাহান, এম এ আউয়াল ও মির্জা সুলতান রাজার সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তাঁরা সবাই সিরাজুল আলম খানকে শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে অনুরোধ

করলেন।[২৪] শেখ মুজিবের সঙ্গে সিরাজের আবার সাক্ষাৎ হলো। শেখ মুজিব বললেন, 'তোরা তো বাহাত্তরে এটাই চেয়েছিলি।' একটা সমঝোতা যখন প্রায় হয়েই যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় বাগড়া দিলেন শেখ ফজলুল হক মনি। শেখ মুজিব তাঁর পুরোনো অবস্থানেই রয়ে গেলেন।[২৫]

শেখ মুজিবের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন সিরাজুল আলম খান। শেখ মুজিব তাঁকে বললেন, 'আমার কথা ভাবার দরকার নাই। তোকে নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা হয়। তুই পারলে অন্য কোথাও চলে যা।'[২৬]

২ জানুয়ারি শেখ মুজিবের সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের আরেকবার সাক্ষাৎ হওয়ার কথা ছিল। শেখ মুজিব সাইদুর রহমানকে দিয়ে বার্তা পাঠালেন, ২ তারিখের মিটিংটা হবে না। ২৮ ডিসেম্বর রাতে রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদ উল্লাহ্ সংবিধানের ১৭১গ অনুচ্ছেদের (১) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন। পরদিন সিরাজুল আলম খান গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে যান।[২৭]

পঁচাত্তরের ২৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে চতুর্থ সংশোধনী আইন পাস হয়। এই সংশোধনীর ফলে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার বিলুপ্ত করে প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতির সরকার চালু করা হয়।[২৮]

চতুর্থ সংশোধনী বিল গৃহীত হওয়ার পর বিদায়ী সংসদ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধান সংশোধনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে আবেগাপ্লুত হয়ে একটা দীর্ঘ ভাষণ দেন। স্পিকারকে সম্বোধন করে দেওয়া তাঁর ভাষণের মূল অংশগুলো ছিল :

> দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, আজ আপনার এই সংসদের চারজন সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁদের আগে হত্যা করা হয়েছে যাঁরা এই কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির মেম্বার ছিলেন।...হাজার হাজার কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে।...কোনো একটি রাজনৈতিক দল যাদের আমরা অধিকার দিয়েছিলাম—তারা কোনো দিন এদের কনডেম করেছে কি না? তারা কনডেম করে নাই। আমাদের সংবিধানে অধিকার দেওয়া আছে ভোটের মাধ্যমে তোমরা সরকার পরিবর্তন করতে পারো—এই ক্ষমতা আমরা দিয়েছিলাম। বাই-ইলেকশন আমরা তিন মাসের মধ্যে দিয়েছি। জনগণ ভোট না দিলে তার জন্য আমরা দায়ী নই। তখন তারা বলেছিল, এই সরকারকে অস্ত্র দিয়ে উৎখাত করতে হবে।...
>
> আজকে আমরা যারা শিক্ষিত, এমএ পাস করেছি, বিএ পাস করেছি, স্পিকার সাহেব, আপনি জানেন, এই দুঃখী বাংলার গ্রামের জনসাধারণ, তারাই অর্থ দিয়েছে আমাদের লেখাপড়া শেখার একটা অংশ।...কী আমি

তাদের ফেরত দিয়ে দিয়েছি, আমি তাদের রিপে (repay) করেছি কতটুকু?...তুমি কি ফেরত দিয়েছ বাংলার দুঃখী মানুষকে, যে দুঃখী মানুষ না খেয়ে মরে যায়?...এ প্রশ্ন আজ এখন জেগে গেছে।...বাংলার মাটি থেকে করাপশন উৎখাত করতে হবে।...আমরা যে পাঁচ পারসেন্ট শিক্ষিত সমাজ, আমরা হলাম দুনিয়ার সবচেয়ে করাপ্ট পিপল, আর আমরাই করি বক্তৃতা। আমরা লিখি খবরের কাগজে, আমরাই বড়াই করি। আজ আত্মসমালোচনার দিন এসেছে, এসব চলতে পারে না।....আজকে আমূল পরিবর্তন করেছি শাসনতন্ত্রকে।...আজ আমি বলতে চাই—দিস ইজ আওয়ার সেকেন্ড রেভল্যুশন।...আজকে অ্যামেন্ডেড কনস্টিটিউশনে যে নতুন সিস্টেমে আমরা যাচ্ছি, এটাও গণতন্ত্র। শোষিতের গণতন্ত্র।[২৯]

পঁচাত্তরের ২৪ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করেন। দলটি ছিল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগেরই একটি পুনর্গঠিত রূপ। দলের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের কমিটিতে আওয়ামী লীগের পুরোনো মিত্র বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের (মোজাফ্ফর) কয়েকজনকে রাখা হয়।

জাতীয় সংসদের আওয়ামী লীগদলীয় সদস্য এম এ জি ওসমানী ও মইনুল হোসেন বাকশালে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। তাঁদের সংসদ সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়। বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যদের মধ্যে আতাউর রহমান খান (জাতীয় লীগ), কামরুল ইসলাম সালেহউদ্দিন (ভাসানী-ন্যাপ), আবদুস সাত্তার (জাসদ), মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (স্বতন্ত্র) এবং চাই থোয়াই রোয়াজা (স্বতন্ত্র) বাকশালে যোগ দেন। জাসদের ময়নুদ্দিন আহমেদ এবং আবদুল্লাহ সরকার বাকশালে যোগ না দেওয়ায় তাঁদের সংসদ সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়।

জাসদের সামনে প্রকাশ্য সাংবিধানিক রাজনীতির আর কোনো সুযোগ থাকে না। ঢাকায় চুয়াত্তরের ২৬ নভেম্বরের হরতালের পর বিভিন্ন জেলায় পার্টি ফোরামগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। গণবাহিনীর ইউনিটগুলো কোনো কেন্দ্রীয় কমান্ডের আওতায় ছিল না, তার সুযোগও ছিল না। সিরাজুল আলম খানের অনুপস্থিতিতে জেলা ও থানা ফোরামগুলো এবং গণবাহিনীর ইউনিটগুলো জাতীয় কৃষক লীগের 'সমাজতান্ত্রিক কৃষি বিপ্লবের কর্মসূচি'র সমর্থনে নানান কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। গ্রামাঞ্চলে শুরু হয়ে যায় 'শ্রেণিসংগ্রাম'। ধনী কৃষকদের ওপর হামলা হতে থাকে। তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা। এ সময় বেশ কিছু পুলিশ ফাঁড়ি ও থানা আক্রমণ এবং অস্ত্রশস্ত্র লুট করা হয়। আওয়ামী লীগের (বাকশাল)

সংসদ সদস্যদের অনেকেই গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে আশ্রয় নেন। কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, রাজবাড়ী, সাতক্ষীরা, মাদারীপুর, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে গণবাহিনীর কার্যক্রম ছিল দৃশ্যমান।

এ সময় সম্পন্ন কৃষক ও 'জোতদারদের' হাত থেকে প্রায় পাঁচ হাজার একর জমি গণবাহিনী 'উদ্ধার' করে কৃষক লীগের স্থানীয় কমিটিগুলোর মাধ্যমে তা ভূমিহীন ও গরিব চাষিদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়। বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া, নন্দীগ্রাম, কাহালু, আদমদীঘি ও আক্কেলপুর থানায় এই 'কৃষিবিপ্লবের' কাজ চলে বলে কৃষক লীগ সূত্রে দাবি করা হয়। এ সময় কিছু কিছু জায়গায় ধনী কৃষকদের ধানের গোলা লুট করে সেই ধান গরিব ও দুস্থ ব্যক্তিদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া হয়। গ্রামাঞ্চলে 'লাল সন্ত্রাসের' বাতাস বইতে থাকে। কয়েকটি জেলায় অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, দিনের বেলায় সেখানে সরকারি প্রশাসন থাকলেও রাতের বেলা এলাকাগুলো গণবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ইয়েনকা আরেন্সের গবেষণাগ্রন্থ *ঝগড়াপুর*-এ এ সম্পর্কে অনেক কথা লেখা হয়েছে। সেখানে 'রাতবাহিনীর' উল্লেখ করা হয়েছে একাধিকবার।[৩০]

সিরাজুল আলম খান মাস দুয়েক পর ঢাকায় আসেন। এক রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় তিনি ছাত্রলীগের নেতা রফিকুল ইসলামের খোঁজে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আবু জায়েদ শিকদারের ফ্ল্যাটে হাজির হন। রফিক নিয়মিত ওই বাসায় যেতেন। রফিক প্রথমে তাঁকে চিনতে পারেননি। সিরাজুল আলম খান সব সময় লম্বা চুল-দাড়ি রাখতেন। পরতেন খদ্দরের পায়জামা-পাঞ্জাবি। তাঁকে দেখা গেল শার্ট-প্যান্ট পরা, পায়ে কেডস, দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। রফিকের সঙ্গে তাঁর কিছুক্ষণ কথা হলো। তিনি রফিককে নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই ঢাকা নগর গণবাহিনীর একটা সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি হয়ে গেল। রফিক হলেন রাজনৈতিক কমিসার। আনোয়ার হোসেনকে কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো।[৩১]

সিরাজুল আলম খান কিছুদিন পর আবার ভারতে চলে যান। আনোয়ার হোসেন ঢাকা নগর গণবাহিনীকে তাঁর পছন্দমতো ঢেলে সাজান। এসব ব্যাপারে তিনি কখনো রফিকের সঙ্গে পরামর্শ করেননি।[৩২]

ঢাকা নগরকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে প্রতিটি অঞ্চলের জন্য গণবাহিনীর আলাদা আলাদা ইউনিটকে দায়িত্ব দেন আনোয়ার। এ ছাড়া আনোয়ারের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে একটা ইউনিট ছিল। ঢাকা নগর গণবাহিনীর

সক্রিয় সদস্যদের মধ্যে ছিলেন নজিবুল হক, মো. কালাম, মুশতাক হোসেন, সাখাওয়াত হোসেন বাহার, খায়রুজ্জামান বাবুল, ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল, বাহারুল হোসেন সবুজ, বাদল খান, মীর নজরুল ইসলাম বাচ্চু, গোলাম মোর্শেদ নয়ন, আবু বকর সিদ্দিক, গোলাম মাহমুদ, খালেকুজ্জামান চৌধুরী, হেদায়েত হোসেন, গিয়াসুদ্দিন খান, আবদুস সালাম, সুজা মাহমুদ, শহীদ খান, দ্বীন মোহাম্মদ, হেলাল, রহিম, আশরাফ, হেমায়েত, পিন্টু, আবুল হাসিব খান প্রমুখ। আবুল হাসিব খান ঢাকা নগর গণবাহিনীর উপপ্রধানের দায়িত্বেও ছিলেন। বাহার ও বেলাল ছিলেন আনোয়ারের সহোদর।

মেয়েদের মধ্যে গণবাহিনীতে সক্রিয় ছিলেন ফেরদৌস আরা রোজি, রওশন আরা রুশো, লুৎফা হাসিন রোজি, কাজী ফেরদৌসি লিনু, শায়েস্তা ফাতেমা বানু, আয়েশা পারুল, খুকুমণি প্রমুখ। তাঁরা প্রয়োজনে বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াত করতেন। তাঁরা সবাই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার বিভিন্ন কলেজের ছাত্রী।[৩৩]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণবাহিনীর একটি স্বতন্ত্র ইউনিট ছিল। আবুল বারাকাত দুলাল ছিলেন কমান্ডার। অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন আহসান উল্লাহ, নূর মোহাম্মদ, গৌতম দেওয়ান, আবদুল মোমেন, জাহাঙ্গীর আলম, আবু আলম শহীদ খান, মোশতাক আহমেদ, শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।[৩৪]

গণবাহিনীর একটি কেন্দ্রীয় কমান্ড থাকলেও ঢাকা নগর গণবাহিনী পরিচালিত হতো মূলত আনোয়ার হোসেনের নির্দেশে। তাঁর চিঠি বা চিরকুটের ভিত্তিতে অস্ত্রশস্ত্রের লেনদেন হতো। প্রতিটি ইউনিটের নিজস্ব অস্ত্রের ভান্ডার ছিল। একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে।

লালবাগ অঞ্চলে গণবাহিনীর ইউনিটের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল একটি করে স্টেনগান, কাটা রাইফেল, পয়েন্ট থ্রি-এইট রিভলবার, পয়েন্ট টু-টু রিভলবার এবং সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ মিমি পিস্তল। কাটা রাইফেলকে তাঁরা সংক্ষেপে বলতেন ডিএমজি (ডাকাত মারা গান)। অস্ত্রের ভান্ডার ছিল ইসলামবাগে। ভান্ডারের দায়িত্বে ছিলেন হোসেন। তাঁকে বলা হতো 'কোত কমান্ডার'। পুরো ইউনিটে ৩০ জন সদস্য ছিলেন। তাঁরা মাঝেমধ্যে বিডিআরের সদস্যদের কাছ থেকে গুলি সংগ্রহ করতেন। একটু খাতির করে চা-নাশতা খাওয়ালে বিডিআরের 'কোত' থেকে তাঁরা ২০-২৫টা গুলি দিয়ে দিতেন। 'কোত' থেকে গুলি বিক্রিও হতো।[৩৫]

ঢাকা নগর পার্টি ফোরামের সমন্বয়ক ছিলেন আ ফ ম মাহবুবুল হক। তিনি ছিলেন ছাত্রলীগের সভাপতি। ফোরামের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন আবদুল

বাতেন চৌধুরী, সুভাষচন্দ্র সাহা, খালেকুজ্জামান চৌধুরী, আবুল কাশেম শামসুদ্দিন, আলী আযম, আখতারুজ্জামান, শফিকুর রহমান, এনায়েতুল্লাহ কাশেম, আলী হোসেন ও রফিক। পার্টি ফোরামের সঙ্গে ঢাকা নগর গণবাহিনীর খুব একটা সমন্বয় ছিল না।[৩৬]

এ সময় অনেকেই ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। যেমন ঢাকা নগর গণবাহিনীর রফিকুল ইসলামের ছদ্মনাম ছিল শামীম, আনোয়ার হোসেনকে কাইয়ুম নামে ডাকা হতো, বাহারের নাম হলো আসাদ, আনোয়ার হায়াত খান হয়ে গেলেন বাদল খান। পরে তিনি এফিডেভিট করে নামই পাল্টে ফেলেন। কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যেও ছদ্মনাম ব্যবহারের প্রবণতা ছিল। চিঠি-চিরকুটে সত্যিকার নাম লেখা হতো না। যেমন কাজী আরেফ আহমেদের নাম ছিল আনিস, শরীফ নুরুল আম্বিয়া হলেন আহাদ, মনিরুল ইসলাম মার্শাল নামে পরিচিত ছিলেন। এখন তাঁর নাম হলো মানিক। সিরাজুল আলম খানকে 'দাদা' নামে ডাকা হতো।

জাসদ ও গণবাহিনী প্রথম থেকেই অর্থসংকটে ভুগছিল। তাদের বিরুদ্ধে একটা প্রচার ছিল, তারা ভারতের দালাল। 'র' থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আসে; সেই টাকায় এরা রাজনীতি করে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে 'সে অমুকের দালাল', 'ও তমুকের দালাল'—এ কথাগুলো বহুল প্রচলিত। শেখ মুজিবকে একসময় এ ধরনের অপবাদ অনেক সহ্য করতে হয়েছে। জাসদও ক্রমাগত এ ধরনের সমালোচনা ও আক্রমণের শিকার হতে থাকল। দ্রুত জনপ্রিয়তা পেয়ে যাওয়ায় অন্যান্য 'বাম' দল জাসদকে রীতিমতো ঈর্ষা করত। তাদের মনস্তত্ত্ব ছিল অনেকটা এই রকম : 'আমরা এত বছর ধরে সমাজতন্ত্রের জন্য, বিপ্লবের জন্য লড়াই করে আসছি, আর এরা হলো দুদিনের সমাজতন্ত্রী—কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে!' জাসদকে তাই দুটো ফ্রন্টে লড়াই করতে হতো। প্রথমত, সরকারি দল ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয়ত, অন্যান্য কমিউনিস্ট ও বাম দলগুলোর সঙ্গে।

টাকাপয়সা সংগ্রহের জন্য সহানুভূতিশীল ব্যবসায়ী ও চাকরিজীবীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করা ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর একটি সাধারণ কৌশল। দলের প্রধান নেতারা গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ায় এবং দল প্রকাশ্য রাজনীতি থেকে সরে আসার ফলে চাঁদা সংগ্রহ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ সময় সর্বহারা পার্টি ও অন্যান্য দলের কর্মীরা দু-একটি ব্যাংকের শাখা কিংবা হাটবাজার লুট করতেন বলে প্রচার ছিল। জাসদও এ ধরনের কিছু পরিকল্পনা করে।

চুয়াত্তরের মাঝামাঝি পরিকল্পনা অনুযায়ী মেহেরপুর ট্রেজারি আক্রমণ করে ৭৩টি অস্ত্র লুট করা হয়। ট্রেজারিতে রাখা টাকার দিকে তারা নজর দেননি। অস্ত্র সংগ্রহ করাই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ওই সময় কুষ্টিয়া গণবাহিনীর রাজনৈতিক কমিসার ছিলেন মির্জা সুলতান রাজা এবং একাত্তরের দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমান মন্টু ছিলেন চুয়াডাঙ্গা গণবাহিনীর কমান্ডার। মন্টু এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন। তাঁর ছোট ভাই নুরুজ্জামান লাল্টু ছিলেন দলের উপপ্রধান।[৩৭]

মন্টু ওই অভিযানে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। লাল্টু পালিয়ে বেড়ান এবং অবশেষে গ্রেপ্তার হন। মন্টুর স্ত্রী মাঝেমধ্যে তাঁকে জেলখানায় দেখতে যেতেন। একদিন তিনি দেখা করতে যাওয়ার সময় লাল্টুর জন্য একটা কাঁঠাল নিয়ে যান। কাঁঠালের ভেতরে একটা পিস্তল আর চারটি গুলি ছিল। ওপরে নিখুঁতভাবে সেলাই করা ছিল। লাল্টু ডেপুটি জেলারকে পিস্তল দেখিয়ে পালিয়ে যান। তাঁর ভাবি অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ভান করেন। পরে লাল্টুকে আলমডাঙ্গার গাজীখালী বিলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গণবাহিনীর সদস্যরা তাঁর জন্য একটা বারো শ মণের ধানের নৌকা ভাড়া করেন। বিলের মধ্যে নৌকায় লাল্টু চার মাস ছিলেন। পরে প্রচার করা হয়, তিনি মারা গেছেন। '৭৮ সালে নূরে আলম জিকুর উদ্যোগে লাল্টু স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সমর্পণ করেন। লাল্টু পরে ডাকাতি পেশায় জড়িয়ে যান। বিরাশি সালে তাঁকে জাসদ থেকে বহিষ্কার করা হয়।[৩৮] কী করুণ পরিণতি!

কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে রক্ষীবাহিনী ও অন্যান্য নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে যাঁরা নিহত হন, তাঁরা হলেন, হাদী, মুসা, উম্মত, খলিল, জিলানী, মারফত আলী, দেবেন, হিলাল, মোজাম্মেল, আবদুল ওহাব, মহিউদ্দিন, বাবু, ডা. আলাউদ্দিন, শামসু, আলতাফ, বশির, সাচ্চু, শাহিদ আলী প্রমুখ। অন্য দলের লোকদের হাতে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন হারুন, ইয়াকুব, লোকমান, আজিবর, তাইজুদ্দিন, দুলাল, সাত্তার, আতিয়ার ও আইনাল। তথাকথিত আন্তপার্টি সংগ্রামে ও ব্যক্তিগত নানা কারণে দলের লোকদের হাতে খুন হয়েছেন বাবু, রমজান, লিয়াকত, সাচ্চু চেয়ারম্যান, ইউনুস মেম্বার, আবদুর রউফ, মজিবর, রণজিৎ, লোবান, শের আলী, বাবলু, লিয়াকত চেয়ারম্যান ও ওয়ারেশ আলী। পরবর্তী সময়ে নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীর 'ক্রসফায়ারে' নিহত হন এবাদিল, বলাই, দোলন, টিক্কা, মালেক, বাবু, আদিল, লতিফ,

ইসলাম ও ভুট্টো। তাঁরা দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন এবং পরে ডাকাতি করে বেড়াতেন।[৩৯]

রাজশাহী জেলায় গণবাহিনীর সদস্যরা যথেষ্ট সক্রিয় থাকলেও সেখানে সরকারি দল ও বিভিন্ন বাহিনীর সঙ্গে সংঘাত তেমন ঘটেনি। জেলা গণবাহিনীর রাজনৈতিক কমিসার ছিলেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরমাণু চিকিৎসাকেন্দ্রের তরুণ চিকিৎসক এম এ করীম। বলা চলে, তিনিই ছিলেন জেলা জাসদের মূল নেতা। মাহফুজুর রহমান ও জাহাঙ্গীর হোসেন ছিলেন যথাক্রমে জেলা গণবাহিনীর কমান্ডার ও ডেপুটি কমান্ডার। গণবাহিনীর অন্যান্য সদস্যের মধ্যে ছিলেন আবদুল মতিন, ডা. নুরুন্নবী, রফিকুদ্দৌলা বাবুল, মিজান, পান্না, বকু প্রমুখ। স্থানীয় আওয়ামী লীগ-যুবলীগের একসময় উপলব্ধি হলো, জাসদ-গণবাহিনী থাকলে রাজশাহী থেকে আওয়ামী রাজনীতি উঠে যাবে। রাজশাহীর যুবলীগের নেতা নুরুল ইসলাম ঠান্ডু দলীয় নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য ঢাকায় গেলেন। তাঁকে বলা হলো, প্রয়োজনে করীম, মাহফুজ ও জাহাঙ্গীরকে রক্ষীবাহিনী দিয়ে খতম করে দিতে হবে। ঠান্ডুর সঙ্গে করীমের একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। ঠান্ডু করীমকে সতর্ক হয়ে চলাফেরার পরামর্শ দিলেন এবং দলীয় নেতাদের বললেন, 'এদের গায়ে হাত দিলে আমাদের কারও ঘরবাড়ি আর থাকবে না।' ফলে সংঘাতটা তখনকার মতো এড়ানো গেল। রক্ষীবাহিনীর একটা গাড়ি একদিন মেডিকেল কলেজের পাশে লক্ষ্মীপুরের মোড়ে রাজশাহী শহর জাসদ-ছাত্রলীগের নেতা সেলিমকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলে। এটা ছিল ঠান্ডা মাথায় খুন। করীম আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং রাজশাহীর সর্বজনশ্রদ্ধেয় রাজনীতিক এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে বিষয়টা জানান। কামারুজ্জামানের হস্তক্ষেপে রক্ষীবাহিনী সংযত হয়। রাজশাহীতে রাজনৈতিক সংঘাতের কারণে এরপর উভয় পক্ষের কেউই হতাহত হয়নি। এতে এটাই প্রমাণিত হয়, আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতৃত্ব চাইলে যেকোনো জায়গায় সংঘাত এড়ানো যেত।[৪০]

গণবাহিনীর কার্যক্রম বেশি দেখা গেছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে। পাংশা-রাজবাড়ী অঞ্চল ছিল গণবাহিনীর একটা বড় ঘাঁটি। ওই অঞ্চলের গণবাহিনীর রাজনৈতিক কমিসার ছিলেন আবুল কালাম আজাদ এবং কমান্ডার ছিলেন আবদুল মতিন মিয়া। চুয়াত্তরের শেষের দিকে আওয়ামী লীগের লোকজন রক্ষীবাহিনীর সহায়তায় পাংশার বাহাদুরপুরে মতিনের বাড়িঘর ভেঙে দেয়। বাড়ির গাছপালা কেটে তারা পুকুরে ফেলে

দেয়। ওই রাতেই মতিন দলবল নিয়ে তাঁর প্রতিবেশী ও বেয়াই সংসদ সদস্য খন্দকার নুরুল ইসলামের বাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেন। এ নিয়ে মামলা হয়।[৪১]

ছিয়াত্তরের আগস্টে মাগুরার শ্রীপুর থানার লাঙ্গলবন্দ বাজারে আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে পুলিশের ক্যাম্পে আক্রমণ চালানো হয়। এর কিছুদিন পর পাংশা থানার মাঝপাড়া রেলস্টেশনের কাছে আনসার-পুলিশের একটি দলের ওপর আক্রমণ হয়। তারা কুষ্টিয়ার জগতি চিনিকল থেকে আখচাষিদের আখের দাম পরিশোধ করার জন্য টাকা নিয়ে এসেছিলেন। গণবাহিনীর লক্ষ্য ছিল আনসার ও পুলিশের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনতাই করা। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে প্রকাশ্যে এই হামলা চালিয়ে গণবাহিনীর সদস্যরা ১৫টি রাইফেল লুট করে নিয়ে যায়। তারা টাকা হাত দিয়েও ছোঁয়নি। 'কেননা, তা ছিল কৃষকদের টাকা।'[৪২]

পুলিশের আক্রমণে এবং তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে বিভিন্ন সময় রাজবাড়ী-পাংশায় গণবাহিনীর আবুল কালাম আজাদ, আবুল হোসেন, মজনু, জিলানী ও আনসার আলী নিহত হন। আবদুল হকের কমিউনিস্ট পার্টির লোকদের হামলায় নিহত হন আবদুল ওহাব ও সুমন।[৪৩]

মাদারীপুরে গণবাহিনীর কমান্ডার ছিলেন শাজাহান খান। ছিয়াত্তর সালের মাঝামাঝি সময়ে গোপালগঞ্জের মোকসেদপুর থানায় একটি পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি গ্রেপ্তার হন। এরপর মাদারীপুর গণবাহিনীর কমান্ডার ছিলেন হেলাল উদ্দিন। তিনি বিকাশ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর খালাতো ভাই সরোয়ার হোসেন মোল্লা ছিলেন রক্ষীবাহিনীর উপপরিচালক। বিকাশ সর্বহারা পার্টির একদল সদস্যের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন।[৪৪]

পূর্বাঞ্চলে সংগঠনের দায়িত্বে ছিলেন কাজী আরেফ। এই অঞ্চলে গণবাহিনীর তৎপরতা ছিল না বললেই চলে। ছিয়াত্তরের জুনের মাঝামাঝি তাঁকে সরিয়ে মনিরুল ইসলামকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তার পরও অবস্থার তেমন হেরফের হয়নি। চট্টগ্রাম জেলা গণবাহিনীর কমান্ডার ও সহকারী কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে মাঈনুদ্দিন খান বাদল ও সৈয়দ আবদুল কাদের আফেন্দী। ছিয়াত্তরের অক্টোবর-নভেম্বরে গণবাহিনীর একটি দল কক্সবাজার জেলার চকরিয়া থানায় রূপালী ব্যাংকের ঈদগাহ শাখায় আক্রমণ চালিয়ে পৌনে চার লাখ টাকা সংগ্রহ করে। ঢাকায় জানানো হয়, ত্রিশ হাজার টাকা পাওয়া গেছে। পরে দলের তহবিলে দশ হাজার টাকা জমা পড়ে।[৪৫]

তথ্যনির্দেশ

১. বাদল খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
২. অধীর কুমার বিশ্বাসের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৩. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪।
৪. আকা ফজলুল হকের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৫. হোসেন, ড. মো. আনোয়ার (২০১১), *তাহেরের স্বপ্ন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ১১।
৬. আবু সাঈদের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৭. আকা ফজলুল হকের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৮. রহমান (২০০৪), পৃ. ২০৮।
৯. আকা ফজলুল হকের সঙ্গে আলাপচারিতা।
১০. সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
১১. আকা ফজলুল হকের সঙ্গে আলাপচারিতা।
১২. ওই।
১৩. Karim, p. 340.
১৪. আকা ফজলুল হকের সঙ্গে আলাপচারিতা।
১৫. আমানউল্লাহর সঙ্গে আলাপচারিতা।
১৬. Karim, p. 362.
১৭. Karim, p. 355.
১৮. Karim, p. 356.
১৯. গোলাম মহিউদ্দিন খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
২০. আকা ফজলুল হকের সঙ্গে আলাপচারিতা।
২১. সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
২২. আবদুল বাতেন চৌধুরীর সঙ্গে আলাপচারিতা।
২৩. সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
২৪. আ স ম আবদুর রবের সঙ্গে আলাপচারিতা।
২৫. সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
২৬. ওই।
২৭. ওই।
২৮. *The Bangladesh Gazette, Extraordinary, 25 January 1975*, Vol. 5, p. 385-96.
২৯. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ২৭ জানুয়ারি ১৯৭৫।
৩০. Arens, Jenneke and Bemden, Jos Van (1980). *Jhagrapur: Poor Peasants and Women in a Village in Bangladesh,* Orient Longman, New Delhi.

৩১. রফিকুল ইসলামের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৩২. ওই।
৩৩. রফিকুল ইসলাম, আবুল হাসিব খান এবং বাদল খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৩৪. আবুল হাসিব খান ও আবুল বারাকাত দুলালের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৩৫. বাদল খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৩৬. রফিকুল ইসলাম, আবুল হাসিব খান ও সুভাষ চন্দ্র সাহার সঙ্গে আলাপচারিতা।
৩৭. শরীফ নুরুল আম্বিয়ার সঙ্গে আলাপচারিতা।
৩৮. অধীর কুমার বিশ্বাসের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৩৯. ওই।
৪০. এম এ করীমের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৪১. আবদুল মতিন মিয়ার সঙ্গে আলাপচারিতা।
৪২. ওই।
৪৩. ওই।
৪৪. বাদল খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৪৫. কাজী আরেফ আহমেদের সঙ্গে আলাপচারিতা; চট্টগ্রামের দলীয় সূত্রে পাওয়া।

অভ্যুত্থান

১৯৭৫ সালের ৭ জুন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান এক আদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের (বাকশাল) গঠনতন্ত্র ও সাংগঠনিক কাঠামো ঘোষণা করেন। বাকশালের পনেরো সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটি এবং ১১৫ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। কার্যনির্বাহী কমিটির মধ্যে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ, এ এইচ এম কামারুজ্জামান, আবদুল মালেক উকিল, মহিউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, মনোরঞ্জন ধর, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, জিল্লুর রহমান, শেখ ফজলুল হক মনি, আবদুর রাজ্জাক, শেখ আবদুল আজিজ ও গাজী গোলাম মোস্তফা। বাকশালের পাঁচটি অঙ্গসংগঠন ও সেগুলোর সাধারণ সম্পাদকের নামও ঘোষণা করা হয়। জাতীয় কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে ফণীভূষণ মজুমদার, জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে অধ্যাপক ইউসুফ আলী, জাতীয় যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক পদে তোফায়েল আহমেদ, জাতীয় মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে বেগম সাজেদা চৌধুরী এবং জাতীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক পদে শেখ শহিদুল ইসলামকে নিয়োগ করা হয়।

সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষের মধ্যে বাকশালে যোগ দেওয়ার ধুম পড়ে যায়। এর আগে ২৩ মে ঢাকার ২২৪ জন সাংবাদিক, ২ জুন ঢাকার দুজন পত্রিকা সম্পাদক এবং ৪ জুন আরও ৩০২ জন সংবাদপত্রসেবী বাকশালে যোগ দেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। ৮ জুলাই বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির ৫৫ জন নেতাকে নিয়ে সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাওলানা খন্দকার নাসির উদ্দিন বাকশালে যোগ দেওয়ার জন্য বাকশালের সেক্রেটারি

জেনারেল ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর কাছে আবেদন করেন। আবেদনপত্রে আরও ৪৯ হাজার ৫১ জন মাদ্রাসাশিক্ষকের নাম ছিল। ২৫ জুলাই ২০ জন ম্যাজিস্ট্রেট, ২৬ জুলাই ন্যাপের (ভাসানী) ১৬ জন নেতা-কর্মী এবং ২৮ জুলাই ১ লাখ চতুর্থ শ্রেণির সরকারি কর্মচারী বাকশালে যোগ দেওয়ার জন্য আবেদন করেন। ১ আগস্ট আবদুর রেজা খানের নেতৃত্বে ঢাকা বার সমিতির ১৯৩ জন, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এইচ এম কামাল উদ্দিনের নেতৃত্বে ওই ব্যাংকের ৪১২ জন, বাংলাদেশ বিমানবন্দর উন্নয়ন সংস্থার ৩ হাজার ৩৩১ জন এবং বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থার ১৫৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী বাকশালে যোগ দেওয়ার জন্য আবেদন করেন। ২ আগস্ট আজাদ সুলতানের নেতৃত্বে ন্যাপের (ভাসানী) ৪৫০ জন নেতা-কর্মী ঢাকার সার্কিট হাউস রোডে বাকশালের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গিয়ে দলের অন্যতম সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মনির কাছে বাকশালে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা জানিয়ে আবেদনপত্র জমা দেন।[১]

একদলীয় ব্যবস্থা চালু করার কারণ ব্যাখ্যা করে শেখ মুজিব ১৯ জুন বঙ্গভবনে বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সভায় এক বক্তৃতায় বলেন:

> আমরা এই সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করলাম কেন? এই যে আমাদের সমাজ এখানে দেখতে পাই—আমি অনেক চিন্তা করেছি,...আমার দেশের বিশ পার্সেন্ট লোক শিক্ষিত।...কিন্তু একচুয়াল যেটা পিপল, তাদের সবাইকে একতাবদ্ধ না করতে পারলে সমাজের দুর্দিনে দেশের মঙ্গল হতে পারে না। সে জন্য আমরা চিন্তা করলাম, সমাজের যেখানে যিনি আছেন, তিনি বুদ্ধিজীবী হন, ডাক্তার হন, ইঞ্জিনিয়ার হন, সরকারি কর্মচারী হন, রাজনীতিবিদ হন, লইয়ার হন, আর যা-ই হন—কারণ, আমার সমাজে তো শতকরা বিশজনের বেশি শিক্ষিত নন, এদের মধ্যে সমস্ত লোককে একতাবদ্ধ করে দেশের মঙ্গলের জন্য যদি এগিয়ে যেতে না পারি, তবে দেশের মঙ্গল করা কষ্টকর হবে। সে জন্য নতুন সিস্টেমের কথা বহুদিন পর্যন্ত চিন্তা করেছি। আমার মনে হয়, বাংলাদেশবাসী এটাকে গ্রহণ করেছে, এবং ভালোভাবেই গ্রহণ করেছে।
>
> আরেকটা জিনিস আমি মার্ক করলাম। সেটা হলো এই যে, একদল বলে, আমরা পলিটিশিয়ান, একদল বলে আমরা ব্যুরোক্র্যাট। তাদের অ্যাটিচুড হলো হাউ টু ডিসক্রেডিট দ্য পলিটিশিয়ান। পলিটিশিয়ানরা তাঁদের স্ট্রেংথ দেখানোর জন্য বলতেন যে, অলরাইট, গেট আউট। এই নিয়ে সমস্ত দেশ একটা ভাগ ভাগ অবস্থার মধ্যে থাকত। এই সন্দেহটা দূর করা দরকার। এবং দূর করে—সকলেই যে এক এবং সকলেই যে

দেশকে ভালোবাসে এবং মঙ্গল চায়, এটা প্রমাণ করতে হবে। আমার সমাজে যে সমস্ত গুণী-জ্ঞানী লোক আছেন ও অন্য ধরনের যত লোক আছেন, তাঁদের নিয়ে আমার একটা পুল করা দরকার। এই পুল আমি করতে পারি, যদি আমি নতুন একটা সিস্টেম চালু করি এবং একটা নতুন দল সৃষ্টি করি—জাতীয় দল, যার মধ্যে একমত, একপথ, একভাব হয়ে দেশকে ভালোবাসা যায়। যারা দেশকে ভালোবাসে, তারা এসে একতাবদ্ধ হয়ে দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যেতে পারে। এ জন্য আজকে এটা করতে হয়েছে।[২]

সিরাজুল আলম খান কলকাতা থেকে পঁচাত্তরের জুলাই মাসের মাঝামাঝি ঢাকায় আসেন। হিলি সীমান্ত পার হওয়ার সময় বিডিআরের সদস্যরা তাঁকে আটক করেন। পরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে পরিচয় নিশ্চিত হয়ে একজন কর্মকর্তা তাঁকে বাহাদুরাবাদ পর্যন্ত পৌঁছে দেন। জুলাইয়ের শেষ দিকে তিনি আবার ভারতে চলে যান। তাঁর ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছিল। তিনি ভিসা নবায়নের জন্য কলকাতায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করেন। ১২ আগস্ট তাঁকে জানানো হয়, তাঁর পাসপোর্ট বাংলাদেশ সরকার বাতিল করে দিয়েছে। তিনি এখন 'পারসন নন গ্রাটা' বা অবাঞ্ছিত ব্যক্তি।[৩]

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন—এরকম একটি কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল। এ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ধোয়ামোছার কাজ চলছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন এমএ দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষা চলছিল। ছাত্র-শিক্ষক সবাই ব্যস্ত।

বিপ্লবী গণবাহিনীর ঢাকা নগর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা বেশ তৎপর হয়ে ওঠে। শেখ মুজিবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন উপলক্ষে একটা শক্তির মহড়া দেওয়ার চিন্তা করা হয়। কিন্তু তেমন কোনো বিক্ষোভ বা মিছিলের পরিকল্পনা করা যায়নি।

চুয়াত্তরের নভেম্বরে বোমা বানাতে গিয়ে নিখিল নিহত হয়েছিলেন। তাঁর নামে ওই বোমার নামকরণ হয় 'নিখিল'। আগেই বলা হয়েছে, 'নিখিলে'র প্রস্তুতপ্রণালি ছিল খুবই স্থূল। ঢাকা নগর গণবাহিনীর কমান্ডার আনোয়ার হোসেন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের লেকচারার। তিনি 'নিখিল' ইমপ্রুভাইজ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর শেখ মুজিবের আগমন যাতে নির্বিঘ্ন না হয়, সে জন্য আনোয়ারের নির্দেশে গণবাহিনীর সদস্যরা ১৪ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তিনটি 'নিখিল' ফাটায়। এগুলো ছিল টাইম বোমা। আনোয়ারের সরবরাহ করা এই বোমাগুলোর একটি

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কাছে, একটি সায়েন্স অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ের চত্বরে এবং আরেকটি কার্জন হলের সামনে রেখে দিয়েছিলেন গণবাহিনীর সদস্যরা। দুপুর ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে এগুলোর বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এর ফলে কিছু হুড়োহুড়ি ও হইচই হয়। তবে তা ছিল ক্ষণস্থায়ী।[৪]

১৫ আগস্ট ভোরবেলা ঢাকা শহরের অনেক অধিবাসীর ঘুম ভাঙে গোলাগুলির আওয়াজে। দিনটি ছিল ৩০ শ্রাবণ, শুক্রবার। রেডিওতে ঘোষণা শোনা যাচ্ছিল : 'আমি মেজর ডালিম বলছি। স্বৈরাচারী শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। সারা বিশ্বে কারফিউ জারি করা হয়েছে।' উত্তেজনার বশে ডালিম 'সারা বিশ্বে' কারফিউ জারি করে দিলেন! তিনি ঘোষণা শেষ করলেন 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' বলে। ঢাকা বেতারে প্রায় ৪৪ মাস পরে আবার 'জিন্দাবাদ' ধ্বনি শোনা গেল।

দুপুরের মধ্যে নগরবাসী জেনে গেলেন শেখ মুজিব, তাঁর ভগ্নিপতি ও মন্ত্রিসভার সদস্য আবদুর রব সেরনিয়াবাত এবং শেখ ফজলুল হক মনির বাড়িতে সামরিক বাহিনীর কতিপয় সদস্য ভোররাতে হামলা করেছে এবং যাঁকে পেয়েছে তাঁকেই হত্যা করেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় অনেকেই শোকাহত, অনেকেই খুশিতে ডগমগ। রাস্তায় বেরিয়ে অনেকেই জটলা করছেন, এই ঘটনা নিয়ে কথাবার্তা বলছেন। এর আগে কয়েক মাস ধরে 'এক নেতা এক দেশ/ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'—এই স্লোগান দিয়ে বাকশালের সদস্য হওয়ার জন্য অনেকেই ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে আওয়ামী লীগের নেতাদের কাছে ধরনা দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৫ আগস্ট ঢাকা শহরের রাস্তায় শেখ মুজিবের জন্য প্রকাশ্যে আফসোস করার মতো মানুষ তেমন খুঁজে পাওয়া যায়নি। নিয়মিত রোজনামচা লেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন একজন শিক্ষক ছিলেন বাংলা বিভাগের আহমদ শরীফ। শেখ মুজিব সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ছিল :

> শেখ মুজিবের সাড়ে তিন বছরের দুঃশাসন হত্যা-লুণ্ঠনের বিভীষিকা মুজিবকে গণশত্রুতে পরিণত করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার আন্তর্জাতিক রাজনীতির স্বার্থে সে সুযোগে তাঁকে হত্যা করায় সপরিবারে।[৫]

ধীরে ধীরে ১৫ আগস্টের ঘটনার বিবরণ প্রকাশ হতে থাকল। জানা গেল, সেনাবাহিনীর একদল জুনিয়র অফিসার এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছেন। তাঁদের নেতা মেজর ফারুক রহমান ও মেজর খন্দকার আবদুর রশিদ। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন আরও কয়েকজন মেজর, ক্যাপ্টেন, লেফটেন্যান্ট ও জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার। তাঁদের কয়েকজন ইতিপূর্বে সেনাবাহিনী থেকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বরখাস্ত হয়েছিলেন। এই দলের অন্যতম ছিলেন ক্যাপ্টেন

বজলুল হুদা। পরে তাঁকে মেজর পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। হুদা ১৯৬৫-৬৭ সালে ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলেন। তখন তিনি ছাত্রলীগ করতেন। উচ্চমাধ্যমিক পাস করার পর ১৯৬৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন। ছাত্র থাকাকালে তিনি সেনাবাহিনীর ক্যাডেট হিসেবে যোগ দেন। তাঁর কলেজজীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের একজন ছিলেন আবদুল বাতেন চৌধুরী। বাতেন ছিলেন জাসদের ঢাকা নগর পার্টি ফোরামের সদস্য। তিনি মুহসীন হলের ৩-এ নম্বর কক্ষে থাকতেন। হুদা বাতেনের রাজনৈতিক পরিচয় সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। বাতেন স্কুলজীবন থেকেই ছাত্রলীগের সদস্য এবং ১৯৭২-৭৩ সালে এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর স্মৃতিচারণা থেকে এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

> পঁচাত্তরের ১৩ আগস্ট বিকেল তিনটায় সেনা গোয়েন্দা দপ্তরের (ডিএমআই) ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা অসামরিক পোশাকে মুহসীন হলে আমার কক্ষে এল। সে ঢাকা শহরের দায়িত্বে ছিল। আমরা সূর্য সেন হলের ক্যানটিনে গিয়ে চা খেলাম এবং তারপর রেজিস্ট্রার ভবনের সামনে একটা গাছের নিচে ঘাসের ওপর বসলাম। তারপর শুরু হলো কথাবার্তা।
>
> হুদা : তোরা যেভাবে চেষ্টা করছিস, তাতে কিছু হবে না। লেট আস ইউনাইট অ্যান্ড গিভ হিম আ ব্লো।
>
> বাতেন : ইউনাইট হতে পারি, কিন্তু ব্লো দিতে পারব না। আমরা বিপ্লবে বিশ্বাস করি। তুমি যা বলছ, সে পথ আমাদের নয়।

এভাবে কিছুক্ষণ কথা বলার পর সন্ধ্যা হয়ে এল। তাঁরা দুজন বলাকা বিল্ডিংয়ের দোতলার একটা চায়নিজ রেস্তোরাঁয় খাবার খেলেন। হুদা চলে যাওয়ার সময় বাতেনকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, 'কাল-পরশু দুদিন হলে না থাকাই ভালো। বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন। নানা ধরনের চাপ থাকবে। রাতে বাইরে থাকিস।' হুদা বাতেনকে যোগাযোগের জন্য একটা টেলিফোন নম্বর দিলেন।

বাতেন সে রাতে মুহসীন হলেই ছিলেন। ১৪ আগস্ট তিনি আজিমপুর কলোনিতে তাঁর বোনের বাসায় যান এবং সেখানেই রাত কাটান।

১৫ আগস্ট সকালে ঘুম ভাঙতেই রেডিওতে তিনি অভ্যুত্থানের সংবাদ পান। তিনি হেঁটে হেঁটে নিউ মার্কেট-নীলক্ষেতের মোড়ে বিউটি রেস্টুরেন্টে যান এবং সেখানে নাশতা করেন। তারপর মুহসীন হলের দিকে রওনা হতেই দেখলেন, বেশ কয়েকজন ছাত্র ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছেন। তাঁরা অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত। বাতেন এঁদের মধ্যে ফকির গোলেদার রহমানকে দেখলেন। গোলেদার মনোবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র এবং সরকার-সমর্থিত ছাত্রলীগের একজন নেতা গোছের ছিলেন। তাঁর পরনে লুঙ্গি এবং গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি।

গোলেদার বললেন, তিনি হলের গ্রিলবিহীন জানালা দিয়ে হল অফিসের একতলার ছাদে লাফিয়ে নেমেছেন এবং এখন যত দূরে সম্ভব চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। বাতেনকে তিনি বললেন, 'আমারে মাপ কইরা দিস।'

বাতেন মুহসীন হলে তাঁর কক্ষে গেলেন। তিনি সেখানে জাহাঙ্গীর ও রুবেলকে পেলেন। ওঁরা দুজনই সরকার-সমর্থিত ছাত্রলীগের কর্মী এবং ওই কক্ষেই থাকতেন। বাতেন বললেন, 'তোরা আমার বোনের বাসায় চলে যা।' তিনি নিজেই তাঁদের আজিমপুরে বোনের বাসায় নিয়ে এলেন।

বেলা ১১টার দিকে বজলুল হুদা বাতেনের বোনের বাসায় এসে হাজির হলেন। তিনি বাতেনকে নিয়ে বেরোলেন। তিনি নিজেই একটা জিপ চালাচ্ছিলেন। জিপের পেছনে একটা পিকআপে কয়েকজন সেপাই। হুদা বললেন, 'জাসদের সাপোর্ট দরকার, এটার ব্যবস্থা করো।' বাতেন বললেন, 'জাসদ সাপোর্ট দেবে না। জাতীয় ঐক্যের চেষ্টা করো। তাজউদ্দীনকে আনো, রাজ্জাককে আনো।'

হুদা বাতেনকে নিয়ে গণভবনের পেছনে একটা সেনা ক্যাম্পে গেলেন। সেখানে একটা ক্যানটিনে তাঁরা পরোটা-মাংস খেলেন। তারপর বাতেনকে আসাদ গেটের কাছে নামিয়ে দিয়ে তাজউদ্দীনের বাসার দিকে রওনা হলেন। হুদা পরে তাজউদ্দীনের বাসায় তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বাতেনকে বলেছিলেন। তাজউদ্দীনকে হুদা সরকার গঠনের অনুরোধ জানালে তাজউদ্দীন জবাবে বলেছিলেন, 'শেখ মুজিবের রক্তের ওপর দিয়ে হেঁটে আমি প্রধানমন্ত্রী-প্রেসিডেন্ট হতে চাই না।'

বাতেনকে হুদা মুজিব হত্যার বিবরণ দিয়েছিলেন। তাঁর ভাষ্যমতে, ধানমন্ডিতে শেখ মুজিবের বাড়িতে ওরা আক্রমণ চালায় মেজর (অব.) নূরের নেতৃত্বে। গোলাগুলির শব্দ শুনে শেখ কামাল বেরিয়ে আসেন। তিনি প্রথমে গুলি ছোড়েন। হুদা তৎক্ষণাৎ কামালকে গুলি করে হত্যা করেন। গোলাগুলির শব্দ শুনে শেখ মুজিব ওপর থেকে চিৎকার করে তাঁদের গোলাগুলি থামাতে বলেন। তিনি বলেন, 'তোমাদের কোনো কিছু বলার থাকলে ওপরে এসে আমাকে বলো।' হুদারা তখন দোতলায় ওঠেন। শেখ মুজিবকে দেখে হুদা স্যালুট দেন। রাষ্ট্রপতিকে সামনাসামনি দেখে ভয়ে ও উত্তেজনায় তাঁর পা কাঁপছিল। সাহস সঞ্চয় করে হুদা বলেন, 'আমরা আপনাকে নিতে এসেছি। আমাদের সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে।' শেখ মুজিব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, 'কোথায় যাব? কেন যাব? না, আমি যাব না।' হুদা সাহস সঞ্চয় করে বলেন, 'আপনাকে যেতেই হবে।' তিনি শেখ মুজিবের গলার কাছে রিভলবারের নল ঠেকালেন। শেখ মুজিব বললেন, 'ঠিক আছে, আমি একটু চেঞ্জ করে আসি।' তাঁর পরনে লুঙ্গি। হুদা সময় নষ্ট করতে রাজি ছিলেন না। বললেন, 'এ

পোশাকেও আপনি বঙ্গবন্ধু, চেঞ্জ করলেও বঙ্গবন্ধুই থাকবেন। পোশাক বদলানোর দরকার নেই।' মুজিব তাঁদের সঙ্গে যেতে রাজি হলেন। বললেন, 'দাঁড়াও, আমার পাইপ আর তামাক নিয়ে আসি।' এই বলে তিনি তাঁর ঘরে গেলেন এবং পাইপ নিয়ে বেরিয়ে এলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছালে পেছন থেকে একজন একটা গামছা বের করে শেখ মুজিবের চোখ বাঁধতে যান। শেখ মুজিব হাত দিয়ে এক ঝটকায় তাঁকে সরিয়ে দেন। হাতের আঘাত থেকে বাঁচতে হুদা হাঁটু মুড়ে বসে পড়েন। তখন হুদার পেছন থেকে শেখ মুজিবের ওপর ব্রাশফায়ার করা হয়। শেখ মুজিব ঘটনাস্থলেই নিহত হন। অন্যরা এ সময় দোতলায় গিয়ে বাড়ির সবাইকে হত্যা করেন। 'অপারেশন' শেষ করে ফেরার সময় হুদা কামালের টয়োটা গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে আসেন এবং সেনানিবাসে তাঁর মেসের সামনে রেখে দেন।

বাতেন হুদাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তাঁকে তোমরা কোথায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলে?' হুদা বলেছিলেন, 'রেডিও স্টেশনে। সেখানে তাঁকে অ্যানাউন্সমেন্ট দিতে হতো, "বাকশাল বাতিল করা হয়েছে, খন্দকার মোশতাককে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।" হুদা আরও বলেছিলেন, 'আমি জানতাম না, তাঁকে মেরে ফেলার কোনো পরিকল্পনা ছিল। আমার অ্যাসাইনমেন্ট ছিল, তাঁকে ধরে রেডিও স্টেশনে নিয়ে যাওয়া।' বাতেন জানতে চেয়েছিলেন, 'তোমরা তো তাঁকে পেয়েছিলেই, অন্যদের মারতে গেলে কেন?' হুদার জবাব ছিল, 'শেখ মুজিবকে মেরে ফেলার পর আমরা আর কোনো সাক্ষী রাখতে চাইনি।'[৬]

শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের আকস্মিকতায় অনেকেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে তেমন উত্তেজনা লক্ষ করা যায়নি। হুদা বাতেনকে বলেছিলেন, এরকম একটা ঘটনা দু-একজন ব্যতিক্রম ছাড়া সবার কাম্য ছিল। শুধু দুটো বিষয়ে তাঁদের অনেকের অজ্ঞতা ছিল। প্রথমত, ঘটনাটি কবে ঘটানো হবে এবং দ্বিতীয়ত, শেখ মুজিবকে হত্যা করা হবে কি না। রশিদ-ফারুকের পরিকল্পনায় এই অভ্যুত্থানে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা সবাই হত্যা পরিকল্পনার কথা জানতেন না। অপারেশনে কার কী ভূমিকা, তা রশিদ-ফারুক ঠিক করে দেন।[৭]

মেজর নূর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন গ্রুপ) সদস্য ছিলেন। পরে তিনি সর্বহারা পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। সিরাজ শিকদারের নিহত হওয়ার ঘটনায় তিনি ক্ষুব্ধ হন। ১৫ আগস্টের কয়েক দিন পর সর্বহারা পার্টির কয়েকজন নেতা কলাবাগান বাসস্ট্যান্ডের পাশে একটা বাসায় সন্ধ্যাবেলা বৈঠক করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিন,

আকা ফজলুল হক ও মহসীন আলী। তাঁরা নূর ও ডালিমকে ডেকে পাঠান। নূর একাই এসেছিলেন। শেখ মুজিবের পরিবারের সবাইকে হত্যা করার বিষয়ে জানতে চাইলে নূর বলেন, 'ওরা আমার নেতাকে খুন করেছে, আমি সবাইকে মেরে প্রতিশোধ নিয়েছি।' নূরের উদ্ধত আচরণে এবং নৃশংসতার পরিচয় পেয়ে জিয়াউদ্দিন ক্ষুব্ধ হন।[৮]

১৫ আগস্টের পর ফারুক, রশিদ ও ডালিমকে লে. কর্নেল হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। অনেক দিন পর বনানী ডিওএইচএসে কর্নেল ফারুকের বাসায় ফারুক ও রশিদের সঙ্গে আলাপ করার সময় আকা ফজলুল হককে রশিদ বলেছিলেন :

> শেখ মুজিবকে রেখে ক্যু করা যাবে কি না, তা নিয়ে আমরা অনেক ভেবেছি। দেখলাম, তা সম্ভব নয়। রক্ষীবাহিনীর চিফ ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামানকে আগেই দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়। মুজিব পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের হত্যা করার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। সিদ্ধান্তটি অভিযানে অংশগ্রহণকারীরা তাৎক্ষণিকভাবে নিয়েছিল।[৯]

মুজিব হত্যার পরিকল্পনায় বিমানবাহিনীর কয়েকজন কর্মকর্তার অংশ নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরে তাঁদের বাদ দিয়েই এই অপারেশন চালানো হয়। এরকম একটা 'অ্যাডভেঞ্চারে' শরিক হতে না পেরে তাঁরা মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। এর প্রকাশ ঘটেছিল নভেম্বরে।[১০]

হুদার সঙ্গে কথাবার্তায় বাতেনের মনে হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব আছে। সবাই সবটা জানেন না। যাঁরা এ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একটা বিষয়ে মতৈক্য ছিল। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে তাঁদের অনেকের ব্যক্তিগত ক্ষোভও ছিল।[১১]

কর্নেল তাহের সম্ভবত জানতেন না, ১৫ আগস্ট তারিখটিই অভ্যুত্থানের জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে। তবে এরকম একটা ঘটনা যে ঘটতে পারে, তা তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। কোটি টাকার প্রশ্ন ছিল, কবে, কখন? শেখ মুজিবের সরকারকে উৎখাতের জন্য তাহেরের নিজস্ব পরিকল্পনা ছিল। শেখ মুজিবের প্রতি তাঁর ক্ষোভ ছিল অপরিসীম। তাহের মনে করতেন, 'মুজিব সরকার সেনাবাহিনীর উন্নয়নে চরম অবহেলা দেখিয়েছে এবং রক্ষীবাহিনীর মতো একটা কুখ্যাত আধা সামরিক বাহিনী তৈরি করেছে। তিনি সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। যুদ্ধের সময় ভারতের সঙ্গে করা গোপন চুক্তির ব্যাপারেও তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বাহাত্তর সালের নভেম্বরেই এসব ঘটেছিল এবং এ কারণেই লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিন এবং তিনি যাঁর যাঁর

রাজনৈতিক লাইন বেছে নিয়েছিলেন। অবশ্য তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় করতেন।' বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাহেরের পর্যবেক্ষণ ছিল সোজাসাপটা: 'পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত আওয়ামী লীগের ভূমিকা সবারই জানা, কীভাবে একটির পর একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হয়েছিল, কীভাবে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়েছিল। আমাদের সমস্ত লালিত আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও মূল্যবোধ একের পর এক ধ্বংস করা হয়েছিল। গণতন্ত্রকে কবর দেওয়া হয়েছিল অত্যন্ত নোংরাভাবে। জনগণকে পদদলিত করে জাতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্র।' ছিয়াত্তরে তাহের ও অন্যদের বিচারের সময় ট্রাইব্যুনালে দেওয়া জবানবন্দিতে তাহের এসব কথা উল্লেখ করেন। শেখ মুজিব সম্পর্কে তাহেরের মূল্যায়ন ছিল এরকম:

> শেখ মুজিব জনগণের নেতা ছিলেন। অস্বীকার করার অর্থ হবে সত্যকে অস্বীকার করা। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তাঁর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার জনগণের ওপরই বর্তায়। জনগণের জন্য সঠিক পথ হবে জেগে ওঠা এবং প্রতারণার দায়ে মুজিবকে উৎখাত করা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে জনগণ মুজিবকে নেতা বানিয়েছে, তারাই একদিন স্বৈরাচারী মুজিবকে ধ্বংস করবে। জনগণ কাউকে ষড়যন্ত্র করার অধিকার দেয়নি।[১২]

আওয়ামী লীগ-বাকশালের বাইরে ওই সময় সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল ছিল জাসদ। জাসদের প্রধান নেতা সিরাজুল আলম খান তখন দেশে নেই। দলে একাধিক 'কেন্দ্র'। গণবাহিনীর ইউনিটগুলো বিভিন্ন জেলায় মোটামুটি স্বাধীনভাবে কাজ করছে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই হকচকিত, বিহ্বল। জাসদের মধ্যে যাঁরা ষাটের দশকের রাজনৈতিক সংগ্রামের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন, ১৫ আগস্টের মতো একটা ঘটনা ঘটতে পারে, এটা তাঁরা কখনো চিন্তা করেননি।

১৫ আগস্ট সকালে ঢাকা নগর গণবাহিনীর সদস্য মীর নজরুল ইসলাম বাচ্চুর সঙ্গে তিতুমীর কলেজের সহসভাপতি কামালউদ্দিন আহমদ, আবদুল্লাহ আল মামুন, ওয়াহিদুল ইসলাম সুটুল, নওশের ও রতন ধানমন্ডিতে তাজউদ্দীনের বাসায় যান। কামালের বাড়ি ঢাকার কাপাসিয়া থানায়। তাঁর বড় ভাই নৌবাহিনীর প্রাক্তন লিডিং সি-ম্যান সুলতানউদ্দিন আহমদ আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত এবং জাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক ছিলেন। তাজউদ্দীনের সঙ্গে তাঁর পূর্বপরিচয় ছিল এবং একই এলাকায় বাড়ি বলে তাঁদের মাঝেমধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হতো।

তাজউদ্দীনের বাসায় গিয়ে তাঁরা শুনলেন, তিনি গোসল করছেন। তাঁরা বাইরের ঘরে অপেক্ষা করতে থাকলেন। মিনিট দশেক পর তাজউদ্দীন এলেন। পরনে একটা পায়জামা, গায়ে হাতাওয়ালা গেঞ্জি। সিলিং ফ্যানের নিচে দাঁড়িয়ে দুই হাতের আঙুল দিয়ে ব্যাকব্রাশের মতো ভঙ্গিতে চুল থেকে পানি ঝরাচ্ছিলেন। পানির ঝাপটা কামালের চোখে-মুখে এসে লাগছিল।

তাজউদ্দীন উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকলেন, 'বোকার দল—লাল বাহিনী বানায়, নীল বাহিনী বানায়। কোনো বাহিনী তাঁকে বাঁচাতে পারল?'

বাচ্চু বললেন, 'আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।' তাজউদ্দীন বললেন, 'কোথায় যাব? কেন তোমাদের সঙ্গে যাব?' বাচ্চু বারবার বলছিলেন, 'যেতেই হবে।'

তাজউদ্দীন কামালকে বললেন, 'নান্নু, এটা কারা করল? রাইটিস্টরা না লেফটিস্টরা? লেফটিস্টরা হলে আমাকে আর জীবিত রাখবে না।' নান্নু কামালের ডাকনাম। তাজউদ্দীন তাঁকে এই নামেই ডাকতেন। লেফটিস্ট বলতে তিনি পিকিংপন্থীদের বোঝাচ্ছিলেন। বাচ্চুর কথার জবাবে তিনি বললেন, 'সিরাজ কোথায়? ও যদি বলে তাহলে যেতে পারি। তাকে নিয়ে আসো।' বাচ্চু বেরিয়ে গেলেন। আধঘণ্টা পর তিনি ফিরে এসে জানালেন, সিরাজুল আলম খান কোথায় আছেন, তা জানা যায়নি। বাচ্চু জানতেন না, তিনি দেশে নেই। অগত্যা তাজউদ্দীনকে ছাড়াই তাঁরা ফিরে এলেন।[১৩]

তাজউদ্দীনকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে এবং কেন, এটা বাচ্চু ছাড়া তাঁর অন্য সহযোগীরা জানতেন না। বাচ্চুর সঙ্গে যাওয়ার সময় কামালের মনে হয়েছিল, তাজউদ্দীনকে বোধ হয় কোনো নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হবে। ২৬ নভেম্বর ভারতীয় হাইকমিশনে একটি অভিযানে বাচ্চু নিহত হলে বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। এটা আর হয়তো কোনো দিনই জানা যাবে না যে কে বাচ্চুকে পাঠিয়েছিল এবং কী উদ্দেশ্যে।

১৫ আগস্ট সকালে মুহসীন হলের ছাত্র নূর মোহাম্মদ ঢাকা গণবাহিনীর উপপ্রধান আবুল হাসিব খানের কাছে ঢাকা নগর গণবাহিনীর কমান্ডার আনোয়ার হোসেনের একটা চিরকুট নিয়ে আসেন। চিরকুটে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের অফিসে ঢাকা নগর গণবাহিনীর জরুরি সভা হবে বলে উল্লেখ ছিল। সভা শুরু হলে আনোয়ার হোসেন উপস্থিত সবাইকে বলেন, 'ভাইজান (লে. কর্নেল আবু তাহের) সকালে রেডিও স্টেশনে গিয়েছিলেন। তিনি মেজর ডালিমকে বকাঝকা করে বলেছেন, '—র মেজর হয়েছ, এখন পর্যন্ত একটা মার্শাল ল প্রক্লেমেশন ড্রাফট করতে পারলে না।

জানো, কাল ইউনিভার্সিটিতে কারা বোমা ফাটিয়েছিল? দে আর মাই বয়েজ।'[১৪]

লে. কর্নেল আবু তাহের গোপনে গণবাহিনী গড়ে তুলছিলেন। ডালিম ও নূর তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। তাহের ও ডালিমের চিন্তাধারা ছিল একই রকম। তাহের ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানে সরাসরি অংশ নেননি। তবে ওই দিনই তিনি অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন।[১৫]

লে. কর্নেল আবু তাহের মেজর রশিদের অনুরোধে সকাল নয়টায় ঢাকা বেতারকেন্দ্রে যান। সেখানে তিনি খন্দকার মোশতাক আহমদ, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, মেজর ডালিম ও মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে দেখতে পান। অভ্যুত্থানকারীদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সশস্ত্র বাহিনীর তিন প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন তিনি। তিনি খন্দকার মোশতাককে পাঁচটি প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবগুলো ছিল :

১. অবিলম্বে সংবিধান বাতিল করতে হবে;
২. সারা দেশে সামরিক আইন জারি এবং এর প্রয়োগ করতে হবে;
৩. দলনির্বিশেষে সব রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিতে হবে;
৪. বাকশালকে বাদ দিয়ে একটি সর্বদলীয় জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে;
৫. অবিলম্বে একটি গণপরিষদ তথা পার্লামেন্টের জন্য সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।[১৬]

সামরিক শাসন জারির দাবি ছিল তাহেরের একান্ত নিজস্ব। এ বিষয়ে তিনি গণবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমান্ড কিংবা জাসদের পার্টি ফোরামের সঙ্গে আলোচনা করেননি এবং এসব প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য পার্টি তাঁকে কোনো ম্যান্ডেট দেয়নি। প্রকৃতপক্ষে এই প্রস্তাব ছিল জাসদের মূলনীতির সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। বিশেষ করে, সামরিক আইন জারির প্রস্তাবটি বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য থেকে গড়ে ওঠা যেকোনো সুস্থ রাজনৈতিক দলের জন্যই অপমানজনক এবং প্রগতিশীল রাজনীতির চেতনাবিরোধী। তাহের সব সময় শেখ মুজিবের 'ফ্যাসিবাদী' রাজনীতির বিরোধী ছিলেন এবং তাঁর সরকারের উৎখাত চাইতেন। জাসদও একই দাবি করেছে। কিন্তু জাসদ কখনোই দেশে সামরিক শাসন চায়নি।

খন্দকার মোশতাক আহমদ বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন। মেজর রশিদ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তাহেরকে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করেছিলেন। তাহের যখন দুপুরে বঙ্গভবনে পৌঁছান, ততক্ষণে শপথ অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। তাহের আগস্ট হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত মেজর রশিদসহ

একদা পরম সখা—শেখ মুজিব ও খন্দকার মোশতাক

সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং সকালে খন্দকার মোশতাককে দেওয়া তাঁর প্রস্তাবগুলো আবার উল্লেখ করেন। আলোচনার একপর্যায়ে তিনি সেনাবাহিনীর উপপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানকে ডেকে নেন। সবাই তাহেরের প্রস্তাবগুলো সময়োচিত বলে একমত হন।[১৭] দুই দিন পর সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নঈম জাহাঙ্গীর নারায়ণগঞ্জে তাহেরের বাসায় যান পরিস্থিতি সম্পর্কে আঁচ করতে। ১৯৭১ সালে নঈম ১১ নম্বর সেক্টরে তাহেরের সহযোদ্ধা ছিলেন এবং প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতেন। তাহের আক্ষেপ করে নঈমকে বললেন, ওরা বড় রকমের একটা ভুল করেছে। শেখ মুজিবকে কবর দিতে অ্যালাও করা ঠিক হয়নি। এখন তো সেখানে মাজার হবে। উচিত ছিল লাশটা বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেওয়া।[১৮]

১৫ আগস্টের পর গণবাহিনীর পক্ষ থেকে একটি লিফলেট প্রচার করা হয়। লিফলেটের শিরোনাম ছিল, 'খুনি মুজিব খুন হয়েছে—অত্যাচারীর পতন অনিবার্য।'

শেখ মুজিব যখন নিহত হন, সিরাজুল আলম খান তখন কলকাতার ভবানীপুরে রাজেন্দ্র প্রসাদ রোডে চিত্তরঞ্জন সুতারের বাড়িতে ঘুমিয়ে। সচরাচর তিনি বেলা ১১টা-১২টা পর্যন্ত ঘুমান। সকাল ১০টার দিকে সুতারের স্ত্রী মঞ্জুশ্রী দেবী তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে শেখ মুজিবের মৃত্যুসংবাদ দেন।

সিরাজুল আলম খান শেখ মুজিবকে জানতেন ১৯৬১ সাল থেকে। সুখে-দুঃখে বিপদে-আপদে তিনি শেখ মুজিবের ছায়াসঙ্গী ছিলেন ইতিহাসের একটা বিশেষ পর্বে, যখন বাংলাদেশ পাকিস্তানি উপনিবেশের জঠর থেকে জেগে উঠছে। বেগম মুজিবও তাঁর ওপর আস্থা রাখতেন। শেখ মুজিব যখন জেলে, বিশেষ করে ১৯৬৬-৬৯ সালে, বেগম মুজিবের মাধ্যমে শেখ মুজিব ও সিরাজের যোগাযোগ হতো। সিরাজ যে কথা শেখ মুজিবকে বলতে পারতেন না, সে কথা বেগম মুজিবকে দিয়ে বলাতেন। বেগম মুজিব যে কথা স্বামীকে বলতে পারতেন না, সিরাজকে দিয়ে তা বলাতেন। খবরটা শুনে সিরাজুল আলম খান হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন।

আওয়ামী লীগের অন্য নেতাদের শেখ মুজিবের প্রতি আনুগত্য যতটা ছিল, ততটা ভালোবাসা ছিল না। শেখ মুজিব এটা জানতেন এবং সিরাজুল আলম খানের ওপর নির্ভর করতেন। শেখ মুজিবের কাল্ট তৈরিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন সিরাজুল আলম খান। মুজিব তাঁকে একরকম ব্ল্যাংক চেক দিয়েছিলেন। এককথায় সিরাজ ছিলেন শেখ মুজিবের সবচেয়ে 'আস্থাভাজন শিষ্য'। এটাই ছিল সিরাজুল আলম খানের ক্ষমতার ভিত্তি। দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ায় দুজনই দুর্বল হয়ে পড়েন।

শেখ মুজিব নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে সিরাজুল আলম খান দুঃখ পেয়েছিলেন সন্দেহ নেই। তবে তিনি মনে করতেন, এটা ছিল অনিবার্য। শেখ মুজিব নিজেই এই পরিণতি ডেকে এনেছিলেন।[১৯]

রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেওয়ার পর খন্দকার মোশতাক আহমদ রাতে বেতার ও টেলিভিশনে একটি ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি অভ্যুত্থানের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন :

> এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এবং বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সঠিক ও সত্যিকারের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপদানের পূত-পবিত্র লক্ষ্যে সামগ্রিক ও সমষ্টিগতভাবে সম্পাদনের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা ও বাংলাদেশের গণমানুষের দোয়ার ওপর ভরসা করে রাষ্ট্রপতি হিসেবে সরকারের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়েছে। বাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের বজ্রকঠিন দায়িত্ব সম্পাদনের পথ সুগম করার জন্য বাংলাদেশের সেনাবাহিনী সত্যিকারের বীরের মতো অকুতোভয় চিত্তে এগিয়ে এসেছেন।...
>
> একটি বিশেষ শাসকচক্র গড়ে তোলার লোলুপ আকাঙ্ক্ষায় প্রচলিত মূল্যবোধের বিকাশ ও মানুষের অভাব-অভিযোগ প্রকাশের সব পথ রুদ্ধ

করে দেওয়া হয়। এই অবস্থায় দেশবাসী একটি শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে অব্যক্ত বেদনায় তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল।

দেশের শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন সব মহলের কাম্য হওয়া সত্ত্বেও বিধান অনুযায়ী তা সম্ভব না হওয়ায় সরকার পরিবর্তনের জন্য সামরিক বাহিনীকে এগিয়ে আসতে হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনী পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করে দেশবাসীর সামনে সম্ভাবনার এক স্বর্ণদ্বার উন্মোচন করেছেন। এখন দেশবাসী সব শ্রেণির মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে দ্রুত নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে নিষ্ঠার সঙ্গে কঠোরতম পরিশ্রম করতে হবে।[২০]

খন্দকার মোশতাক আহমদ সামরিক আইন জারি করেন। ২০ আগস্ট জারিকৃত এক আদেশে সামরিক আইন পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট সকাল থেকে কার্যকর হয়েছে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। এই আদেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদের বিধান স্থগিত করা হয় এবং ১৫ আগস্ট সকালে বলবৎ ছিল এমন সব আইন ও অধ্যাদেশ পরে সংশোধিত বা প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকার ঘোষণা দেওয়া হয়।[২১] মোশতাক সামরিক

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সেনাবাহিনীর উপপ্রধান জিয়াউর রহমান; ইতিহাস দুজনকেই ধারণ করেছে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে

আইন জারি করলেও নিজেকে বা অন্য কাউকে সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেননি এবং সংবিধান স্থগিত করেননি। জাতীয় সংসদও বহাল থাকে।

পঁচাত্তরের ২৪ আগস্ট সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল সফিউল্লাহকে সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। সেনা উপপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

১৫ আগস্টের কয়েক দিন পর সিরাজুল আলম খানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী রায়হান ফেরদৌস মধু কলকাতা যান। যাওয়ার আগে ছাত্রলীগের সভাপতি আ ফ ম মাহবুবুল তাঁকে একটা দায়িত্ব দেন, কলকাতায় 'সিরাজ ভাইকে যেন পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্রিফ করা হয়।' মধু কলকাতায় পৌঁছার তিন-চার দিন পর ভবানীপুরে চিত্তরঞ্জন সুতারের বাড়িতে সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর মনে হলো, 'সিরাজ ভাই খুবই কনফিউজড'। এর কিছুদিন পর সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আলাপ করে মধু ইংরেজিতে একটা চিঠির খসড়া তৈরি করেন। উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের তৎকালীন পরিস্থিতি ও জাসদের ভূমিকা উল্লেখ করে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি করা। চিঠিতে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কাছে সহযোগিতা চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছিল। তারপর মধু নয়াদিল্লি গেলেন এবং সেখানে বাংলাদেশ হাইকমিশনের কর্মকর্তা মো. কামালউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করলেন। কামালউদ্দিন একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হল ছাত্র সংসদের সহসভাপতি ও ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ছিলেন। তিনি বললেন, চিঠিটা তিনি চীনা দূতাবাসে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবেন। তারপর মধু কলকাতায় ফিরে আসেন।[২২]

৩০ আগস্ট রাষ্ট্রপতি 'রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধকরণ অধ্যাদেশ' জারি করেন। অধ্যাদেশে বলা হয়, কোনো ব্যক্তি কোনো রাজনৈতিক দল গঠন, প্রতিষ্ঠা বা আহ্বান করবেন না কিংবা কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হবেন না বা অন্য কোনোভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করবেন না বা কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত হবেন না। এই বিধান না মানলে তাঁকে সাত বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড দেওয়া যেতে পারে।[২৩] এই আদেশের ফলে সব ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রম প্রকারান্তরে নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

আওয়ামী লীগ/বাকশালের অনেক নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার হন, অনেকেই আত্মগোপনে যান। ভারতে চলে যান কেউ কেউ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, শেখ ফজলুর রহমান

মারুফ, ওবায়দুল কাদের, ইসমত কাদির গামা, রবিউল আলম মোক্তাদির চৌধুরী, মোহাম্মদ নাসিম, মোস্তফা মহসীন মন্টু, আনোয়ার চৌধুরী, শামসুদ্দিন মোল্লা, সিদ্দিক হোসেন, নুরুল ইসলাম ভান্ডারী, পীযূষ কান্তি ভট্টাচার্য, এস এম ইউসুফ, শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর, লতিফ সিদ্দিকী, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, খোকা রায়, এস এ মালেক প্রমুখ। আবদুল কাদের সিদ্দিকী তাঁর অনেক অনুসারীকে নিয়ে আগস্টের শেষের দিকে মেঘালয়ে চলে যান এবং সেখান থেকে মোশতাক সরকারের বিরুদ্ধে নানান তৎপরতা চালান।[২৪]

৩ অক্টোবর এক বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে খন্দকার মোশতাক আহমদ সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। ভাষণে তিনি বলেন,

> স্বাধীনতার পর অত্যন্ত সংগতভাবেই জাতি একটা গণতান্ত্রিক ও বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত সংবিধান আদায় করে নিয়েছিল।...সেই গণতন্ত্র সমুন্নত রাখার ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত নেতৃত্ব জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন এবং জনগণের আমানতকে খেয়ানত করলেন।...অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে জাতীয় সত্তাকে বা জাতির আত্মাকে মরণপণ সামনে এগোতে হলো এবং ১৫ আগস্টের নতুন সূর্যকে ছিনিয়ে আনতে হলো। সমগ্র জাতির অস্তিত্ব মুক্তিদাতার রূপ পরিগ্রহ করল সেনাবাহিনীর অসমসাহসী সূর্যসন্তানদের মধ্য দিয়ে। নতুন সূর্যরথের সারথি হয়ে আমাকে এগিয়ে আসতে হলো।...
>
> আমি ও আমার সরকার এবং গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের অধীনে নির্বাচিত সংসদ নির্ভেজাল পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।
>
> আমরা মনে করি, ধৈর্য, নিষ্ঠা, পরমতসহিষ্ণুতা এবং বিশ্বজনীন মূল্য ও মর্যাদাবোধের আলোকে রাষ্ট্রীয় চারটি মূলনীতির ভিত্তিতে সুখী, সমৃদ্ধ, কলুষমুক্ত ও গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব। তাই আজ লাইলাতুল কদরের পবিত্র রাতে করুণাময় আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহ ও দেশবাসীর শুভেচ্ছার ওপর নির্ভর করে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার আমি ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি। এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৭৬ সালের ১৫ আগস্ট থেকে রাজনৈতিক তৎপরতা ও কাজকর্মের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হবে এবং ১৯৭৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সার্বভৌম পার্লামেন্ট গঠন ও পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার কায়েমের জন্য দেশব্যাপী জাতীয় নির্বাচন ইনশা আল্লাহ অনুষ্ঠিত হবে।[২৫]

পঁচাত্তরের অক্টোবরে সিরাজুল আলম খান কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন। বাংলাদেশ তখন অনেকটাই বদলে গেছে।

তথ্যনির্দেশ

১. মিয়া, পৃ. ২৩১-২৪২।

২. *দৈনিক বাংলা,* ২০ জুন ১৯৭৫।

৩. সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।

৪. আবুল বারাকাত দুলালের সঙ্গে আলাপচারিতা।

৫. আহমদ শরীফের ডায়েরি: *ভাব-বুদ্বুদ* (২০০৯), সম্পাদনা নেহাল করিম, মোহম্মদ আজম ও খোরশেদ আলম। জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১৫৯।

৬. আবদুল বাতেন চৌধুরীর সঙ্গে আলাপচারিতা।

৭. ওই।

৮. আকা ফজলুল হকের সঙ্গে আলাপচারিতা।

৯. ওই।

১০. করপোরাল আবদুল মজিদের সঙ্গে আলাপচারিতা।

১১. আবদুল বাতেন চৌধুরীর সঙ্গে আলাপচারিতা।

১২. Lifschultz, Lawrence (1979). *Bangladesh: The Unfinished Revolution.* Zed Press, London, p. 86-87.

১৩. কামালউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে আলাপচারিতা।

১৪. আবুল হাসিব খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।

১৫. Khasru, p. 187.

১৬. Lifschultz, p. 86-88.

১৭. Lifschultz, p. 88.

১৮. নঈম জাহাঙ্গীরের সঙ্গে আলাপচারিতা।

১৯. সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।

২০. দৈনিক *ইত্তেফাক,* ১৬ আগস্ট ১৯৭৫।

২১. *The Bangladesh Gazette, Extraordinary, 10 August 1975*, p. 2413-4.

২২. রায়হান ফেরদৌস মধুর সঙ্গে আলাপচারিতা।

২৩. *The Bangladesh Gazette, Extraordinary, 30 August 1975*, p. 2565-6.

২৪. মিয়া, পৃ. ২৫৪।

২৫. *দৈনিক বাংলা,* ৪ অক্টোবর ১৯৭৫।

বিপ্লব

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের সঙ্গে ফারুক-রশিদের একটা ছোট গ্রুপ জড়িত ছিল। কিন্তু শেখ মুজিবের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল অনেক দিন ধরেই। গুটিকয়েক সেনা কর্মকর্তা বাদে অধিকাংশের মনেই সরকার উৎখাতের প্রবল ইচ্ছা ছিল বলে ধারণা করা হয়। ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান সেনা কর্মকর্তাদের বেশির ভাগেরই সমর্থন পায়।

কিন্তু মাত্র কয়েকজন জুনিয়র অফিসার বঙ্গভবনে বসে ছড়ি ঘোরাবে, এটা অন্যদের পছন্দ হয়নি। তাঁরা চেয়েছিলেন সত্যিকার অর্থেই একটি সেনাশাসন। খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে অন্য এক ধরনের আওয়ামী শাসনে তাঁদের ঘোরতর আপত্তি ছিল।

মেজর রশিদ এক সাক্ষাৎকারে ঢাকা সেনানিবাসের তৎকালীন স্টেশন কমান্ডার লে. কর্নেল হামিদকে বলেছিলেন, 'জিয়া এই সময় সরাসরি দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। আমি তাঁকে কত বোঝালাম, স্যার, আপনি এখনো অনেক ইয়াং। এখন আপনাকে প্রেসিডেন্ট মানাবে না। একটু অপেক্ষা করুন। এখন চিফ আছেন ভালোই আছেন। কিন্তু জিয়া অস্থির। অগত্যা আমি তাঁকে বলি, তাহলে স্যার, এটা আমি পারব না। আপনাকেই আপনার পথ করে নিতে হবে। আমি যত দূর পারি, আপনাকে সাহায্য করব।'[১]

লে. কর্নেল আবু তাহেরের আচরণ দেখে অনেক সময় মনে হতো, তিনি জিয়ার মুখপাত্র। ১৫ আগস্টের কুশীলবদের সঙ্গে তাহেরের যোগাযোগ থাকার বিষয়টা উঠে এসেছে ১৫ আগস্ট ১৯৮৩ ও ৭ নভেম্বর ১৯৮৩ *স্যাটারডে পোস্ট*-এ প্রকাশিত ফারুক রহমান ও আবদুর রশিদের সাক্ষাৎকারে। এক প্রশ্নের জবাবে তাঁরা বলেছিলেন :

১৫ই আগস্ট বিপ্লবের পর কর্নেল তাহের আমাদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা করতে আসেন। তিনি জিয়ার পক্ষ থেকে মোশতাককে অপসারিত করার প্রস্তাবও আমাদের দিয়েছেন। মোশতাকের পরিবর্তে আমরা যাতে জিয়াকে প্রেসিডেন্ট মনোনীত করি, সে ব্যাপারে কর্নেল তাহেরের পীড়াপীড়ির অন্ত ছিল না। এ ক্ষেত্রে জাসদ আমাদের সকল বাকশালী চর নিশ্চিহ্ন করার ক্ষেত্রে সহযোগিতারও আশ্বাস দেয়। আমরা তাহেরকে আরও বলেছি, জাসদ যদি জিয়াকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতে চায়, তাহলে জিয়াকে সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ব ছেড়ে নির্বাচনে অংশ নিতে হবে।[২]

সেনাবাহিনীতে 'চেইন অব কমান্ড' পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে অন্যরা সংগঠিত হতে থাকেন। এতে মূল ভূমিকা নিয়েছিলেন ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিল। তিনি নতুন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে সামনে রেখেই কাজটি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী :

অক্টোবর নাগাদ চিফ অব স্টাফ জিয়া অভ্যুত্থানকারী সেনা অফিসারদের বিশৃঙ্খল কার্যকলাপের গুরুতর অনুযোগ করলেন আমার কাছে। আমি তাঁকে বললাম, 'স্যার, আপনি চিফ, আপনি অর্ডার করলে আমি জোর করে এদের চেইন অব কমান্ডে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে পারি।' কিন্তু জিয়া ভুগছিলেন দোটানায়। তখন তিনি এক-পা এগোন তো দু-পা পিছিয়ে যান। মনে হলো চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারছেন না জিয়া। যা করার নিজেদেরই করতে হবে।[৩]

পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির নেতারা সামরিক গোয়েন্দা তথ্য পেতেন তাঁদের দলের সদস্য এবং ডিএফআইয়ের কর্মকর্তা মেজর জিয়াউদ্দিনের মাধ্যমে। তাঁরা জানতে পারলেন, নতুন করে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা হচ্ছে। সিরাজ শিকদারের মৃত্যুর পর সর্বহারা পার্টি অনেক অগোছালো হয়ে পড়েছিল, উপদলীয় কোন্দলে জড়িয়ে পড়েছিল। তাদের অন্যতম প্রধান নেতা লে. কর্নেল (অব.) জিয়াউদ্দিন কোনো রকম সামরিক অভ্যুত্থানের পক্ষে ছিলেন না। দলের বক্তব্য ছিল, 'অভ্যুত্থান হলে একই শ্রেণির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতা চালাচালি হবে। আমাদের তাতে কী লাভ আর জনগণেরই বা কী লাভ।'[৪] সেনাবাহিনীর মেজর ইকবাল কর্নেল জিয়াউদ্দিনের সাহায্য চাইলেন।

ইকবাল : এবার আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট মিলিটারি ক্যু করব। আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

জিয়াউদ্দিন : আমার মনে হয়, তোমরা সিচুয়েশন কন্ট্রোল করতে পারবে না। এই চেষ্টা বাদ দাও।

ইকবাল : আমরা পারব। আপনি আমাদের লিড দেন।

জিয়াউদ্দিন : ক্যু ফেল করলে এক্সটারনাল ইন্টারভেনশন হতে পারে, আমরা খড়কুটোর মতো ভেসে যাব।[৫]

২৮ অক্টোবর অভ্যুত্থানের কথা ছিল। পরে তারিখ বদলানো হয়। মেজর ইকবাল কর্নেল জিয়াউদ্দিনের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করে বললেন, 'আমাদের সঙ্গে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ থাকবেন।' জিয়াউদ্দিন বললেন, 'এটা ভেস্তে যাবে। সবাই এটাকে প্রো-ইন্ডিয়ান ক্যু হিসেবে দেখবে, তোমরা মারা পড়বে।' ইকবাল বললেন, 'আপনি হাফিজকে বোঝান।' মেজর হাফিজউদ্দিন আহমদ তখন ঢাকার ব্রিগেড মেজর। এটা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ। জিয়াউদ্দিন হাফিজকে চিঠি দিলেন, 'ডোন্ট গো ফর ক্যু।' কথা হলো, সর্বহারা পার্টির পক্ষ থেকে আকা ফজলুল হক ও মহসীন আলী শাফায়াত জামিলের কাছে যাবেন। মহসীন একাই গিয়েছিলেন। তেজগাঁও বিমানবন্দরের উল্টো দিকে 'হাবিব ফ্রুটস'-এর সামনে থেকে ইকবাল মহসীনকে শাফায়াত জামিলের কাছে নিয়ে যান। মহসীন শাফায়াতকে জিয়াউদ্দিনের লেখা একটা চিরকুট দেন। এতে লেখা ছিল, 'ডোন্ট প্রসিড' (আর এগোবে না)। এটা পড়ে শাফায়াত অট্টহাসি দিয়ে বললেন, 'জিয়াউদ্দিনের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।' মহসীন ফিরে এসে জিয়াউদ্দিনকে বললেন, 'মিশন ফেইলড।'

কোনো একটি সূত্র থেকে মেজর ডালিম অভ্যুত্থানের সম্ভাবনার কথা শুনেছিলেন। তিনি ইকবালকে বললেন, 'দোস্ত, তোমরা নাকি আমাদের বিরুদ্ধে কী সব করতাছ?' ইকবাল ভাবনায় পড়ে গেলেন, 'ডালিম জানল কীভাবে।'

মেজর ইকবাল আকা ফজলুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ করে বললেন, 'সর্বহারাদের মধ্যে কে কে জেলে আছে, তার একটা লিস্ট দেন।' আকা জেলে বন্দী দলের সদস্যদের একটা লিস্ট ইকবালের হাতে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এটাও ব্যাখ্যা করে বললেন ক্যু কেন ফেল করবে। 'ক্যু যেহেতু খন্দকার মোশতাকের বিরুদ্ধে, তখন মোশতাকের প্রতিপক্ষ জেলে আটক আওয়ামী লীগের অন্য নেতারা স্বাভাবিকভাবেই ছাড়া পাবেন এবং ক্ষমতা তাঁদের হাতেই যাবে।' ইকবাল বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন, 'অসম্ভব, এটা হবে না। আমরা ওদের খতম করে দেব।'[৬]

২ নভেম্বর রাতে ঢাকায় সামরিক অভ্যুত্থান হলো। সশস্ত্র বাহিনীতে 'চেইন অব কমান্ড' পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় ঢাকার ৪৬ ব্রিগেডের কমান্ডার কর্নেল

শাফায়াত জামিলের শক্তি ও সমর্থনের ওপর ভিত্তি করে। আগের দিন রক্ষীবাহিনীর প্রধান ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান এবং কর্নেল শাফায়াত সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের অফিসে বসে পরিকল্পনা করেন, ২ নভেম্বর দিবাগত রাত দুইটায় বঙ্গভবনে মোতায়েন ৪৬ ব্রিগেডের দুটি কোম্পানি সেনানিবাসে ফিরে আসবে। সেটাই হবে অভ্যুত্থান সূচনার ইঙ্গিত। পরিকল্পনা অনুযায়ী শুরু হলো কাজ। স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকতের মাধ্যমে বিমানবাহিনীর সহায়তা নিশ্চিত করা হয়।[৭] তাঁরা ৩ নভেম্বর ভোরে যুদ্ধবিমান ও হেলিকপ্টার উড়িয়েছিলেন। সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে তাঁর বাসভবনে অন্তরীণ করা হয়।

১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িতরা বঙ্গভবনেই থাকতেন। তাঁরা আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেন। জেনারেল ওসমানীর মধ্যস্থতায় আপসরফা হয়। রশিদ, ফারুক, ডালিমসহ ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের ১৫ জন কুশীলবকে বিমানে ব্যাংককে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় তাঁরা ঢাকা থেকে বিমানের একটা বিশেষ ফ্লাইটে ব্যাংকক চলে যান।

১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত 'মেজরদের' সঙ্গে লে. কর্নেল আবু তাহেরের যোগাযোগ ছিল। তবে ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের কোনোটার সঙ্গেই জাসদের সরাসরি সম্পৃক্ততা ছিল না। এই অভ্যুত্থানগুলো সংঘটিত হয়েছিল উঁচু পর্যায়ের সামরিক নেতৃত্বের মধ্যে ব্যক্তিগত বিরোধের কারণে। ১৫ আগস্ট সকালেই তাহের 'সফল বিপ্লবকে অভিনন্দন জানাতে' ঢাকা বেতার কেন্দ্রে গিয়েছিলেন। তাহের অবশ্য পরে বলেছিলেন, মেজর রশিদের অনুরোধে তিনি বেতার কেন্দ্রে যান। ৩ নভেম্বর বঙ্গভবনে প্রতিপক্ষ দুই গ্রুপের মধ্যে যখন আপস-আলোচনা চলছিল, তাহের সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 'মেজররা' ঢাকা ছেড়ে ব্যাংকক যাওয়ার সময় 'অন্যান্য দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী শক্তি, বিশেষ করে তাহের এবং গণবাহিনীর সঙ্গে উপযুক্ত সময়ে আরেকটি বিপ্লব ঘটানোর প্রত্যয়' ব্যক্ত করেছিলেন। আগস্ট হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সবাই ব্যাংকক যাননি। কয়েকজন তাহেরের সঙ্গে থেকে গিয়েছিলেন। ব্যাংকক যাওয়ার আগে তাঁরা একমত হন যে, খালেদ মোশাররফকে হটাতে পারলে তাঁরা জিয়াকে আবার সেনাপ্রধান বানাবেন এবং নির্বাসিত মেজরদের ঢাকায় ফিরিয়ে আনা হবে। 'মেজররা' তাহেরের সঙ্গে আলোচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেন।[৮] এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে তাঁদের বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। পঁচাত্তর ঘণ্টার মধ্যেই পালাবদল ঘটেছিল।

৪ নভেম্বর ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে একটা শোক মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে শেখ মুজিবের বাসভবনে যায়। মিছিলে খালেদ মোশাররফের ভাই আওয়ামী লীগের নেতা রাশেদ মোশাররফ এবং তাঁর মা অংশ নিয়েছিলেন। শহরে রটে যায়, 'আওয়ামী-বাকশালীদের' পক্ষে অভ্যুত্থান হয়েছে। ৪ তারিখেই জানা যায়, আগের দিন ভোরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও কামারুজ্জামানকে হত্যা করা হয়েছে।

খালেদ মোশাররফ বঙ্গভবনে দেনদরবার করতে থাকেন তাঁকে সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার জন্য। ৪ নভেম্বর খন্দকার মোশতাক তাঁকে মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে সেনাপ্রধান নিয়োগ করেন। ৫ নভেম্বর খালেদ মোশাররফ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এ এস এম সায়েমকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করলে তিনি রাজি হন। ৬ নভেম্বর বিচারপতি সায়েম খন্দকার মোশতাকের কাছ থেকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন এবং অভ্যুত্থানকারীদের পরামর্শ অনুযায়ী জাতীয় সংসদ বাতিল ঘোষণা করেন। বেতার ও টেলিভিশনে দেওয়া এক ভাষণে তিনি বলেন :

> ...গত ১৫ আগস্ট কতিপয় অবসরপ্রাপ্ত এবং চাকরিরত সামরিক অফিসার এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে হত্যা করে। জনাব মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে সামরিক আইন জারি করেন। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনার সঙ্গে সামরিক বাহিনী সংশ্লিষ্ট ছিল না।
>
> দেশবাসী আশা করছিল, দেশে আইনশৃঙ্খলা ফিরে আসবে, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে, কিন্তু আমরা সবাই নিরাশ হয়েছি। এমনকি সম্প্রতি কারাগারে অন্তরীণ কিছু বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।
>
> এ অবস্থায় সাবেক রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদ আমাকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। দেশকে চরম দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করার মহৎ উদ্দেশ্যে সক্রিয় সহায়তা দান করার জন্য আমি আমার দেশপ্রেমিক ও ঐতিহ্যবাহী সামরিক বাহিনীকে নির্দেশ দিচ্ছি।
>
> দেশে সামরিক আইন জারি রয়েছে। আমি একটি নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং ন্যূনতম সময়ের মধ্যে অবাধ, নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা। আমরা এই দায়িত্ব ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অথবা সম্ভব হলে তার পূর্বে পালন করতে বদ্ধপরিকর।...[৯]

খালেদ-শাফায়াতরা যে 'ভারতের দালাল' এবং তাঁদের অভ্যুত্থান যে 'আওয়ামী লীগের পক্ষে'—এরকম প্রচারণা থাকলেও তার কোনো ভিত্তি ছিল না। শাফায়াত জামিল যে আওয়ামী লীগের অনেক নেতার ওপর নাখোশ ছিলেন, বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান প্রযোজক মাহবুবুর রহমানের নিচের উক্তি থেকে এটা বেশ বোঝা যায় :

> কর্নেল শাফায়াত জামিল ৪ নভেম্বর থেকে প্রতিদিন বিকেলে রেডিও স্টেশনে আসতেন। বিশেষ সংবাদ বুলেটিনের স্ক্রিপ্ট তিনি দেখে অনুমোদন দিলেই তা প্রচার করা হতো। একদিন আমি স্ক্রিপ্টের খসড়া নিয়ে তাঁর কাছে যাচ্ছিলাম। শুনলাম, তিনি চিৎকার করে কাউকে বলছেন, 'মনি ইজ আ বাস্টার্ড। হি ইজ দ্য রুট অব অল ইভিলস (মনি একটা বেজন্মা, সে হচ্ছে সব নষ্টের গোড়া)। আমি অনেক আগেই বলেছিলাম, এদের গার্বেজে ফেলে দাও। আমার কথা কেউ শোনেনি।' আমি তাড়াতাড় স্ক্রিপ্ট দেখিয়ে তাঁর অনুমোদন নিলাম এবং সহকারী পরিচালক আপেল মাহমুদের কামরায় গিয়ে চুপচাপ বসে থাকলাম।[১০]

জিয়াউর রহমান ও খালেদ মোশাররফের মধ্যে যে ক্ষমতার লড়াই, তার সূত্রপাত ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়ই। ৩ নভেম্বর থেকে সেনানিবাসগুলোতে খালেদকে 'ভারতের দালাল' হিসেবে যাঁরা প্রচার করছিলেন, তাঁরা ছিলেন জিয়ার পক্ষের লোক। তাঁদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা ছিল কর্নেল তাহেরের।

সব জায়গায় রটে যায়, ভারতের মদদে খালেদ মোশাররফ অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন। জিয়াউর রহমানের প্রতি অনুগত সৈন্যরা বাংলাদেশের বিভিন্ন সেনানিবাস থেকে ঢাকার দিকে রওনা হন। মোশতাক এবং ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের সমর্থক গোষ্ঠীও সক্রিয় হয়। এ সময় কর্নেল তাহের 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার' মাধ্যমে সৈনিকদের বিদ্রোহ করার আহ্বান জানান। ৫ নভেম্বর রাতে গুলশানে আনোয়ার সিদ্দিকের বাসায় সৈনিক সংস্থার কয়েকজন নেতাকে একটি ছাপানো প্রচারপত্র দেওয়া হয়। জাসদ, গণবাহিনী ও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার নামে সেনানিবাসগুলোতে এই প্রচারপত্র বিলি করা হয় এবং 'ভারতের দালাল ও বিশ্বাসঘাতক খালেদ মোশাররফ চক্র'কে উৎখাত করার আহ্বান জানানো হয়।[১১]

বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার কথা এর আগে শোনা যায়নি। এটা ছিল সেনাবাহিনীর মধ্যে জুনিয়র ও নন-কমিশন্ড অফিসার এবং সৈনিকদের একটি গুপ্ত সংগঠন। এটা মূলত শুরু হয় মেজর জলিলের অনুগত সৈনিকদের নিয়ে। জলিল মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টরের অধিনায়ক থাকার সময়

থেকেই সৈনিকদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি নিয়ে তিনি জাসদের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লেও এই যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। তেহাত্তরের ২০ নভেম্বর ঢাকার নাখালপাড়ায় তিনি বিমানবাহিনীর জেসিও/এনসিওদের নিয়ে একটা সভা করেন। সভায় সার্জেন্ট রফিক, ফ্লাইট সার্জেন্ট রোকনউদ্দিন ও সার্জেন্ট কাদের উপস্থিত ছিলেন। সভায় তিনি সারা দেশকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করে প্রতিটি অঞ্চলের জন্য একজনকে দায়িত্ব দেন। তাঁদের কাজ ছিল সেনানিবাসগুলোতে জাসদের আদর্শে সৈনিকদের উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করা। তাঁদের অনেকেই বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আহসানউল্লাহ হলে এসে রাজনীতির পাঠ নিতেন। রাজনৈতিক আলোচনা করতেন সিরাজুল আলম খান ও আখলাকুর রহমান। বিমানবাহিনীর ভেতরে সাংগঠনিক কাজ করার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের দায়িত্ব দেওয়া হয় সার্জেন্ট রফিক, ফ্লাইট সার্জেন্ট রোকনউদ্দিন ও করপোরাল শামসুল হককে। এ ছাড়া এই গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন করপোরাল আবদুল মজিদ। তাঁরা সবাই নবম সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা। চুয়াত্তরের ১৭ মার্চ গ্রেপ্তার হওয়ার পর জলিল তাঁদের কর্নেল তাহেরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দেন।[১২]

সৈনিক সংস্থার প্রধান সংগঠকদের অন্যতম ছিলেন বিমানবাহিনীর করপোরাল আলতাফ হোসেন। তিনি বিভিন্ন সেনানিবাসে গিয়ে সৈনিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন, তাঁদের সংগঠিত করতেন। অন্য সংগঠকদের মধ্যে ছিলেন নায়েক সিদ্দিকুর রহমান, হাবিলদার আবদুল হাই মজুমদার, নায়েব সুবেদার বজলুর রহমান, নায়েব সুবেদার মাহবুবর রহমান, নায়েব সুবেদার জালাল, নায়েক আবদুল বারী, হাবিলদার আবদুল বারেক প্রমুখ। তাঁরা মেজর জলিলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন।

সেনাবাহিনীতে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার প্রধান সংগঠকদের একজন নায়েব সুবেদার মাহবুবর রহমানের ভাষ্য অনুযায়ী, সংগঠনটির যাত্রা শুরু হয় ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকা সেনানিবাসের বালুঘাটে ট্যাংক বাহিনীর হাবিলদার বারীর সিগন্যাল স্টাফ কোয়ার্টারের বাসায় 'পবিত্র কোরআন শরিফের ওপর হাত রেখে বাংলাদেশ রেভল্যুশনারি আর্মি ও সুইসাইড কমান্ডো ফোর্স' গঠনের মধ্য দিয়ে। সংগঠকদের মধ্যে ছিলেন নায়েব সুবেদার মাহবুবর রহমান, নায়েক সুবেদার জালাল উদ্দিন আহমেদ, করপোরাল ফকরুল আলম, করপোরাল মোজাম্মেল হোসেন, করপোরাল মোয়াজ্জেম হোসেন, হাবিলদার বারী, সিপাহি মইনউদ্দিন আহমেদ ও করপোরাল আলতাফ হোসেন।

একপর্যায়ে তাঁরা মনে করলেন, জাসদের সঙ্গে কাজ করলে নিজেদের আলাদা কোনো রাজনৈতিক দল তৈরি করার দরকার পড়বে না। জাসদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের ইতিহাসটা ছিল এরকম :

> ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের নায়েব সুবেদার বজলুর রহমান একদিন জানাল, সে নাকি জাসদের প্রধান মেজর জলিলের সঙ্গে দেখা করেছে এবং আমাদের সংগঠনের ব্যাপারে আলাপ করেছে। মেজর জলিল বলেছেন, উনিও আমাদের সঙ্গে একমত এবং উনি ও ওনার দল আমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে। আমরা আমাদের সংগঠনের ৪০ জন সদস্য নিয়ে একদিন লালবাগ থানার পাশে একটা পুরোনো বাড়িতে গোপনে মেজর জলিলের সঙ্গে বৈঠক করি। ওই বৈঠকে জাসদের সংগঠক সিরাজুল আলম খানও উপস্থিত ছিলেন।
>
> ১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চ জাসদ পল্টন ময়দানে বিরাট এক মিটিংয়ের আয়োজন করে। ওই মিটিংয়ে আমরা বেশ কয়েকজন কমান্ডো ফোর্স সিভিল কাপড়ে পাঠালাম এবং আমি প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটালিয়ন নিয়ে ঢাকা সেনানিবাসে পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। তারা প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও না করে মনসুর আলীর বাড়ি আক্রমণ করল। সেখানে রক্ষীবাহিনী এলোপাতাড়ি গুলি চালায় এবং রবসহ সিভিল ও অনেক কমান্ডো ফোর্স হতাহত হয়।
>
> ১৯৭৪ সালের ১৫ এপ্রিল মেজর জলিল জেল থেকে কর্নেল তাহেরের মাধ্যমে আমাকে একটি চিঠি পাঠান। তাতে লেখা ছিল, 'আমার (জলিলের) পরে সামরিক বাহিনীর সংগঠনের কোনো পরামর্শ ও যেকোনো কাজ কর্নেল তাহেরের সঙ্গে করার জন্য।' আমি কর্নেল তাহেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? উনি বললেন, আমি কর্নেল তাহের, গণবাহিনীর প্রধান। আমি তাঁকে বললাম, স্যার, আপনার কী উদ্দেশ্য। বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করার পর বুঝতে পারলাম, ওনার এবং জাসদের উদ্দেশ্য একই। এর পর থেকে আমাদের গোপনীয়তা রক্ষা করে কর্নেল তাহেরের সঙ্গে কাজ করতে লাগলাম।
>
> ১৯৭৪ সালের ২০ জুন কর্নেল তাহেরের বড় ভাই সার্জেন্ট আবু ইউসুফের বাসায় (এলিফ্যান্ট রোড) আমাদের একটা গোপন মিটিং হয়। মিটিংয়ে কর্নেল তাহের বলে উঠলেন, জেনারেল জিয়াও আমাদের সঙ্গে আছেন, জেনারেল জিয়াকে বহু দিন ধরে জানি এবং আমার খুবই আপন। আমরা রেভল্যুশনারি কমান্ডো কাউন্সিলের মেম্বাররা ভাবতে লাগলাম, এটা আমাদের সংগঠনের জন্য খুবই ভালো হবে। এর পর থেকে আমাদের সংগঠনের কাজ কিছুটা খোলাভাবে চালিয়ে যেতে লাগলাম।[১৩]

আবু তাহের ১১ নম্বর সেক্টরে যাঁদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন। এ ছাড়া কুমিল্লা সেনানিবাসের কমান্ডিং অফিসার থাকার সময় অনেক সৈনিক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। এভাবেই সশস্ত্র বাহিনীতে আবু তাহের ধীরে ধীরে সৈনিকদের নিয়ে একটা সংগঠন গড়ে তোলেন। পরবর্তী সময়ে এর নামকরণ হয় 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'। সৈনিক সংস্থার কাজের প্রসারের জন্য জেনারেল জিয়াউর রহমানের ভাবমূর্তিকে ব্যবহার করা হয়। জিয়া সৈনিকদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তাহেরের সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। যদিও তিনি কখনো এর মধ্যে নাক গলাননি। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে দুজনেরই ছিল প্রচণ্ড ক্ষোভ। শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পরও এই ক্ষোভ অব্যাহত থাকে।

তাহের সেনাবাহিনীর মধ্যে 'শ্রেণিসংগ্রাম' তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটান। তৈরি হয় একটি বারো দফা দাবিনামা। ট্যাংক রেজিমেন্টের হাবিলদার বারী পঁচাত্তরের ৬ নভেম্বর বারো দফার খসড়া তৈরি করেন। বারো দফায় সশস্ত্র বাহিনীতে বিরাজমান বৈষম্য এবং অবিচারকে সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। সৈনিক সংস্থার ব্যাপ্তি তেমন বেশি ছিল না এবং তাদের মধ্যে ঐক্যের কোনো সাধারণ বন্ধনও ছিল না। কেউ তাহেরের প্রতি অনুগত, কেউ জিয়ার প্রতি অনুগত, কেউ-বা রশিদ-ফারুকের প্রতি অনুগত। এদের একটা বড় অংশ ছিল 'পাকিস্তান-প্রত্যাগত'। তাদের দলে টানার জন্য তাহের তাদের পাকিস্তানে অন্তরীণ থাকাকালীন ১৮ মাসের বেতন পরিশোধের দাবিকে সমর্থন দেন। বারো দফার ১২ নম্বরে এই দাবিটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বারো দফা দাবি নিয়ে জাসদের মধ্যে কোনো আলোচনা হয়নি। (পরিশিষ্ট ৪)।

খালেদ মোশাররফ যখন সেনাপ্রধান হওয়ার জন্য বঙ্গভবনে দেনদরবার করছিলেন, তাহের তখন বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন। জাসদের পার্টি ফোরাম এ সময় একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্তটি ছিল ৯ নভেম্বর থেকে লাগাতার হরতাল দেওয়া এবং ঢাকায় ব্যাপক শ্রমিক-ছাত্র-জনতার সমাবেশের আয়োজন করে একটি গণ-অভ্যুত্থান ঘটানো। জাসদের মূল রাজনৈতিক তত্ত্বের সঙ্গে এই অভ্যুত্থান পরিকল্পনা ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্য পিকিংপন্থী দলগুলোর মতো তাঁরা 'মুক্ত এলাকার বিস্তার ঘটিয়ে রাজধানী অবরোধ করার' কৌশলে বিশ্বাস করতেন না।

৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় জাসদের পার্টি ফোরামের ইমার্জেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠক বসে ঢাকার কলাবাগানের একটি বাসায়। এই কমিটির সদস্য ছিলেন সিরাজুল আলম খান, আখলাকুর রহমান, মোহাম্মদ শাজাহান, হারুনুর রশীদ,

মনিরুল ইসলাম, হাসানুল হক ইনু ও খায়ের এজাজ মাসুদ। সভায় হারুনুর রশীদ ও মোহাম্মদ শাজাহান উপস্থিত ছিলেন না। মো. শাজাহান তখন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী। সভায় উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা চলছিল। কর্নেল তাহের সভায় এসে উপস্থিত হন। সরকারি চাকরিতে থাকার কারণে তাঁকে কোনো কমিটিতে রাখা হতো না। তবে তিনি স্ট্যান্ডিং কমিটির মিটিংয়ে অংশ নিতে পারতেন। তাহের উপস্থিত সবাইকে জানান, জিয়াউর রহমান টেলিফোনে তাঁকে বাঁচানোর অনুরোধ করেছেন।

কিছুক্ষণ পর সেনাবাহিনীর একজন তরুণ কর্মকর্তা আসেন অসামরিক পোশাকে। তিনি তাহেরকে ফিসফিস করে কিছু বলেন এবং তাঁর হাতে দুটো চিরকুট দেন। ওই ব্যক্তি চলে যাওয়ার পর তাহের একটি চিরকুট পড়ে শোনান। এটা জিয়ার হাতের লেখা :

> আই অ্যাম ইনটার্নড, আই ক্যান্ট টেক দ্য লিড। মাই মেন আর দেয়ার। ইফ ইউ টেক দ্য লিড, মাই মেন উইল জয়েন ইউ (আমি বন্দী, আমি নেতৃত্ব দিতে পারছি না। আমার লোকেরা তৈরি। তুমি যদি নেতৃত্ব দাও, আমার লোকেরা তোমার সঙ্গে যোগ দেবে)।[১৪]

তাহের প্রস্তাব দিলেন, জিয়াকে সামনে রেখে অভ্যুত্থান ঘটাতে হবে। আখলাকুর রহমান বেঁকে বসলেন। স্বভাবসুলভ কণ্ঠে বললেন, 'ইতা কিতা কন? তাইনরে আমরা চিনি না!' সভায় আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, বাস্তবিকই তাঁরা কেউই জিয়াউর রহমানকে চেনেন না, তাঁর সঙ্গে কোনো দিন আলাপ হয়নি। সবার মুখে প্রশ্ন, জিয়াকে কি বিশ্বাস করা যায়? তাহের বললেন, 'আপনারা যদি আমাকে বিশ্বাস করেন, তাহলে জিয়াকেও বিশ্বাস করতে পারেন। হি উইল বি আন্ডার মাই ফিট' (সে আমার পায়ের নিচে থাকবে)। তাহের আরও বললেন, তিনি ইতিমধ্যে সৈনিক সংস্থার লোকদের অভ্যুত্থান ঘটানোর নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন। তাহেরকে অনুরোধ করা হলো এই নির্দেশ প্রত্যাহার করার জন্য। কারণ, অন্যদের তেমন কোনো প্রস্তুতি নেই। তাহের জানালেন, 'এটা ওয়ানওয়ে কমিউনিকেশন। আমার লোকেরা যোগাযোগ না করলে আমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব না।' তিনি দ্বিতীয় চিরকুটটা বের করলেন। বললেন, এটা বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার গোয়েন্দা শাখা থেকে পাঠানো হয়েছে এবং এটা খুবই জরুরি বার্তা, তাতে লেখা :

> খালেদ মোশাররফ'স মেন আর মুভিং ফাস্ট। দ্য আয়রন ইজ ট্যু হট। ইট ইজ টাইম টু হিট (খালেদ মোশাররফের লোকেরা খুব তৎপর। লোহা খুবই গরম। এটাই আঘাত করার উপযুক্ত সময়)।[১৫]

আখলাকুর রহমান তবু আপত্তি করছিলেন। তাহের বলশেভিক বিপ্লবের প্রসঙ্গ টেনে লেনিনীয় কায়দায় বললেন, 'টু নাইট অর নেভার' (আজ রাতে অথবা কখনোই নয়)। সিরাজুল আলম খান হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না। তাহের হাসানুল হক ইনুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সভা শেষ হয়ে গেল। আখলাকুর রহমান রওনা হয়ে গেলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার কাছে খড়মপুরে কল্লা শাহর মাজারের উদ্দেশে। তাঁর মাজারে মাজারে ঘোরার বাতিক ছিল।[১৬]

খায়ের এজাজ মাসুদের কাছে পুরো বিষয়টাই 'বালখিল্য' মনে হয়েছিল। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ রহমান হলে চলে এলেন। এটাই ছিল তাঁর কমান্ড হেডকোয়ার্টার।[১৭]

আবু তাহেরের নির্দেশিত অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার কথা ৭ নভেম্বরের প্রথম প্রহরে, রাত একটায়। অভ্যুত্থানের সাতটি লক্ষ্য ছিল :

১) খালেদ মোশাররফ চক্রকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা;
২) বন্দিদশা থেকে জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করা;
৩) একটি বিপ্লবী মিলিটারি কমান্ড কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা;
৪) দলনির্বিশেষে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া;
৫) রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সব গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহার করা;
৬) বাকশাল বাদে সব দলকে নিয়ে একটি গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা; এবং
৭) বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার বারো দফা দাবি বাস্তবায়ন করা।[১৮]

নির্দেশনা ছিল রাত একটায় সুবেদার মাহবুব ফাঁকা গুলি ছুড়ে সংকেত দেবেন। তখন সৈনিকেরা অস্ত্রাগার ভেঙে অস্ত্রশস্ত্র নেবে এবং 'বিপ্লব' শুরু করে দেবে। উত্তেজনার বশে সময় ঠিক রাখা যায়নি। এক ঘণ্টা আগেই গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। একদল সৈন্য জিয়ার বাসায় গিয়ে জানান, তিনি মুক্ত, বিপ্লব হয়ে গেছে। জিয়া বেরিয়ে এলে সৈনিকেরা তাঁকে টু-ফিল্ড রেজিমেন্টের অফিসে নিয়ে আসেন।

তাহেরের লোকেরা ঢাকা বেতারের নিয়ন্ত্রণ নেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, গায়ে খাকি শার্ট-প্যান্ট, কাঁধে রাইফেল। তাড়াহুড়োয় টুপি ও বুট জোগাড় হয়নি। স্পঞ্জের স্যান্ডেল পরেই চলে এসেছেন তাঁরা। এঁদের একজন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্য সেন হলের ছাত্রলীগ নেতা মো. শফিকুল ইসলাম। শফিকের মনে হয়েছিল, 'বিপ্লব হয়ে গেছে, কিন্তু কী করতে হবে কেউ জানে না। পায়ে বুট না স্যান্ডেল—এটা দেখার মতো হুঁশ কারও ছিল না।'[১৯] ভোরবেলায় বেতারে একটা ঘোষণা

দেওয়া হয়, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা ও বিপ্লবী গণবাহিনীর নেতৃত্বে সিপাহি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। ঘোষণায় তাহের কিংবা জাসদের পরিচিত কোনো নেতার নাম উল্লেখ করা হয়নি। ঘোষক তাঁর নামটিও বলেননি।

ভোরে তাহের ও ইনু সেনানিবাসে যান এবং জিয়ার সঙ্গে কথা বলেন। জিয়া জানতে চান, সিরাজুল আলম খান কোথায়? জিয়া জাসদের মূল নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। সিরাজুল আলম খান তখন কোথায়, তা কেউ জানেন না। তাঁর এই হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাওয়া নিয়ে ধারণা করা হয়, তাহেরের এই উদ্যোগ সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই এবং তিনি এর সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাননি।

তাহের জিয়াকে ভোরে বেতারকেন্দ্রে নিয়ে আসতে এবং তাঁকে দিয়ে একটি ভাষণ দেওয়াতে চেয়েছিলেন। জিয়া তাহেরের সঙ্গে কোথাও যেতে চাননি। কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা পরামর্শ দেন, সেনাপ্রধানের বেতারকেন্দ্রে যাওয়ার কী দরকার? ভাষণ তো এখানেই রেকর্ড করা যায়? এ প্রসঙ্গে সেনাবাহিনীর ওই সময়ের অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল কর্নেল মইনুল হোসেন চৌধুরীর বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর বর্ণনামতে, 'লে. কর্নেল তাহের একটি বেসামরিক জিপে করে দু-তিনজন লোকসহ সেখানে এসে উপস্থিত হন। এসেই তিনি জিয়াকে রেডিও স্টেশনে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। আমরা জিয়াকে রেডিও স্টেশনে যেতে বারণ করি। এ সময় লে. কর্নেল আমিনুল হক ও তাহেরের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায়। একপর্যায়ে আমিনুল হক তাহেরকে বলে বসেন, "আপনারা (জাসদ) তো ভারতের বি-টিম।" ফলে তাহের রাগান্বিত হয়ে সেখান থেকে চলে যান।'[২০] শেষ পর্যন্ত জিয়ার ভাষণ সেনানিবাসেই রেকর্ড করা হয়। ৭ নভেম্বর সকালে এই ভাষণ প্রচার করা হয়। ভাষণটি নিচে উদ্ধৃত করা হলো :

> প্রিয় দেশবাসী,
>
> আসসালামু আলাইকুম।
>
> আমি মেজর জেনারেল জিয়া বলছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জনগণ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার এবং অন্যদের অনুরোধে আমাকে সাময়িকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়েছে। এ দায়িত্ব ইনশা আল্লাহ আমি সুষ্ঠুভাবে পালন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আপনারা সকলে শান্তিপূর্ণভাবে যথাস্থানে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করুন। দেশের সর্বস্থানে—অফিস-আদালত, যানবাহন, বিমানবন্দর, নৌবন্দর ও কলকারখানা পূর্ণভাবে চালু থাকবে। আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন। খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।[২১]

জিয়ার এই ভাষণে কোথাও জাসদ, গণবাহিনী বা তাহেরের উল্লেখ নেই। ভোরেই 'সিপাহি বিপ্লবের' ঘণ্টা বেজে গিয়েছিল। এই ভাষণ 'বিপ্লবের' কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দিল।

ঢাকা নগর গণবাহিনীর উদ্যোগে সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল এবং জিয়া ও তাহেরের সেখানে উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল। জিয়া সেনানিবাসের বাইরে আসতে অস্বীকার করেন। তিনি জানান, একজন সৈনিক হিসেবে তিনি কোনো জনসমাবেশে গিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার পক্ষপাতী নন। ততক্ষণে জিয়ার আশপাশে অনেক সেনা কর্মকর্তা উপস্থিত হয়েছেন। জিয়া তখন অনেকটা স্বচ্ছন্দ ও ভারমুক্ত।

ছাত্রলীগ-গণবাহিনীর সদস্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে স্লোগান দিচ্ছেন, জিয়া-জলিল জিন্দাবাদ, জিয়া-তাহের জিন্দাবাদ। শহীদ মিনারে সকাল নয়টার দিকে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে আবুল হাসিব খান সবাইকে সমবেত হওয়ার জন্য ডাকাডাকি করছিলেন। রাস্তায় বেশ কিছু ট্রাক দেখা গেল। ট্রাকে দাঁড়িয়ে সৈনিক ও অসামরিক জনতা মুহুর্মুহু স্লোগান দিচ্ছেন, 'জিয়া-মোশতাক জিন্দাবাদ', 'নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবর'। কোনো কোনো ট্রাকে খন্দকার মোশতাকের ছবি। ছাত্রলীগের ঢাকা নগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবদুস সালাম একটা ট্রাকে মোশতাকের ছবি ছিঁড়ে ফেলতে গেলে সৈনিকেরা সালামের ওপর চড়াও হন। তাঁরা এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়েন। সমাবেশ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এরপর তাঁরা সবাই শহীদ মিনার চত্বর থেকে সরে যান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স অ্যানেক্স ভবনের সামনে জড়ো হন।

হাসিব খানকে লালবাগ থানা দখল করার অনুরোধ জানান আনোয়ার হোসেন। হাসিবকে তিনি বলেন, 'পুলিশ বাহিনী ডিসব্যান্ড করা হয়েছে। আপনি থানা দখল করুন।' হাসিব রাজি হননি। তাঁর কথা হলো, 'আগে রেডিওতে পুলিশ ডিসব্যান্ড করার ঘোষণা দেন। তারপর দেখা যাবে।' মোহাম্মদপুর-ধানমন্ডি ইউনিট গণবাহিনীকে বলা হয় মোহাম্মদপুর থানা দখল করতে। দেশে যদি বিপ্লব হয়ে থাকে, তাহলে আলাদা করে থানা দখল করার কী প্রয়োজন, এটা বোঝা গেল না। তবু গণবাহিনীর একটা দল মোহাম্মদপুর থানায় গিয়ে পুলিশ সদস্যদের বলল, 'আমরা বিপ্লব করেছি। আপনারা আমাদের সাথে আছেন তো?' এর কয়েক দিন পর ওই দলের এক সদস্য খোকনকে একা পেয়ে মোহাম্মদপুর থানার কয়েকজন পুলিশ বেধড়ক পেটায়। খোকন ছিলেন প্রখ্যাত সংগীত পরিচালক ধীর আলী মিয়ার ছেলে।[২২]

৭ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি সায়েম সন্ধ্যায় বেতার ও টেলিভিশনে একটা ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন :

> রাষ্ট্রপতির পদে জনাব খন্দকার মোশতাক আহমদের পুনর্বহাল হওয়ার পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত দাবি সত্ত্বেও তাঁরই অনুরোধক্রমে আমি রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার চালিয়ে যেতে সম্মত হয়েছি। জনাব খন্দকার মোশতাক আহমদের দেশব্যাপী জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের যে মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, তা যেকোনো উন্নয়নশীল দেশে বিরল এবং সেই দেশের জনগণের জন্য গর্বের বিষয়।...
>
> পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনার জন্য আমরা কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।...এই কাঠামোতে রাষ্ট্রপতি স্বয়ং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হবেন। এতে তিনজন উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক থাকবেন। তাঁরা হচ্ছেন সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌবাহিনীর প্রধান কমোডর মোশাররফ হোসেন খান এবং বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এম জি তাওয়াব।...জননেতাদের সমন্বয়ে একটা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে।...রাজনৈতিক আদর্শগত কারণে যেসব জননেতা আটক আছেন, তাঁদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হবে।[২৩]

বিচারপতি সায়েমের ভাষণের পরপরই খন্দকার মোশতাক আহমদের একটি ভাষণ প্রচার করা হয়। 'স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যে অভূতপূর্ব বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে', ভাষণে তিনি সে জন্য দেশের সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, সকল নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনী ও সর্বস্তরের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।[২৪]
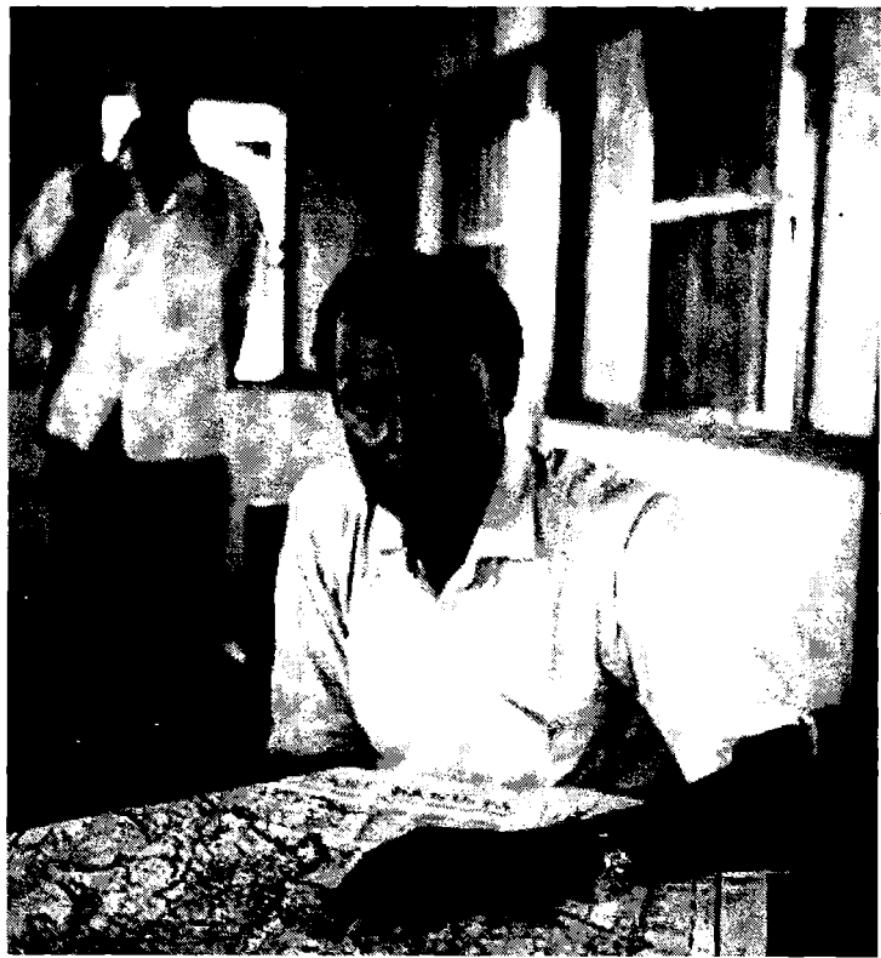
৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় জিয়া ঢাকা বেতার কেন্দ্রে যান। তাহের সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা একসঙ্গে বসে নতুন ও বিদায়ী রাষ্ট্রপতির ভাষণ শোনেন। উত্তেজিত সৈনিকেরা লিখিতভাবে তাঁদের বারো দফা দাবির একটি কাগজে জোর করে জিয়ার সই নেন। বেশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয় জিয়াকে।[২৫]

জিয়ার সঙ্গে তাহেরের কী কথা হয়েছিল? কেন হঠাৎ তাঁদের সম্পর্কে ফাটল ধরে, তা নিয়ে নানা ধরনের কথাবার্তা প্রচলিত আছে। সত্যটা খুঁজে বের করা খুবই কঠিন, হয়তো বা অসম্ভব। এ বিষয়ে তাহেরের অনুজ ও ঢাকা নগর গণবাহিনীর কমান্ডার আনোয়ার হোসেনের ভাষ্য এরকম :

> দেশের ভবিষ্যৎ প্রশ্নে জিয়ার সঙ্গে তাহেরের বোঝাপড়ার অনেকখানিই আমাদের অজানা এবং তা আর কোনো দিন জানা সম্ভবও হবে না। তবে জিয়ার প্রতি তাহেরের অনুকূল মনোভাবের কিছু কারণ শনাক্ত করা সম্ভব।

প্রথমত, জিয়াকে সেনাবাহিনীতে একজন জাতীয়তাবাদী হিসেবে মনে করা হতো। দ্বিতীয়ত, বেতারে আপতিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপাঠের সুবাদে মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে পরিচিত সেনানায়কে পরিণত হন তিনি। তৃতীয়ত, সে সময়কার অধিকাংশ সেনা অফিসারের বিপরীতে জিয়া ছিলেন তুলনামূলকভাবে সৎ। এবং সর্বোপরি তাহের ও জাসদের উদ্যোগ-আয়োজন সম্পর্কে জিয়ার মনোভাব ছিল ইতিবাচক।[২৬]

৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের কুশীলবদের অনেকেই যে যেখানে পারেন, গা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করেন। অনেকেই গ্রেপ্তার হন। শাফায়াত জামিল পালিয়ে যাওয়ার সময় আহত হন এবং পরে নারায়ণগঞ্জ থানায় আত্মসমর্পণ করেন। তাঁকে ঢাকায় এনে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।[২৭]

ক্ষমতার লড়াইয়ে শেষমেশ হেরে গেলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ

৭ নভেম্বর ভোরে খালেদ মোশাররফ তাঁর দুই সহযোগী কর্নেল হায়দার ও কর্নেল হুদাকে নিয়ে শেরেবাংলা নগরে সেনাবাহিনীর একটি ইউনিটে যান। সেখানেই তাঁদের হত্যা করা হয়। তাঁদের কার নির্দেশে হত্যা করা হয়েছিল, তা আজও অজানা।

৭ নভেম্বরের 'সিপাহি বিপ্লব' ক্ষমতার লড়াই থেকে ছিটকে ফেলল খালেদ মোশাররফকে। তাঁর শেষ পরিণতিটা ছিল অত্যন্ত করুণ। ঢাকা সেনানিবাসের স্টেশন কমান্ডার লে. কর্নেল এম এ হামিদের চোখের সামনেই অনেক কিছু ঘটেছিল। বিষয়টি তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন :

> সকাল ৭ ঘটিকা (৭ নভেম্বর)। টু-ফিল্ড রেজিমেন্টের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সৈনিকদের ব্যস্ততা, দ্রুত আনাগোনা প্রত্যক্ষ করছিলাম। তারা হেলেদুলে ঘুরছে ফিরছে আপন খেয়ালে। অন্য সময় হলে অফিসারদের পাশ দিয়ে যেতে তাদের স্মার্ট স্যালুট দিয়ে চলতে হতো। আজ এসব বালাই নেই। আজ তাদের রাজ্যে সবাই রাজা।
>
> এমন সময় সৈনিকদের ভিড় ঠেলে একটি আর্মি ট্রাক শোঁ শোঁ বেগে এগিয়ে এল। ভেতর থেকে নেমে এল একজন তরুণ লেফটেন্যান্ট। স্যালুট দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, স্যার, জেনারেল জিয়া কোথায়? জরুরি ব্যাপার আছে।...আমি তাকে নিয়ে জিয়ার কামরায় ঢুকলাম। তাকে বললাম, এই ছেলেটি তোমাকে কিছু বলতে চায়। লেফটেন্যান্ট ততক্ষণাৎ জিয়াকে একটি স্মার্ট স্যালুট দিয়ে বললো, 'স্যার, আই হ্যাভ কাম টু প্রেজেন্ট ইউ ডেড বডি অব খালেদ মোশাররফ, কর্নেল হুদা অ্যান্ড কর্নেল হায়দার, স্যার।' জিয়া অবাক! ব্রিগেডিয়ার খালেদের ডেডবডি। আমার দিকে তাকিয়ে জিয়া বললেন; দেখতো হামিদ কি ব্যাপার! আমি অফিসারকে সাথে নিয়ে বাইরে দাঁড়ানো খোলা ট্রাকের পেছনে গিয়ে উঠলাম। সেখানে দেখি ট্রাকের পাটাতনে খড় চাপা দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে তিনটি মৃতদেহ। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, কর্নেল হুদা ও কর্নেল হায়দার। খালেদের পেটের ভুঁড়ি কিছুটা বেরিয়ে আসছিল। তাকে পেটের মধ্যে গুলি করা হয়েছিল, হয়তোবা বেয়নেট চার্জ করা হয়েছিল। কি করুণ মৃত্যু! আমি জিয়াকে কামরায় গিয়ে বললাম; হ্যাঁ, খালেদ, হুদা আর হায়দারের ডেডবডি। সে জিজ্ঞাসা করল, এগুলো এখন কি করা যায়? আমি বললাম, আপাততঃ এগুলো সিএমএইচের মর্গে পাঠিয়ে দেই। জিয়া বললো, প্লিজ হামিদ, এক্ষুণি ব্যবস্থা করো।...আমি লেফটেন্যান্টকে ডেডবডিগুলো সিএমএইচে নিয়ে যেতে বললাম।
>
> বেলা ১১টায় আমার ড্রাইভার ল্যান্স নায়েক মনোয়ার আমার জিপ নিয়ে ফিরে এল।...অফিসে কোনো কাজ নেই দেখে আমি সিএমএইচে খালেদ মোশাররফকে দেখার জন্য চললাম। পৌছে দেখি সেখানে খালেদ

মোশাররফের লাশ একেবারে মর্গের সামনে খোলা মাঠে নির্দয়ভাবে ফেলে রাখা হয়েছে। চতুর্দিক থেকে সৈনিকেরা দলে দলে এসে চার দিনের বিপ্লবের নিহত নেতাকে দেখছে, কেউ থুতু দিচ্ছে। আমি সিএমএইচের কোনো অফিসারকে পেলাম না। সুবেদার সাহেবকে ডেকে বললাম, খালেদ একজন সিনিয়র অফিসার, তাই তার লাশটা এভাবে অসম্মান না করে মর্গে তুলে রাখার জন্য। তিনি তখনই লাশটা সরাবার ব্যবস্থা করার জন্য ডোম ডাকতে ছুটে গেলেন। হুদা ও হায়দারের লাশ মর্গেই ছিল।...

৯ তারিখ দুপুরে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের এক চাচা শহর থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন খালেদের লাশটি নিয়ে যাওয়ার জন্য। ভয়ে খালেদের পরিবার পালিয়ে বেড়াচ্ছে। গত দুদিন ধরে অবহেলায় লাশটি পড়ে আছে। কেউ আসছে না। আমি তখনই তাকে স্টেশন হেডকোয়ার্টারে চলে আসতে বললাম। তিনি ক্যান্টনমেন্টে আসতে রাজি হলেন না। অগত্যা বনানী স্টেশনের কাছে গিয়ে খালেদের লাশ তার হাতে পৌঁছে দেওয়া হলো। তিনি সেনানিবাস গোরস্থানে খালেদকে দাফন করার অনুমতি চাইলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দিলাম। কিছুক্ষণ পর ফোন করে বললেন, তার কাছে কোনো লোকজন নেই। যদি কবরটা খুঁড়ে দেওয়া যায়। আমি তৎক্ষণাৎ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসারকে ডেকে ব্রিগেডিয়ার খালেদের কবর খুঁড়তে তিন/চারজন সিভিলিয়ান মালি পাঠানোর ব্যবস্থা করলাম।

বিকেলে আবার তিনি ফোন করলেন, খালেদের আত্মীয়স্বজন সবাই ভীতসন্ত্রস্ত। তারা সন্ধ্যার দিকে খালেদকে দাফন করতে চান। তাই একটু সিকিউরিটির ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন। আমি বললাম, দেখুন, আপনি কি সেপাই গার্ড চাচ্ছেন? তিনি বললেন, তওবা, তওবা। তখন আমি বললাম, আমি নিজে সন্ধ্যার সময় ওখানে হাজির থাকব। আপনারা নির্বিঘ্নে খালেদকে নিয়ে আসুন।...

সন্ধ্যাবেলা ঘোর অন্ধকার। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। রাস্তার লাইটের স্তিমিত আলোতে ক্যান্টনমেন্টের গোরস্থানে তড়িঘড়ি করে খালেদের দাফনকার্য সমাধা করা হলো। উপস্থিত ছিলেন মাত্র চার/ছয়জন অতি নিকটাত্মীয় ও চাচা। আর শুধু আমি ও আমার ড্রাইভার ল্যান্স নায়েক মনোয়ার।

...এভাবে শেষ হলো একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধে 'কে ফোর্সের' দুর্ধর্ষ কমান্ডার খালেদ মোশাররফ বীর উত্তমের শেষকৃত্য। গোপনে, অন্ধকারে, সবার অগোচরে।[২৮]

৭ নভেম্বর সারা দিন ঢাকা সেনানিবাসের পরিস্থিতি ছিল থমথমে। বিকেলের দিকে পরিস্থিতি পুরোপুরি পাল্টে যায়। অফিসাররা আতঙ্কিত হয়ে

পরিবার-পরিজনসহ সেনানিবাস ছেড়ে চলে যেতে থাকেন। স্টেশন কমান্ডার লে. কর্নেল হামিদ ওই রাতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> ৭-৮ নভেম্বরের ওই বিভীষিকাময় রাত্রে গভীর অন্ধকারে উন্মাদ সৈনিকেরা অফিসারদের রক্তের নেশায় পাগল হয়ে উঠল। ঘটে গেল বেশ কয়েকটি হত্যাকাণ্ড। বহু বাসায় হামলা হলো। অনেকে বাসায় ছিলেন না। অনেকে পালিয়ে বাঁচল। সৈনিকেরা মেজর করিম, মিসেস মুজিব, মিসেস ওসমানকে গুলি করে হত্যা করল। মেজর আজিম ও মুজিব চট্টগ্রামে যাচ্ছিলেন। বিপ্লবী সৈনিকেরা তাদের এয়ারপোর্টে পাকড়াও করে। আজিমকে গুলি করে হত্যা করে। মেজর মুজিব প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হন। অর্ডিন্যান্স অফিসার মেসে সৈনিকেরা হামলা করে তিনজন তরুণ অফিসারকে গুলি করে হত্যা করে। এদের মধ্যে ছিলেন মেজর মহিউদ্দিন, যিনি শেখ সাহেবের লাশ টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে দাফন করেন। সৈনিকেরা বনানীতে কর্নেল ওসমানের বাসায় আক্রমণ করে। ওসমান পালিয়ে যান, তারা মিসেস ওসমানকে গুলি করে হত্যা করে। হকি খেলতে এসেছিল দুজন তরুণ লেফটেন্যান্ট। তাদের স্টেডিয়ামের পাশে গুলি করে হত্যা করা হয়। অর্ডিন্যান্স স্টেটে দশ জন অফিসারকে এক লাইনে দাঁড় করানো হয় মারার জন্য। প্রথমজন এক তরুণ ইএমই ক্যাপ্টেন। তার পেটে গুলি করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। বাকিরা অনুনয়-বিনয় করলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। বেঁচে গেল তারা অপ্রত্যাশিতভাবে। টেলিভিশনের একজন অফিসার মুনিরুজ্জামান। বঙ্গভবনে খালেদের সময় খুবই অ্যাকটিভ ছিলেন। তাকে ধরে গুলি করা হয়। তিন দিন পর তার লাশ পাওয়া যায় মতিঝিল কলোনির ডোবায়। সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরের ডাইরেক্টর কর্নেল (পরে ব্রিগেডিয়ার) খুরশিদ। বিপ্লবীরা তার বাসা আক্রমণ করে কয়েক ঝাঁক গুলিবর্ষণ করে। তিনি পালিয়ে যান।...সৈনিকেরা দল বেঁধে প্রায় প্রতিটি অফিসার্স কোয়ার্টারে হামলা চালায়। ভীতসন্ত্রস্ত অফিসাররা বাসা ছেড়ে অন্ধকারে পেছনের পানির ডোবায়, ঝোপে-জঙ্গলে আত্মগোপন করে সারা রাত কাটায়।[২৯]

এর অনেক দিন পর ঢাকার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে মেজর হাফিজের সঙ্গে আকা ফজলুল হকের দেখা হয়। হাফিজ তখন সেনাবাহিনী থেকে চাকরিচ্যুত। মোহামেডান ক্লাবের ফুটবল টিমের তিনি অধিনায়ক ছিলেন। তিনি জিয়ার ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল, 'জিয়াকে গৃহবন্দী রাখার পরিকল্পনাটি ছিল হাফিজের। আবার হাফিজের কারণেই জিয়া কিলড হননি। এতে মনে হতে পারে, জিয়াকে আটক রাখার ব্যাপারটা ছিল সাজানো।'[৩০]

অভ্যুত্থানকারীরা জিয়াকে তাঁর বাসভবনে অন্তরীণ করার সময় ড্রয়িংরুমের টেলিফোন লাইন কেটে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শয়নকক্ষের টেলিফোন লাইনটি সচল ছিল। এই টেলিফোনের মাধ্যমেই জিয়া তাহেরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে ফারুক-রশিদের বক্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক। তাঁদের কথা অনুযায়ী, জিয়া ছিলেন একজন পাকা খেলোয়াড়। *স্যাটারডে পোস্ট*-এ দেওয়া সাক্ষাৎকারে তাঁরা বলেন :

> প্রথম কথা হচ্ছে, জিয়া তাঁর সৃষ্ট স্টাইলে নিজের বাসভবনে আটক ছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ও পদাতিক বাহিনীর একটি কোম্পানির প্রহরাধীন ছিলেন। সেখানে তাঁর ব্যক্তিগত স্টাফ অফিসাররাও ছিলেন। বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনি নিজে কোনো উদ্যোগই নেননি। উপরন্তু প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক প্রেসিডেন্ট কর্তৃক এ ব্যাপারে তাঁকে বিদ্রোহ দমন করতে সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করা সত্ত্বেও তিনি বিদ্রোহ দমন করতে অস্বীকার করেন, তাঁর বাসভবনের টেলিফোন বরাবরই সম্পূর্ণরূপে কাজ করছিল। তাঁর স্ত্রী আমাদের এই মর্মে নিশ্চিত করেছিলেন যে, তিনি গ্রেপ্তার কিংবা আটকাবস্থায় নেই। টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তাঁর স্ত্রী জানান যে, তিনি কতিপয় সামরিক অফিসারের সঙ্গে আলাপ করছেন। এরপর বঙ্গভবন থেকে তাঁকে যতবারই ফোন করা হয়েছে, ততবারই তিনি ফোনে কথা বলতে অস্বীকার করেন। চিফ অব আর্মি স্টাফের পদবির অপব্যবহার করে জিয়া সর্বদাই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জনগণ ও সৈনিকদের ধোঁকা দিয়েছেন।[৩১]

৮ নভেম্বর জাসদের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম চত্বরে একটা সমাবেশ করার চেষ্টা করা হয়। সেনাবাহিনীর সদস্যরা সেখানে আক্রমণ চালিয়ে সমবেত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। তাঁদের গুলিতে আ ফ ম মাহবুবুল হক আহত হন।

৮ নভেম্বর দিনটা ছিল আবু তাহেরের জন্য হতাশাব্যঞ্জক। সকাল ১০টায় ঢাকা সেনানিবাসের মাঠে জিয়া সব সৈনিক ও অফিসারকে জমায়েত হতে বললেন। সেখানে সৈনিকেরা সবাই সশস্ত্র ছিলেন। জিয়া সবার উদ্দেশে বললেন, 'আপনারা যার যার ইউনিটে গিয়ে যার যার আর্মস ইউনিট কমান্ডারের কাছে জমা দিয়ে যার যার কাজে যোগ দিন।' জিয়া অফিসারদের বললেন, 'আপনারা যার যার র‍্যাংক লাগিয়ে যার যার কমান্ডে চলে যান।' বেলা একটায় নায়েব সুবেদার মাহবুব আবু তাহেরের সঙ্গে দেখা করার জন্য এলিফ্যান্ট রোডে তাহেরের বড় ভাই সার্জেন্ট আবু ইউসুফের বাসায় যান। মাহবুবের বর্ণনামতে :

আমি বাসায় ঢুকে দেখি কর্নেল তাহের টেলিফোনে আলাপ করছেন। টেলিফোনের রিসিভারটা জোর করে রেখে বললেন, 'বিট্রেয়ার।' আমি বললাম, 'স্যার, কে?' তাহের বললেন, 'জেনারেল জিয়া। সুবেদার সাহেব, একটা কাজ করেন, আপনি আপনার সুইসাইড কমান্ডো ফোর্স তৈরি করেন গাদ্দার জিয়াকে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য।' আমি তাহেরকে বললাম, 'স্যার, আপনিই তো ৬ নভেম্বর মিটিং করে জিয়ার নাম প্রস্তাব করেছিলেন। দুই দিন না যেতেই তাঁকে সরাতে হবে? এর অর্থ কিছুই বুঝতে পারলাম না, স্যার।' আমি তাহেরকে বললাম, 'এখন মোটেই সম্ভব নয়। কী বলে আজ সিপাহিদের একত্র করব? আমরা কী জন্য কী উদ্দেশ্যে সিপাহি-জনতার বিপ্লব করেছি এবং কারা কারা করেছি, তার কোনো কিছুই প্রকাশ হয় নাই।' এই বলে ক্ষুণ্ন মন নিয়ে নিরাশায় ও নিঃসহায় হয়ে বিকেল পাঁচটায় বাসায় ফিরলাম আর চিন্তা করতে লাগলাম, ফাঁসি অনিবার্য। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এতিম হয়ে দ্বারে দ্বারে মানুষের লাথি খাবে আর মানুষে গাদ্দারের ছেলেমেয়ে বলে ধিক্কার দেবে।[৩২]

৮ নভেম্বর রাতে রাজশাহী কারাগার থেকে আ স ম আবদুর রব এবং ময়মনসিংহ কারাগার থেকে মেজর জলিল ছাড়া পান। পরদিন তাঁরা ঢাকায় আসেন। এর আগে ৭ নভেম্বর বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার একটি দল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটক খুলে দিলে জাসদের নেতা এম এ আউয়াল, মো. শাজাহান ও মির্জা সুলতান রাজা বেরিয়ে আসেন। তাঁরা সবাই তখন হতবিহ্বল।

৮ নভেম্বর দৃশ্যপট একটু বদলে যায়। রাষ্ট্রপতি সায়েম নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং তিন বাহিনীর প্রধানদের উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা দেন। এর সঙ্গে আরও অনেকগুলো আদেশ জারি করা হয় এবং 'এই ফরমান ১৯৭৫ সালের ২০ আগস্ট তারিখের ফরমানের অংশবিশেষ বলে গণ্য হবে' বলে উল্লেখ করা হয়।[৩৩]

আবু তাহেরের প্রতি অনুরাগী একজন কর্মকর্তা ছিলেন সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার মেজর জিয়াউদ্দিন। ৭ নভেম্বর অভ্যুত্থানের সময় তিনি দাপ্তরিক কাজে খুলনায় ছিলেন। ঢাকায় এসে তিনি সব জানতে পারেন এবং 'বিপ্লবের' আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ৮ নভেম্বর রাতে সদরঘাট থেকে লঞ্চে করে পিরোজপুরের দিকে রওনা হন। লঞ্চে অনেক আনসার ছিলেন, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সময় ৯ নম্বর সেক্টরে তাঁর সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করেছেন। পিরোজপুরে তিনি আরও কিছু লোককে সংগঠিত করার নির্দেশ দিয়ে লঞ্চটা নিয়ে সুন্দরবনের উদ্দেশে যাত্রা করেন। প্রথমেই তিনি শরণখোলা থানা দখলে নিয়ে নেন এবং ওই এলাকাকে মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করে 'বিপ্লবের ঘাঁটি' বানান।[৩৪]

মেজর জলিল ও
আ. স. ম. আবদুর রবের বক্তব্য

প্রিয় দেশবাসী,

আস্সালামু আলাইকুম,

আপনারা আমাদের সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আপনারা জানেন যে, স্বাধীনতার শুরু থেকেই বিদেশী শক্তির চক্রান্তে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করার জন্য কতিপয় স্বার্থান্বেষী প্রতিক্রিয়াশীল গণবিরোধী ব্যক্তি ও মহল মারাত্মকভাবে তৎপর হয়ে উঠেছিল। এ মাসের (নভেম্বর) প্রথম দিকে, বিশেষ করে তিন তারিখে, বিশ্বাসঘাতক ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ভারত, রাশিয়া ও আমেরিকার প্ররোচনায় তারা দেশ ও জাতি হিসাবে আমাদের অস্তিত্বকে চিরতরে বিলুপ্ত করার চরম আঘাত হানার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল। এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের পূর্ব মুহূর্তেই বাংলার বিপ্লবী সিপাহিরা, বিপ্লবী গণবাহিনী ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুবক মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবিসহ সকল দেশ প্রেমিক নাগরিকদের সমর্থন ও সক্রিয় সহায়তায় আঘাত হানল শত্রুর দুর্গে। মুক্ত করল মৃত্যুর কবল থেকে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে, মুক্ত করল আমাদেরকে। তাদের বিজয়ী আঘাত প্রমাণ করল যে বিপ্লবী সিপাহী ভাইদের, বিপ্লবী গণবাহিনী ও জনতার ঐক্যের সামনে দেশীয় শোষক ও বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীরা পরাজয় স্বীকার করতে এবং মাথা নত করতে বাধ্য।

কিন্তু ভুললে চলবেনা যে, আমাদের এ বিজয় অত্যন্ত সাময়িক। সাধারণ মানুষ এখনো দেশীয় শোষক ও বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়নি। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, দেশীয় শোষক ও সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদের দালালরা তাদের প্রভুদের ইংগিতে নূতন পোশাক পরে আবার জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। এদের সমূলে উৎখাত না করা পর্যন্ত, অন্যকথায় ভারত, রাশিয়া ও আমেরিকাসহ যে কোন বিদেশী প্রভাব থেকে দেশকে সম্পূর্ণ মুক্ত না করা পর্যন্ত আমাদিগকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। কারণ আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, জনসাধারণের শত্রুরা ক্ষমতার হাত বদলের মাধ্যমে এবং নূতন, সস্তা ও লোক দেখানো বুলি দিয়ে সব সময়ই নিজেদের শাসন ও শোষণ চালাবার সুচতুর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

১৯৭৫ সালের ৯ নভেম্বর প্রকাশিত মেজর জলিল ও আ স ম আবদুর রবের যৌথ বিবৃতি

তাহেরের সঙ্গে জিয়ার যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে আসে এবং ১২ নভেম্বর থেকে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। ১৫ নভেম্বর 'দেশবাসীর প্রতি মেজর জলিল ও আ স ম রবের আহ্বান' শিরোনামে জাসদ একটি প্রচারপত্র বিলি করে। বক্তব্যে বলা হয় :

> ...এ মাসের (নভেম্বর) প্রথম দিকে, বিশেষ করে ৩ তারিখে, বিশ্বাসঘাতক ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ভারত, রাশিয়া ও আমেরিকার প্ররোচনায় তারা দেশ ও জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্বকে চিরতরে বিলুপ্ত করার চরম আঘাত হানার প্রস্তুতি নিয়েছিল। এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের পূর্বমুহূর্তেই বাংলার বিপ্লবী সিপাহিরা, বিপ্লবী গণবাহিনী ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুবক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবীসহ সব দেশপ্রেমিক নাগরিকের সমর্থন ও সক্রিয় সহায়তায় আঘাত হানল শত্রুর দুর্গে। মুক্ত করল মৃত্যুর কবল থেকে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে, মুক্ত করল আমাদেরকে।...কিন্তু ভুললে চলবে না যে, আমাদের এ বিজয় অত্যন্ত সাময়িক।...আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, দেশীয় শোষক ও সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদের দালালেরা তাদের প্রভুদের ইঙ্গিতে নতুন পোশাক পরে আবার জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। এদের সমূলে উৎখাত না করা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।...

জলিল ও রব বাকশালকে বাদ দিয়ে সকল প্রকাশ্য ও গোপন রাজনৈতিক দল নিয়ে একটি 'অন্তর্বর্তীকালীন গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকার' গঠন এবং অবিলম্বে সামরিক আইন বাতিলের দাবি জানান। অন্যান্য দাবির মধ্যে ছিল সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার দূতাবাস সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া, জাতিসংঘের কাছে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে নালিশ জানানো, সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি ও সকল প্রকার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহার করা ইত্যাদি।

জাসদের নেতাদের একটা গোপন সভা ১৫ নভেম্বর রায়েরবাজারে একটা কাঠের আড়তে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তাঁরা বলেন, 'জিয়া বিট্রে করেছে।' জলিল বলেন, 'ভয়ের কোনো কারণ নাই। বঙ্গভবনের সামনে যেসব ট্যাংক আছে, ওরা আমার সঙ্গে কথা বলে গেছে।'[৩৫]

নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ঢাকার এলিফ্যান্ট রোডে শাজাহান সিরাজের বাড়িতে জলিলের অনুরোধে তাঁর সঙ্গে সাংবাদিক আমানউল্লাহ দেখা করতে যান। আমানউল্লাহর বর্ণনামতে :

> জলিলকে খুব অস্থির মনে হচ্ছিল। জিয়া সম্পর্কে ক্ষোভের সঙ্গে বলল, 'দ্যাট বাস্টার্ড হ্যাজ বিট্রেইড (বেজন্মাটা বেইমানি করেছে)।'[৩৬]

বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার

পক্ষ থেকে

দেশবাসীর প্রতি

বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার একটি প্রচারপত্র

ইতিমধ্যে সৈনিকেরা বেশির ভাগই সেনানিবাসে ফিরে গেছেন। তাহের বিভিন্ন সেনানিবাসে তাঁর অনুগত লোকদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন। ২৩ নভেম্বর এলিফ্যান্ট রোডে শাজাহান সিরাজের বাড়ি থেকে রবকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। একই দিন জলিল, আবু ইউসুফ ও ইনু গ্রেপ্তার হন। ২৪ নভেম্বর বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার কয়েকজনকে নিয়ে তাহের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলের আবাসিক শিক্ষক ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের লেকচারার মোস্তফা সরোয়ার বাদলের বাসায় সভা করার সময় নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনী তাঁদের ঘিরে ফেলে। তাহের কয়েকজন সহযোগীসহ গ্রেপ্তার হন। মোস্তফা সরোয়ার বাদলও গ্রেপ্তার হন।[৩৭] গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাহেরের উপলব্ধি হয়, 'তিনি ৭ নভেম্বর যাঁদের ক্ষমতায় এনেছেন, তাঁরা তাঁর সঙ্গে বেইমানি করেছে।'[৩৮]

ঢাকা নগর গণবাহিনীর কমান্ডার আনোয়ার হোসেন একটি পরিকল্পনা আঁটেন, যা এ দেশে এর আগে কখনো ঘটেনি। ছয়জনের একটা দল তৈরি হয়—সুইসাইড স্কোয়াড। দলের সদস্যরা হলেন সাখাওয়াত হোসেন বাহার, ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল, মীর নজরুল ইসলাম বাচ্চু, মাসুদুর রহমান, হারুনুর রশীদ ও সৈয়দ বাহারুল হাসান সবুজ।

প্রথমে মতিঝিলে আদমজী কোর্টে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস 'রেকি' করা হয়। পরে সিদ্ধান্ত বদল করে ধানমন্ডির ২ নম্বর সড়কে ভারতীয় হাইকমিশন

'রেকি' করা হয়। ঠিক হয়, গণবাহিনীর একটি দল হাইকমিশনে গিয়ে হাইকমিশনারকে জিম্মি করে তাহেরের মুক্তি এবং আরও কিছু দাবিদাওয়া উপস্থাপন করবে। তারা খোঁজ নিয়ে জেনেছে, হাইকমিশনার সমর সেন সকাল সাড়ে নয়টায় অফিসে আসেন।

২৬ নভেম্বর সময়মতো ছয়জন অকুস্থলে হাজির হলেন। দলের নেতা বাহার। তিনজন অবস্থান নিলেন রাস্তার দক্ষিণ পাশে জার্মান সাংস্কৃতিক

১৯৭৫ সালের ২৬ নভেম্বর ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনে পরিচালিত এক অভিযানে নিহত গণবাহিনীর চার সদস্য : (ওপর থেকে ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী) বাহার, বাচ্চু, মাসুদ ও হারুন

কেন্দ্রের চত্বরে। তিনজন অপেক্ষা করতে থাকলেন ভারতীয় ভিসা অফিসের সামনে। সবাই সশস্ত্র। এমন সময় হাইকমিশনার এসে গাড়ি থেকে নামলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাহারদের দলের দুজন তাঁর দুই হাত ধরে বললেন, 'আপনি এখন আমাদের হাতে জিম্মি। আপনার ঘরে চলুন। আপনার সঙ্গে আমাদের কিছু কথা আছে।' সিঁড়ি দিয়ে একতলা থেকে দোতলায় যাওয়ার পথে ওপরে অপেক্ষমাণ নিরাপত্তারক্ষীরা ব্রাশফায়ার করলে ঘটনাস্থলেই বাহার, বাচ্চু, মাসুদ ও হারুন নিহত হন। বেলাল ও সবুজ আহত হন। হাইকমিশনারের কাঁধে গুলি লেগেছিল। চোখের পলকে ঘটনা ঘটে গেল। রেকি করার সময় কজন নিরাপত্তারক্ষী ঠিক কোন কোন জায়গায় ডিউটি করেন, তা তাঁরা জেনে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা জানতেন না, একদল ভারতীয় নিরাপত্তারক্ষী দোতলায় পাহারায় থাকেন।[৩৯]

তিতুমীর কলেজ ছাত্রসংসদের সহসভাপতি কামালউদ্দিন আহমেদ এই অভিযানে অংশগ্রহণকারী ছয়জনের জন্য মগবাজারের নয়াটোলায় একটা শেল্টারের ব্যবস্থা করেছিলেন। ছাত্রসংসদের সহসম্পাদক ফোরকান শাহর বাড়িটি শেল্টার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। সেখান থেকেই এই স্কোয়াডের ছয়জন ২৬ নভেম্বর সকালে রওনা হয়েছিলেন। ঘটনার পর ফোরকানের বাবা ইসরাফিল সাহেবকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।[৪০]

সংবাদ পেয়ে সেনাবাহিনীর নবনিযুক্ত চিফ অব জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার আবুল মঞ্জুর এলেন। তিনি আহত বেলাল ও সবুজকে তাঁর গাড়িতে উঠিয়ে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নিয়ে গেলেন।[৪১]

বাহার, বাচ্চু, মাসুদ ও হারুনের মৃতদেহ পুলিশের জিম্মায় দেওয়া হয়। ভারতীয় দূতাবাসের পেছনে ৩ নম্বর সড়কে থানার পোর্টিকোর নিচে একটা ভ্যানে মৃতদেহগুলো রাখা ছিল। কামাল ও তাঁর বন্ধু ওয়াহিদুল ইসলাম গুটুল থানায় যান মৃতদেহগুলো দেখতে। গুটুলের বাবা শফিকুল ইসলাম ছিলেন পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর। তিনি তাঁদের দ্রুত সরে যেতে বলেন।[৪২]

ভারতীয় হাইকমিশনে এই অভিযানের ব্যাপক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। প্রায় সব রাজনৈতিক দলের নেতারা এক সুরে এর সমালোচনা করতে শুরু করলেন, ডান-বাম কোনো ভেদাভেদ থাকল না। তাঁরা কয়েকজন মিলে একটা যৌথ বিবৃতি দিলেন। বিবৃতিটা ছিল এরকম :

> আমরা একদল লোকের এহেন কাপুরুষোচিত ও জঘন্য অপচেষ্টার তীব্র নিন্দা করিতেছি। ঘটনাটি দৃশ্যতই রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিমূলক এবং বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই

ইহা করা হইয়াছে। ভারতীয় হাইকমিশনারের উপর পরিচালিত আক্রমণ প্রতিহত করিবার ক্ষেত্রে কর্তব্যরত বাংলাদেশ পুলিশ ও রক্ষীদের উপযুক্ত এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আমরা প্রশংসা করি।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন আতাউর রহমান খান, তোফাজ্জল আলী, আলীম আল রাজী, মশিয়ুর রহমান, শাহ আজিজুর রহমান, অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ, আসাদুজ্জামান খান, কাজী জাফর আহমদ, অলি আহাদ ও রাশেদ খান মেনন।[৪৩]

সিরাজুল আলম খান যদিও পার্টি ফোরামের সমন্বয়কারী ছিলেন, তাঁর সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ করা সম্ভব হতো না। ফোরামের কার্যকরী সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করতেন শরীফ নুরুল আম্বিয়া। ২৬ নভেম্বর দুপুরে আনোয়ারের কাছ থেকে আম্বিয়া টেলিফোনে জানতে পারেন, ধানমন্ডিতে একটা ঘটনা ঘটে গেছে। আনোয়ার স্পষ্ট করে বলেননি কী ঘটেছে। বিধানকৃষ্ণ সেন টেলিফোনে আম্বিয়াকে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ঘটনাটির বিবরণ দিয়ে জানতে চান, 'হঠকারিতা করে সবাইকে ফাঁসানোর মতলব করছে কারা?' আম্বিয়া উত্তরে বলেন, তিনি এর বিন্দু-বিসর্গও জানেন না। ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি নিজেও স্তম্ভিত। জাসদের নেতারা কেউ এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল নন।[৪৪] ঢাকা নগর গণবাহিনীর রাজনৈতিক কমিসার রফিকুল ইসলাম তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের মাঠে বসে ছিলেন। একজন এসে তাঁকে ভারতীয় হাইকমিশনে ঘটে যাওয়া বিষয়টি সম্পর্কে জানালে তিনি বিস্মিত হন এবং ভাবতে থাকেন, তাঁর অজান্তে এত বড় একটা ঘটনা কীভাবে ঘটল![৪৫]

তবে বোঝা যায়, বেশ কয়েক দিন ধরেই এই মিশনটি নিয়ে পরিকল্পনা হচ্ছিল। স্কোয়াডের অন্যতম সদস্য নজরুল ইসলাম বাচ্চু গণবাহিনীর সদস্য ও লালমাটিয়া কলেজের ছাত্রী আয়েশা পারুলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। পারুল থাকতেন কলেজের হোস্টেলের দোতলার একটা কামরায়। বাচ্চু তাঁর কাছে একটা ট্রাংকে বেশ কিছু কাগজপত্র রেখেছিলেন। তিনি কয়েক দিন আগে পারুলকে বলেছিলেন, 'একটা রেকি হবে। দলে একজন মেয়ে থাকতে হবে। আমি যাব না, তবে আপনাকে যেতে হবে।' পারুলের আর রেকিতে যাওয়া হয়নি। ২৫ নভেম্বর বিকেলে বাচ্চু হোস্টেলে এসে পারুলের সঙ্গে দেখা করে জানান, 'আগামীকাল সকালে একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। দুপুরে রেডিওর খবর শুনবেন।'

২৬ নভেম্বর রেডিওতে সব শুনে পারুল হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। পরদিন হোস্টেলে তাঁর খোঁজে পুলিশ আসে। হোস্টেলের সুপার নূরুন্নাহার বেগম এবং

পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক বদিউজ্জামান ঘটনা সামাল দেন। পারুলের বিষয়টি তাঁরা দেখেন খুবই সহানুভূতির সঙ্গে। বদিউজ্জামানের শ্যালক খায়ের এজাজ মাসুদ ছিলেন জাসদ পার্টি ফোরামের ইমার্জেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য। বাচ্চু ছিলেন তিতুমীর কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র এবং স্কোয়াডের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী। তিনি ছিলেন অভিনেতা বেবী জামানের ভাগনে। পারুল বাচ্চুর স্বজনদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। বাচ্চুকে হারিয়ে তাঁর মা পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন।[৪৬]

ঢাকার পূর্ব পাশে বেরাইদ গ্রামে ঢাকা নগর গণবাহিনীর একটা জরুরি সভায় আনোয়ার হোসেন এই ঘটনার সব দায় স্বীকার করেন। সভায় শরীফ নুরুল আম্বিয়া এবং ঢাকা নগর গণবাহিনীর অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন। অধিকাংশ সদস্য আনোয়ারের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করে তাঁকে ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠানোর দাবি জানান। শেষে তাঁকে লঘু শাস্তি দেওয়া হয়। তাঁকে নগর গণবাহিনীর কমান্ডারের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।[৪৭] আনোয়ারের ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকার 'অপরাধে' রাজনৈতিক কমিসার রফিকুল ইসলামকে ভর্ৎসনা করা হয়। এত বড় একটা ঘটনা সিরাজুল আলম খানের সম্মতি ছাড়া ঘটতে পারে বলে অনেকেরই বিশ্বাস হয়নি। আবুল হাসিব খান কিছুদিনের জন্য ভারপ্রাপ্ত কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। পরে মানিকগঞ্জের গণবাহিনীর কমান্ডার আনিসুর রহমান খানকে ঢাকা নগর গণবাহিনীর কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।[৪৮]

ভারতীয় হাইকমিশনে অভিযান চালানোর কয়েক দিন আগে সৈনিক সংস্থা ও গণবাহিনীর কয়েকজন সদস্য রায়ের বাজারে বসবাসকারী জনৈক জয়নুল হক শিকদারের কাছ থেকে দুটো পিস্তল জোর করে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা সেনাবাহিনীর একটা জিপ নিয়ে গিয়েছিলেন। পিস্তলগুলো লাইসেন্স করা ছিল। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ অন্য অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে এই পিস্তল দুটোও উদ্ধার করে। পরে অনুসন্ধান করে পুলিশ এগুলোর মালিকের নামধাম জোগাড় করে। শিকদারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। অস্ত্র 'খোয়া যাওয়ার' বিষয়ে পুলিশকে তথ্য না দেওয়ার কারণে শিকদারের জেল হয়।[৪৯]

জাসদের পার্টি ফোরাম থেকে ২৬ নভেম্বরের ঘটনার বিষয়ে একটা সার্কুলার প্রকাশ করা হয়। ভারতীয় হাইকমিশনে অভিযানকে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়, যাঁরা এটা করেছেন, তাঁরা 'বিপ্লবীও নন, প্রতিবিপ্লবীও নন। তাঁরা হচ্ছেন অবিপ্লবী।' এটা পড়ে অনেকেই ক্ষুব্ধ হন এবং এ ধরনের মন্তব্যকে তাঁরা নিহতদের প্রতি চরম অবজ্ঞা ও অবমাননা হিসেবে দেখেন।

জাসদের নেতা-কর্মীদের পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য সবাই গা ঢাকা দেন। তবু গ্রেপ্তার এড়ানো কঠিন হয়ে পড়ল। একে একে আখলাকুর রহমান, মোহাম্মদ শাজাহান, আ ফ ম মাহবুবুল হক, মাহমুদুর রহমান মান্না এবং বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার অনেক সংগঠক গ্রেপ্তার হন। পুলিশের একটি দল সুন্দরবনে অভিযান চালিয়ে মেজর জিয়াউদ্দিনকে ধরে নিয়ে আসে। প্রথমে তাঁকে খুলনায় নিয়ে যাওয়া হয়। খুলনা শহরে তখন একটা মেলা চলছিল। মেলা প্রাঙ্গণে তাঁকে বেঁধে রাখা হয়েছিল, যাতে সবাই দেখতে পান।[৫০]

ছিয়াত্তরের জানুয়ারিতে জাসদের পার্টি-প্রক্রিয়ায় কিছু পরিবর্তন আসে। কেন্দ্রীয় ফোরাম ভেঙে দিয়ে একটি 'সেন্ট্রাল অর্গানাইজিং কমিটি' (সিওসি) গঠন করা হয়। এই কমিটিতে ৩৭ জন সদস্য ছিলেন। মনে হচ্ছিল, সারা দেশ জিয়ার নেতৃত্বে জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে নিয়োজিত, সব রাজনৈতিক দল সামরিক সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার কৌশল নিয়েছে। একমাত্র জাসদ থেকে গেল স্রোতের বিপরীতে।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জাসদ চেষ্টা করল একটি 'গণতান্ত্রিক বিরোধী দল' হিসেবে নিজের ভাবমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকারের যৌক্তিকতা তুলে ধরতে গিয়ে ১৯৭৬ সালের ২ মার্চ প্রকাশিত এক পুস্তিকায় জাসদ ১৯৭২-৭৫ সালের সরকারের একটা সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করে এভাবে :

> ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘ চার বছর শেখ মুজিবের একদলীয় শাসনামলে পরিকল্পনাহীন অবাস্তব অর্থনীতি, মুদ্রাস্ফীতি, দুর্নীতি, অযোগ্যতা, জেল-জুলুম-সন্ত্রাস, অকথ্য নির্যাতন, চোরাকারবার, মজুতদারি, খুন-রাহাজানি, গুন্ডামি এবং ভারত, রাশিয়া ও আমেরিকা, বিশেষ করে ভারত-রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীলতা গোটা দেশ ও জাতিকে চরম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অরাজকতার মধ্যে ফেলে দেয়। স্বাধীনতা লাভের পরপরই স্বাধীনতাসংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা দেশের মানুষের জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করার জন্য গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকার গঠন এবং পরবর্তীকালে মুজিবের স্বৈরাচারী শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য স্বৈরাচারবিরোধী সর্বদলীয় গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং দাবিও করা হয়।[৫১]

সরকারি বাহিনীগুলোর আক্রমণের মুখে জাসদ ইতিমধ্যে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। ছিয়াত্তরের মার্চে রায়হান ফেরদৌস মধুর সঙ্গে সিরাজুল আলম

গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকারের দাবিসংবলিত পুস্তিকার প্রচ্ছদ

খানের কিছু কথাবার্তা হয়। তৎকালীন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মধু জানতে চেয়েছিলেন, 'জিয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া করে দিশাহারা জাসদ কর্মীদের বাঁচানোর একটা উপায় বের করা যায় কি না। এখন তো তাদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।' সিরাজুল আলম খান টেবিলে জোরে একটা ঘুষি দিয়ে বললেন, 'কী বলিস, তাহেরের ট্রায়াল শুরু হচ্ছে, গণ-অভ্যুত্থান হয়ে যাবে।' জাসদ নেতৃত্ব এটা কোনোভাবেই বুঝতে পারছিলেন না, দেয়ালে তাঁদের পিঠ ঠেকে গেছে।[৫২]

ছিয়াত্তরের ৩১ মার্চ দেশের সব জায়গায় মিছিল আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। এর নাম দেওয়া হলো 'মার্চ মিছিল'। ঢাকার মিছিল প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বঙ্গভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে একটা দাবিনামা পেশ করবে, এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। দাবিসংবলিত একটি প্রচারপত্র বিলি করা হলো সারা দেশে। প্রধান দাবিগুলো ছিল :

— ভারত-রাশিয়া-আমেরিকার প্রভাবমুক্ত শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে হবে।
— ফারাক্কা সমস্যার সম্মানজনক সমাধান করতে হবে।
— চীনের সঙ্গে বাস্তব, কার্যকর ও স্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে।

গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকার কায়েম করুন

স্বাধীনতা রক্ষা

ক) রুশ-ভারত-আমেরিকার প্রভাবমুক্ত শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে,
খ) ভারতের হামলা রুখতে হবে।
গ) ফারাক্কা সমস্যার সম্মানজনক সমাধান করতে হবে।
ঘ) চীনের সঙ্গে ব্যাপক, কার্যকরী ও স্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

ক) নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করতে হবে।
খ) সত্বর অবাধ, নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে। নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের নিশ্চয়তা দিতে হবে।
গ) রাজনৈতিক সংগঠন ও মিটিং-মিছিলের অধিকার এবং বাক, ব্যক্তি, সংবাদপত্র ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা দিতে হবে।
ঘ) মেজর জলিল, আ. স. ম. আবদুর রব সহ সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দিতে হবে এবং সকল প্রকার নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।
ঙ) বাঙালী জাতীয়তাবোধ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, শহীদবৃন্দ, শহীদ মিনার, একুশে ফেব্রুয়ারী, বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের যথার্থ মর্যাদা দিতে হবে।
চ) শ্রমিক, বিভিন্ন কর্মচারী, ক্ষেতমজুরদের অবাধে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিতে হবে।
ছ) গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে।
জ) সিপাহীদের দাবীসমূহ মানতে হবে।

গণমুখী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা

ক) শ্রমিক কর্মচারীদের ও নিম্নতম মাসিক বেতন ৩০০ টাকা ধার্য করতে হবে এবং সে অনুপাতে অন্যান্য শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ করতে হবে।
খ) দেশব্যাপী শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, ছাত্র, শিক্ষক, গরীব কর্মচারীদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রেশন দিতে হবে। [illegible] বন্ধ করাতে হবে।

গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকারের দাবিতে জাসদের প্রচারপত্র

— নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করতে হবে।
— সকল রাজবন্দীর মুক্তি দিতে হবে।
— সেপাইদের দাবিগুলো মানতে হবে।
— শ্রমিক-কর্মচারীদের নিম্নতম মাসিক বেতন ৩০০ টাকা ধার্য করতে হবে।
— বর্তমান সামরিক সরকারের পরিবর্তে সর্বদলীয় ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ঘোষণা করা হয়, মিছিল থেকে দুজন প্রতিনিধি, সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য আবদুল্লাহ সরকার এবং জাসদ জাতীয় কমিটির সহসভাপতি এহসান আলী খান রাষ্ট্রপতির কাছে দাবিনামা পেশ করবেন। প্রচারপত্রটি ছাপা হয় জাসদ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ ও বিপ্লবী গণবাহিনীর যৌথ নামে।

পুলিশ ও সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী 'মার্চ মিছিল'টি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। মিছিলটি ছিল শান্তিপূর্ণ। ছয় শতাধিক নেতা-কর্মীকে মিছিল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।[৫৩]

১০ মে রাজশাহী জেল থেকে রাষ্ট্রপতি সায়েমকে লেখা এক চিঠিতে আবু তাহের '৭ নভেম্বরের সকালে গৃহীত নীতিমালা' মেনে চলার আহ্বান জানান।

সরকারী হামলা নির্যাতন এবং গ্রেফতার উপেক্ষা করে

৩১শে মার্চের কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়েছে

এপ্রিল ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত জাসদের পত্রিকা, 'লড়াই'-এর একটি সংখ্যা

তিনি সব রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি এবং ১৯৭৬ সালের অক্টোবরের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানান।[৫৪]

জাসদ ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়ছিল। এই দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে 'দেশদ্রোহিতা' ও 'অরাজকতা' সৃষ্টির অভিযোগ এনে নির্যাতনের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। গ্রেপ্তারকৃত ও পলাতক নেতাদের 'প্রহসনের বিচার' ও দলকে বেআইনি ঘোষণার আশঙ্কা করা হচ্ছিল। এ সময় পার্টি একটি মূল্যায়নের চেষ্টা করে এবং কিছুটা 'পিছু হটার' কৌশল নেয়। *সাম্যবাদ*-এর ষষ্ঠ সংখ্যায় একটি বিশ্লেষণে বলা হয় :

> এমতাবস্থায় রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে গায়ে পড়ে কোনোরূপ শক্তি পরীক্ষায় যাওয়া আমাদের উচিত হবে না, উচিত হবে না এমন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা, যাতে শত্রুরা অপপ্রচারের সুযোগ পায় এবং সে অপপ্রচারের দরুন জনগণেরও মনে হতে পারে যে জাসদ বুঝি সত্যি সত্যিই ঐক্যবিরোধী এবং জাসদই বুঝি গণতন্ত্র, নির্বাচন ও শান্তির অন্তরায়। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাদের আজকের প্রধান দায়িত্বই হচ্ছে জনগণের মধ্য থেকে বুর্জোয়া গণতন্ত্র-সম্পর্কিত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রধানত নিঃশেষ করে আনা।...

।। ষষ্ঠ সংখ্যা ।।

১লা, জুলাই
১৯৭৬

১৯৭৬ সালের ১ জুলাই প্রকাশিত 'সাম্যবাদ'-এর ষষ্ঠ সংখ্যার প্রচ্ছদ

> প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকা প্রয়োজন, সর্বপ্রকার সন্ত্রাসবাদী ঝোঁক ও বেধড়ক খতম অভিযানের প্রবণতা চূড়ান্ত বিচারে অমার্ক্সবাদী ও বিপ্লবের পক্ষে ক্ষতিকর বিধায় আমাদের এরূপ ঝোঁক ও প্রবণতা থেকে সর্বদাই মুক্ত থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, চাপিয়ে দেওয়া হামলাকে মোকাবিলা করা এক কথা, কিন্তু খতম অভিযান, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতা ইত্যাদির মাধ্যমে মোকাবিলাকে ডেকে নিয়ে আসা ভিন্ন কথা। বিশ্বের দেশে দেশে সন্ত্রাসবাদীরা, নিহিলিস্ট-নারদনিকেরা চরমতম মূল্যের বিনিময়ে যে উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছে—আমরা কোনোক্রমেই তার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারি না।[৫৫]

ছিয়াত্তরের ২১ জুন সামরিক সরকার জাসদ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ, গণবাহিনী ও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার ৩৩ জনের বিরুদ্ধে একটি গোপন বিচার-প্রক্রিয়া শুরু করে। এঁদের মধ্যে ১৬ জন ছিলেন সশস্ত্র বাহিনীতে চাকরিরত। রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে তাঁদের অভিযুক্ত করা হয়। মামলার

শিরোনাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম মেজর জলিল ও অন্যান্য'। অভিযুক্তরা ছিলেন মেজর এম এ জলিল, আ স ম আবদুর রব, লে. কর্নেল আবু তাহের, হাসানুল হক ইনু, আনোয়ার হোসেন, আবু ইউসুফ খান, রবিউল আলম সরদার, সালেহা বেগম, মোহাম্মদ শাজাহান, মাহমুদুর রহমান মান্না, আখলাকুর রহমান, কে বি এম মাহমুদ, ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল, আনোয়ার সিদ্দিক, মেজর জিয়াউদ্দিন, নায়েব সুবেদার বজলুর রহমান, হাবিলদার মেজর সুলতান আহমদ, নায়েব সুবেদার আবদুল লতিফ আখন্দ, নায়েক সিদ্দিকুর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট কাজী রোকন উদ্দিন, সার্জেন্ট কাজী আবদুল কাদের, সার্জেন্ট সৈয়দ রফিকুল ইসলাম, করপোরাল শামসুল হক, করপোরাল আবদুল মজিদ, হাবিলদার আবদুল হাই মজুমদার, হাবিলদার শামসুদ্দিন, সিরাজুল আলম খান, শরীফ নুরুল আম্বিয়া, মহিউদ্দিন, হাবিলদার বারেক, নায়েক আবদুল বারী, নায়েব সুবেদার জালাল ও করপোরাল আলতাফ হোসেন। অভিযুক্তদের মধ্যে সাতজন ছিলেন 'পলাতক'। এ ছাড়া সাতজন রাজসাক্ষী হয়েছিলেন। তাঁরা হলেন হাবিলদার আবদুল বারী, করপোরাল ফকরুল আলম, করপোরাল মোজাম্মেল হক, করপোরাল মোয়াজ্জেম হোসেন, লিডিং ক্রাফটম্যান জোবায়ের আনসারী, সিপাহি মইনউদ্দিন এবং নায়েব সুবেদার মাহবুব। সালেহা বেগম ছিলেন অভিযুক্তদের মধ্যে একমাত্র নারী। তিনি একসময় যশোর জেলা ছাত্রলীগের সভানেত্রী ছিলেন। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আলাদা আলাদা অভিযোগ আনা হয়েছিল।

কর্নেল ডি এস ইউসুফ হায়দারকে চেয়ারম্যান করে পাঁচ সদস্যের একটি সামরিক আদালত গঠন করা হয়। আদালতের অন্য সদস্যরা ছিলেন কমান্ডার সিদ্দিক আহমদ, উইং কমান্ডার মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবদুল আলী এবং ম্যাজিস্ট্রেট মো. হাসান মোরশেদ।

সরকারপক্ষের কৌসুলি ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এ টি এম আফজাল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আবদুল ওহাব এবং পিপি আবদুর রাজ্জাক। অভিযুক্তদের পক্ষে ১৬ জন আইনজীবী ছিলেন। তাঁরা হলেন আতাউর রহমান খান, জুলমত আলী খান, কে জেড আলম, আমিনুল হক, মো. জিনাত আলী, এ কে মুজিবুর রহমান, সিরাজুল হক, মহিউদ্দিন আহমেদ, আবদুর রউফ, কাজী শাহাদাত হোসেন, শরফুদ্দিন চাকলাদার, খাদেমুল ইসলাম, আবদুল হাকিম, শামসুর রহমান, শরফুদ্দিন ভূঁইয়া এবং এ টি এম কামরুল ইসলাম।

আদালত বসে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতরে। প্রথম দিন রোল কল হয়। দুবার নাম ডাকা সত্ত্বেও সার্জেন্ট রফিকুল ইসলাম সাড়া দেননি। তখন একজন তাঁকে চিনিয়ে দিলে তিনি বলেন, 'আমার নাম ঠিকভাবে ডাকা হয়নি বলে আমি জবাব দিইনি।' চেয়ারম্যান বললেন, 'আপনার নাম তো সৈয়দ রফিকুল ইসলাম।' রফিক জবাবে বললেন, 'না, আমার নাম সৈয়দ রফিকুল ইসলাম বীর প্রতীক। পুরো নাম না বললে আমি জবাব দেব না।' আদালত তাঁর দাবি মেনে নেন।

দ্বিতীয় দিনেও গোলমাল হলো। সার্জেন্ট রফিক এফআইআর দেখতে চাইলেন। যখন আদালত থেকে বলা হলো, এটা এখন সরবরাহ করা যাবে না, তখন সার্জেন্ট রফিক বললেন, 'তাহলে আমাকে যেতে দিন, আমি আমার সেলে গিয়ে বিশ্রাম নেব।' চেয়ারম্যান রেগে গিয়ে বললেন, 'শাট আপ অ্যান্ড সিট ডাউন।' সার্জেন্ট রফিক চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ্য করে জুতা ছুড়ে মারলেন। দেখাদেখি আরও কয়েকজন জুতা ছুড়লেন। রব দৌড়ে দরজার কাছে গিয়ে স্লোগান দিতে শুরু করলেন। আদালতের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা দৌড়ে পালালেন। ওই দিনের মতো আদালত পণ্ড হয়ে গেল। পরদিন থেকে তাঁদের আদালতকক্ষে খালি পায়ে হাতকড়া পরিয়ে আনা হলো। এভাবেই চলতে থাকল আদালতে আসা-যাওয়া। অভিযুক্ত ও বিচারকদের বসার জায়গার মাঝখানে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হলো। আদালত চলার সময় অভিযুক্তরা এমন ভাব করতেন, যেন তাঁরা কোনো জায়গায় বসে আড্ডা দিচ্ছেন। এই 'অবৈধ আদালতের' কার্যক্রমের ব্যাপারে তাঁদের কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না। হয়তো কেউ কারও কোলের ওপর মাথা রেখে শুয়ে থাকেন, কেউ-বা আপন মনে গলা ছেড়ে গান ধরেন :

> মা, আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে
> তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে লড়তে জানি...[৫৬]

আদালতে মামলা শুরু হওয়ার দু-তিন দিন পর এমন একটা ঘটনা ঘটল, যা ব্যাখ্যার অতীত। আখলাকুর রহমানের সঙ্গে সার্জেন্ট সৈয়দ রফিকুল ইসলামের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তিনি সার্জেন্ট রফিককে ডেকে বললেন, 'ওবা, কর্নেল তাহেরের তো ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট অইব।' রফিক বিস্মিত হলেন, এই মামলায় এ ধরনের সাজা হতেই পারে না। তিনি আখলাকুর রহমানকে বললেন, 'আফনে কী কন? এইডা অসম্ভব। অইতেই পারে না।' আখলাকুর রহমান আপন মনেই বলে উঠলেন, 'সুলতান ফকির কইছেন।' সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর থানার রূপসদি গ্রামের জনৈক সুলতান ফকির জেলগেটে আখলাকুর রহমানের সঙ্গে দেখা করে এই কথা বলে

গেছেন। সার্জেন্ট রফিক ভেবে পেলেন না, তাঁর বাড়ির পাশের গাঁয়ের এই ফকিরকে তিনি চেনেন না, অথচ সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরের আখলাকুর রহমান কী করে এই ফকিরের খোঁজ পেলেন? সিলেটের কিংবদন্তি সাধক শাহ নাসিরউদ্দিনের বংশধর আখলাকুর রহমান মনে করতেন, সুলতান ফকির জালালির মধ্য দিয়ে হজরত শাহজালালের পুনর্জন্ম হয়েছে।[৫৭]

১৬ জুলাই বিকেলে তাহের করপোরাল মজিদকে তাঁর সেলে ডেকে নিলেন। বললেন, 'আমাদের অনেক ভুলভ্রান্তি হয়েছে। নেক্সট টাইম আমরা আরও কেয়ারফুল হব। এয়ারফোর্সকে রি-বিল্ড করতে হবে।'

ছিয়াত্তরের ১৫ জুলাই রায় ঘোষণার কথা ছিল। রায় দেওয়া হলো ১৭ জুলাই। রায় ঘোষণার সময় অভিযুক্তরা সবাই হইচই, চিৎকার করছিলেন।[৫৮]

রায়ে তাহের, জলিল ও আবু ইউসুফের ফাঁসির আদেশ হয়। পরে রায় সংশোধন করে জলিল ও ইউসুফকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন মেজর জিয়াউদ্দিন (১২ বছর), আ স ম আবদুর রব, হাসানুল হক ইনু ও আনোয়ার হোসেন (প্রত্যেকের ১০ বছর), সিরাজুল আলম খান, করপোরাল আলতাফ হোসেন ও করপোরাল শামসুল হক (প্রত্যেকের সাত বছর), নায়েব সুবেদার মোহাম্মদ জালালউদ্দিন, হাবিলদার এম এ বারেক, রবিউল আলম, সালেহা বেগম ও নায়েক সিদ্দিকুর রহমান (প্রত্যেকের পাঁচ বছর) এবং হাবিলদার আবদুল হাই মজুমদার ও করপোরাল আবদুল মজিদ (প্রত্যেকের এক বছর)। কারাদণ্ডের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেককে বিভিন্ন অঙ্কের জরিমানা এবং অনাদায়ে তিন মাস থেকে দুই বছর পর্যন্ত অতিরিক্ত কারাবাসের আদেশ দেওয়া হয়। যাঁরা 'বেকসুর খালাস' পান, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আখলাকুর রহমান, আনোয়ার সিদ্দিক, মহিউদ্দিন, নায়েব সুবেদার বজলুর রহমান, মাহমুদুর রহমান মান্না, ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল, মো. শাজাহান, কে বি এম মাহমুদ, শরীফ নুরুল আম্বিয়া, হাবিলদার সুলতান হামিদ, নায়েক আবদুল বারী, সার্জেন্ট কাজী আবদুল কাদের, কাজী রোকনউদ্দিন, নায়েব সুবেদার আবদুল লতিফ আখন্দ, নায়েক শামসুদ্দিন ও সার্জেন্ট সৈয়দ রফিকুল ইসলাম। আদালতের শুনানির ওপর কোনো রকমের তথ্য বাইরে প্রকাশ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ২১ জুলাই ভোর চারটায় তাহেরের ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

তাহের ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, প্রাণবন্ত ও আশাবাদী। রায় ঘোষণার পর থেকে তাঁকে কখনো মন খারাপ করতে দেখা যায়নি। তিনি যখন ফাঁসির মঞ্চের দিকে হেঁটে যান, তখনো তিনি ছিলেন দৃপ্ত, অবিচল।[৫৯]

৩১শে জুলাই, শনিবারে দেশব্যাপী

হরতাল

বর্তমান সামরিক জান্তার অবৈধ আদালতে ৭ই নভেম্বর সিপাহী গণ-অভ্যুত্থানের মহানায়ক, এগারো নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমাণ্ডার কর্ণেল তাহেরকে মৃত্যুদণ্ড; জাসদ সভাপতি মেজর জলিলকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড; জাসদ সম্পাদক আ. স. ম. আবদুর রবকে দশ বছর কারাদণ্ড এবং হাসানুল হক ইনু, মেজর জিয়াউদ্দিন, অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, আবু ইউসুফ খান ও সিরাজুল আলম খান সহ সতেরো জনকে বিভিন্ন মেয়াদী কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

১৯৭৬ সালের ৩১ জুলাই হরতালের ঘোষণাসংবলিত প্রচারপত্র

'ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলার রায় মানি না'—এই স্লোগান ব্যবহার করে জাসদ ৩১ জুলাই হরতাল আহ্বান করে। হরতাল সফল করার জন্য ঢাকা নগর গণবাহিনীর কয়েকটি ইউনিটের সদস্যরা প্রস্তুতি নেন। কামরাঙ্গীরচরে হুসেনের ঘরে বাদল, মুশতাক, ইদ্রিস, ইয়াকুব এবং আরও কয়েকজন ৩০-৪০টি 'নিখিল' বানিয়েছিলেন। একটাও ফাটেনি। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তপন কুমার সাহা জুরাইনের একটি বাড়িতে বোমা বানাতে গিয়ে বিস্ফোরণে নিহত হন। ঘটনাটি ছিল খুবই মর্মান্তিক।[৬০]

৩১ জুলাই কোথাও হরতাল হয়নি। জাসদ সমাজ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অনেক জায়গায় কর্মীরা কোনো শেল্টার পাচ্ছেন না। কোথাও কোথাও জনতা তাঁদের ধরে পুলিশে সোপর্দ করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণবাহিনীর সদস্য আবু আলম শহীদ খান গুলিস্তান ভবনে চলচ্চিত্র নির্মাতা কাজী জহিরের অফিসে চাঁদা আনতে গেলে অফিসের কর্মচারীরা তাঁকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন।[৬১] জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্য ও গণসংযোগ সম্পাদক শাহ আলম মগবাজারে চীনা দূতাবাসের একটি অফিসে প্রচারপত্র দিতে গেলে দূতাবাসের কর্মচারীরা তাঁকে ধাওয়া করেন। তিনি দেয়াল টপকে কোনোমতে পালাতে সক্ষম হন।[৬২]

সময়টা বৈরী। চারদিকে পরাজয় ও হতাশা। সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেছে। যে তারুণ্যের শক্তি নিয়ে জাসদ একদিন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, চার বছরের মাথায় তা প্রায় নিঃশেষিত।

তাহেরের ফাঁসি নিয়ে বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দল বা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় মাথা ঘামায়নি। দলের তরুণদের কাছে এটা ছিল একটা ভীষণ দুঃখজনক ঘটনা। রায়হান ফেরদৌস মধুর উদ্যোগে একটা কবিতা সংকলন বের করা হলো। তাহেরকে নিয়ে লিখলেন অনেকেই। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাশুক চৌধুরী, অসীম সাহা, আবু করিম, মোহন রায়হান প্রমুখ। অসীম সাহার একটা কবিতার কয়েকটা লাইন ছিল এরকম :

> তাহের তাহের বলে ডাক দিই
> ফিরে আসে মৃত্যুহীন লাশ
> কার কণ্ঠে বলে ওঠে আকাশ বাতাস
> বিপ্লব বেঁচে থাক তাহের সাবাশ।

এই মামলায় যাঁরা খালাস পেয়েছিলেন, তাঁদের অনেককেই দীর্ঘদিন জেলে বন্দী রাখা হয়েছিল বিশেষ ক্ষমতা আইনের মাধ্যমে। এঁদের একজন ছিলেন সার্জেন্ট সৈয়দ রফিকুল ইসলাম। তাঁকে কখনো এক মাস, কখনো ১৫ দিন, কখনো বা এক সপ্তাহের আটকাদেশ দিয়ে আটকে রাখা হতো। ষোলো মাস পর সাতাত্তর সালের নভেম্বরে তিনি জেল থেকে ছাড়া পান।[৬৩]

৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান, জাসদ-গণবাহিনীর হঠাৎ জড়িয়ে পড়া, জিয়ার সঙ্গে তাহেরের সখ্য এবং পরিণামে প্রতারণার শিকার হওয়া—এসব দলের মধ্যে অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। এ ছাড়া তাহেরের আগবাড়িয়ে জিয়াকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, এমনকি রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া নিয়েও বিতর্ক হয়। জাসদের মতো একটা গণমুখী রাজনৈতিক গণসংগঠনের এরকম 'সামরিকীকরণ' কতটুকু কাঙ্ক্ষিত ছিল, এ নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়। এসব বিষয়ে দলের পক্ষ থেকে একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা হয়। পঁচাত্তরের ডিসেম্বরে দলের এক মূল্যায়নে বলা হয় :

> ৭ নভেম্বর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে কোনো প্রকার সরকারি আদেশ ব্যতীতই বিপ্লবী সিপাহি ও বিপ্লবী গণবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠার পেছনে একটিমাত্র যুক্তি ছিল তা হলো, নিদেনপক্ষে জিয়াউর রহমান হয়তো বা এত তাড়াতাড়ি কোনো বিদেশি শক্তির কাছে মাথা নত করবেন না, আত্মমর্যাদা বিকিয়ে দেবেন না—বিপ্লবী সিপাহিসহ সাধারণ জনতার ওপর এত শিগগির অত্যাচারের স্টিম রোলার চালাবেন না, অন্তর্বর্তীকালীন গণতান্ত্রিক জাতীয়

সরকার গঠন করবেন এবং অতীতের ভুলভ্রান্তি থেকে কিছুটা হলেও শিক্ষা গ্রহণ করবেন। কিন্তু ক্ষমতায় আসীন হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই জিয়াউর রহমান ও তাঁর সঙ্গীরা বেমালুম ভুলে গেলেন তাঁদের চার দিনের বন্দিজীবনের কথা।[৬৪]

জিয়া ও তাহেরের সম্পর্কের বিষয়ে ধোঁয়াশা রয়েই গেছে। এ নিয়ে তাহেরের মনোভাব সামরিক আদালতে দেওয়া তাঁর জবানবন্দিতে কিছুটা উঠে এসেছে সত্য, কিন্তু এটা ছিল অনেক পরে বিচার চলার সময়ের মন্তব্য। ৭ নভেম্বরের ওই মুহূর্তে তাহেরের মনে কী ছিল, তা জানার তেমন কোনো উপায় নেই। এ বিষয়ে তাহের সংসদের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি অধ্যাপক আহমদ শরীফের প্রশ্ন ছিল :

> কর্নেল তাহের সম্বন্ধে আমার একটা জিজ্ঞাসা রয়েই গেল। তা এই, কর্নেল তাহের সিপাহি-জনতার অভ্যুত্থান বলে প্রচার করলেও মূলত এ অবসেনানী কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের সৈন্যদের প্রভাবিত করে তাদের দিয়েই ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট দখল করান। সিপাহি জনতার জাসদী (জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল) নেতা কেন 'পাকিস্তান ও ইসলাম পছন্দ' জিয়াউর রহমানের উপর আস্থা রাখলেন, আর কেনই বা সিআইএ এজেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদকে—যিনি ট্রেইটর সর্বার্থে ও সর্বাত্মকভাবে, তাঁকে বা-ইজ্জত স্বঘরে নিরাপদে বাস করার সুযোগ দিলেন, হত্যা না করে, হাজতে না পাঠিয়ে, বিচারের ব্যবস্থা না করে।[৬৫]

৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের 'ব্যর্থতার' কারণ নিয়ে পরে অনেক আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে। আনোয়ার হোসেনের ভাষ্য অনুযায়ী, অভ্যুত্থানের সামরিক প্রস্তুতি যথেষ্ট থাকলেও রাজনৈতিক প্রস্তুতি ছিল না। প্রকারান্তরে তিনি জাসদ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ আনেন।

> ৬ নভেম্বর কর্নেল তাহের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থাকে নিয়ে যখন অভ্যুত্থানের সামরিক প্রস্তুতি চূড়ান্ত করে ফেলেছেন, তখনো জাসদ নেতৃবৃন্দ ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ ও গণবাহিনীকে রাস্তায় নামানোর প্রাথমিক প্রস্তুতিও নেননি। ঢাকা শহর গণবাহিনীর অধিনায়ক আমি। সরাসরি হাসানুল হক ইনুর অধীনে। তার কাছ থেকেই দলীয় নির্দেশ পেতাম। সে সময় ঢাকায় আমার নেতৃত্বে গণবাহিনীর প্রায় ছয়শত নিয়মিত সদস্য। হাসানুল হক ইনুর কাছ থেকে নির্দেশ চাচ্ছিলাম গণবাহিনীকে সক্রিয় করার। তিনি জানালেন, আপাতত তাদের অভ্যুত্থান সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। শুধু আঞ্চলিক কমান্ডারদের সতর্ক থাকতে বললেন। তার এ সিদ্ধান্তের কারণে শহর গণবাহিনীর আঞ্চলিক কমান্ডারদের পর্যন্ত অভ্যুত্থান সম্পর্কে কিছুই জানানো গেল না।...

> তাহেরকে বলা হয়েছিল—ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ ও গণবাহিনী পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি সহকারে ময়দানে থাকবে। সৈন্যরা ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এসে গণবাহিনীর সদস্যদের সশস্ত্র করবে। ছাত্ররা থাকবে প্রচারের দায়িত্বে এবং শ্রমিকেরা নিয়ন্ত্রণ করবে রাজপথ। এসব আমি জেনেছি পরে। গোপন বিচার চলাকালে। নেতৃত্ব চাইলে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মতো শক্তি তখন জাসদের ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নেতৃত্ব কিছুই করলেন না। কিংবা এমনও হতে পারে যে, তারা শুধু পরিকল্পনার সামরিক অংশটুকু বাস্তবায়নকেই যথেষ্ট মনে করেছেন।[৬৬]

জিয়াকে নিয়ে তাহের যে জুয়া খেলেছিলেন, তার মূল্য যে শুধু তিনি দিয়েছেন, তা নয়। মূল্য দিতে হয়েছে পুরো দলকে, জাসদের হাজার হাজার কর্মীকে। অনেককে পলাতক জীবন বেছে নিতে হয়। কিছু কিছু ষড়যন্ত্রও হয়। চক্রান্ত করে সিরাজুল আলম খানকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ঢাকা নগর জাসদের কোষাধ্যক্ষ জয়নাল আবেদীনের বিরুদ্ধে। ঢাকা নগর গণবাহিনীর হাইকমান্ড তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে। ছিয়াত্তরের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পাশ দিয়ে রিকশায় চড়ে যাওয়ার সময় তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়।[৬৭]

পার্টির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির (সিওসি) এক বর্ধিত সভা ছিয়াত্তরের ২৬-৩১ অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিগত দিনগুলোর কার্যক্রম এবং এর সাফল্য-ব্যর্থতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। আলোচনায় যে বিষয়গুলো বেরিয়ে আসে, তা 'বিশেষ বিজ্ঞপ্তি' শিরোনামে সদস্যদের মধ্যে প্রচার করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় :

> আমাদের পার্টির সংগঠন ও গণসংগঠনের মধ্যে মারাত্মক ধরনের স্থবিরতা ও অস্থিরতা বিরাজ করছে। স্থবিরতার অর্থই হলো গতিহীনতা। গতিহীনতা সৃষ্টির মূল কারণ হলো সংগঠনের ভেতরে দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের অভাব।...মনে রাখতে হবে, অন্ধবিশ্বাস প্রবণতা যেমন মার্ক্সবাদ নয়, ঠিক তেমনি শুধু প্রয়োগও মার্ক্সবাদ নয়।...
>
> গণসংগঠনসমূহে স্থবিরতা নেমে আসার মূল কারণ হিসেবে আমরা লক্ষ করেছি গণসংগঠনসমূহের নিজ নিজ স্বাধীন অস্তিত্বের ক্রমবিলুপ্তি এবং ক্রমবর্ধমান হারে পার্টি সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীলতা, পরস্পরের মধ্যকার দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের অভাব, কর্মীদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগতা, গণসংগঠনসমূহের বাস্তব, স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত ভূমিকার অনুপস্থিতি ইত্যাদি।...
>
> নেতৃত্বে বর্তমান কাঠামো (সর্বস্তরের) যথোপযুক্ত ও পর্যাপ্ত নয়। তাই এই বৈঠক আগামী কাউন্সিল সভার অনুমোদন সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি, স্ট্যান্ডিং কমিটি ও জরুরি স্ট্যান্ডিং কমিটিকে বাতিল ঘোষণা করে।

সকল পর্যায়ের ফোরামসমূহও বাতিল ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন ফ্রন্টসমূহের সমন্বয় সাধনের জন্য বিভিন্ন ফ্রন্ট থেকে প্রতিনিধি নিয়ে সর্বস্তরে কেবলমাত্র একটি করে 'সমন্বয় কমিটি' গঠন করার সুপারিশ করা হয়। এই বৈঠক পার্টিকে বর্তমান স্থবিরতা ও অস্থিরতার হাত থেকে রক্ষা করে গতিশীল ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য বর্তমান উপলব্ধির ভিত্তিতে সংগঠনের একজন সদস্যের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করে। তিনি এ ব্যাপারে যেকোনো সদস্যের সহযোগিতা নিতে পারবেন এবং যেকোনো দায়িত্ব যেকোনো সদস্যের ওপর অর্পণ করতে পারবেন।...

৩১ তারিখে যে বর্ধিত সভায় 'একজন সদস্যের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত' সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়, তিনি ওই দিন সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। পরে তাঁর সভাপতিত্বে ২৩ সদস্যবিশিষ্ট এক সভায় তিনি 'একজন সদস্যের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত' বিষয়কে তাত্ত্বিক দিক থেকে অপর্যাপ্ত ও ভিত্তিহীন মনে করেন। তাই প্রশ্নটিকে সংগঠনের সর্বস্তরে মতামতের জন্য খসড়া প্রস্তাব হিসেবে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।...

বর্তমান পরিস্থিতিতে 'পরিচালনা পরিষদ' গঠন না করে সব ফ্রন্ট থেকে প্রতিনিধি নিয়ে একটি 'কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি' গঠন করা হবে।...

উপরিউক্ত ব্যবস্থাসমূহ তিন মাসের জন্য কার্যকর থাকবে। এই সময়ের মধ্যে বা অনুরূপ কোনো সময়ের মধ্যে সত্যিকার প্রতিনিধিত্বমূলক কাউন্সিল আহ্বান করা হবে এবং সামগ্রিক অবস্থার পূর্ণ পর্যালোচনা করে সমস্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।...

এই সিদ্ধান্তগুলোর ওপর লিখিত মতামত আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে কেন্দ্রের কাছে পাঠাতে হবে।[৬৮]

এই সভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে 'বিপ্লবী পার্টি' গঠনের প্রক্রিয়ায় ছেদ টানা হলো। সঙ্গে সঙ্গে সমাপ্ত হলো একটা ঘটনাবহুল, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, রক্তক্ষয়ী পর্বের। একটা বিপ্লবী পার্টির নিজেকে নিজেই বিলুপ্ত করার উদাহরণ খুব বেশি নেই। জাসদের নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছিলেন, এই প্রক্রিয়া আর বয়ে বেড়ানোর কোনো মানে হয় না। অনেক শ্রম, ঘাম ও রক্তের বিনিময়ে এই উপলব্ধি অর্জন করতে হলো।

ছিয়াত্তরের ২৬ নভেম্বর সিরাজুল আলম খান ঢাকার মোহাম্মদপুরে হুমায়ুন রোডের একটা বাসা থেকে গ্রেপ্তার হন। আনসার আহমদ, খোদা বখশ চৌধুরী এবং ডা. সেলিম এই বাসার একতলায় ভাড়া থাকতেন। আনসার ও খোদা বখশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় জাসদ-ছাত্রলীগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সিরাজুল আলম খান মাঝেমধ্যে এই বাসাটি শেল্টার হিসেবে ব্যবহার করতেন।[৬৯] সারা দিন ও পরদিন কোনো গণমাধ্যমে এই গ্রেপ্তারের সংবাদ

॥ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ॥ ২০-১১-৭৬

গত ২৬, ২৭, ২৮ ও ৩১ শে অক্টোবর ১৯৭৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির বর্ধিত সভায় আমাদের বিগত দিনের কার্যাবলীর সফলতা-বিফলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুলভ্রান্তির উপর বিশদ আলোচনা ও পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সুদীর্ঘ পর্যালোচনায় যে বিষয়গুলো বেরিয়ে আসে তা নিম্নরূপ ঃ—

(১) আমাদের পার্টি সংগঠন [C.O.C, S.C, E.S.C. ও সর্বস্তরের ফোরাম] ও গণসংগঠনের মধ্যে আদর্শিক দিকের স্থবিরতা ও অস্থিরতা বিরাজ করছে। স্থবিরতার অর্থই হল গতিহীনতা। গতিহীনতা স্থবিরতার মূল কারণ হলো সংগঠনের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের অভাব। অস্থিরতার মূল কারণ হলো সঠিক বিপ্লবী চেতনা ও উপলব্ধির অভাব। বিপ্লবী চেতনা ও উপলব্ধির কোন বিমূর্ত রূপ নেই। তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমন্বয় অর্থাৎ তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রয়োগ এবং প্রয়োগের ভিত্তিতে তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করা— অন্য কথায় "বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ"ই হলো বিপ্লবী চেতনার বহিঃপ্রকাশ। বিপ্লবকে তার নিজস্ব গতিতে [illegible] হতে না দিয়ে অ্যাকশনিজমের দ্বারা আপ্লুত ও পরিচালিত হয়ে [illegible] সাধীনের মনোভাবই-হলো অস্থিরতা। মনে রাখতে হবে [illegible]

১৯৭৬ সালের অক্টোবরে জাসদের পার্টি-প্রক্রিয়া বিলুপ্তির ঘোষণাসংবলিত 'বিশেষ বিজ্ঞপ্তি'

প্রচার করা হয়নি। দলের মধ্যে অনেকেই আশঙ্কা করছিলেন, তাঁকে মেরে ফেলা হতে পারে। ২৭ নভেম্বর আফতাব উদ্দিন আহমদ ও মহিউদ্দিন আহমদ সারা দিন বিভিন্ন পত্রিকা ও সংবাদ সংস্থার অফিসে ধরনা দেন, যাতে সিরাজুল আলম খানের গ্রেপ্তারের খবরটি ছাপানো হয়। ২৮ নভেম্বর একমাত্র *ইত্তেফাক*-এর ভেতরের পাতায় এক প্যারাগ্রাফের ছোট্ট একটা সংবাদ ছাপা হয়েছিল। শিরোনাম ছিল, 'সিরাজুল আলম খান গ্রেপ্তার'।

করপোরাল আলতাফ হোসেনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। তিনি পলাতক জীবন বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭৮ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার এক গ্রামে টাঙ্গাইল জেলা গণবাহিনীর একসময়ের কমান্ডার খন্দকার আবদুল বাতেনসহ একদল কৃষকের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন আলতাফ। এ সময় পুলিশ বাড়িটি ঘিরে ফেলে এবং গুলি করতে থাকে। সবাই নিরাপদে সরে যেতে পারলেও আলতাফ পারেননি। গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি মারা যান। তাঁর লাশ পুলিশ গুম করে ফেলেছিল।[৭০]

আলতাফ ছিলেন বরগুনা জেলার হরিদ্রাবাড়িয়া গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান। একাত্তরে তিনি নবম সেক্টরে মেজর জলিলের সহযোদ্ধা ছিলেন। মা, স্ত্রী ও দুটি শিশুসন্তান রেখে তিনি 'বিপ্লবের' আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। এই সর্বোচ্চ ত্যাগের জন্য তিনি কোনো তারকাখ্যাতি পাননি। নিচু পর্যায়ের সৈনিকদের নিয়ে এ দেশে কেউ মহাকাব্য লেখেন না।

করপোরাল আলতাফকে নিয়ে মেজর জলিল একটি কবিতা লিখেছিলেন। কবিতার প্রথম কয়েকটি লাইন ছিল :

আর দেবতা নয়, নয় শান্তির দূত
নহে কাব্য, নহে কবিতা। এসো বিদ্যুৎ,
এসো বিপ্লব, এসো ঝঞ্চা, এসো আগুন,
এসো সংগ্রামী সাথী রক্তঝরা ফাগুন।[৭১]

তথ্যনির্দেশ

১. হামিদ, লে. কর্নেল এম এ (২০১৩), *তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা,* হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৮৯।
২. হামিদ, পৃ. ১৯১।
৩. জামিল, কর্নেল শাফায়াত (২০০০), *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগস্ট ও ষড়যন্ত্রের নভেম্বর,* সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ১৩০।
৪. আকা ফজলুল হকের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৫. ওই।
৬. ওই।
৭. জামিল, পৃ. ১৩২-১৩৩।
৮. 'The US National Archives, Documents 1975 Dacca, Telegram from the Embassy in Bangladesh to the Department of States' (on different dates), quoted by Khasru, p. 368-373.
৯. *দৈনিক বাংলা,* ৮ নভেম্বর ১৯৭৫।
১০. মাহবুবুর রহমানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
১১. রহমান, নায়েব সুবেদার মাহবুবর (তারিখ নেই), *সৈনিকের হাতে কলম,* সংলাপ, জার্মানি, পৃ. ১১৮-১১৯।
১২. সার্জেন্ট সৈয়দ রফিকুল ইসলাম ও করপোরাল আবদুল মজিদের সঙ্গে আলাপচারিতা।
১৩. রহমান, পৃ. ১১০-১১৬।
১৪. খায়ের এজাজ মাসুদের সঙ্গে আলাপচারিতা।
১৫. ওই।

১৬. মনিরুল ইসলাম, সার্জেন্ট রফিকুল ইসলাম এবং আ ফ ম মাহবুবুল হকের সঙ্গে আলাপচারিতা।
১৭. খায়ের এজাজ মাসুদের সঙ্গে আলাপচারিতা।
১৮. Lifschultz, p. 90.
১৯. মো. শফিকুল ইসলামের সঙ্গে আলাপচারিতা।
২০. চৌধুরী, মে. জেনারেল মইনুল হোসেন (২০০৩), *এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ৯৩।
২১. *দৈনিক বাংলা*, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫।
২২. আবুল হাসিব খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
২৩. *দৈনিক বাংলা*, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫।
২৪. *দৈনিক বাংলা*, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫।
২৫. হামিদ, পৃ. ১৩০।
২৬. হোসেন, পৃ. ৪৩।
২৭. জামিল, পৃ. ১৪৬।
২৮. হামিদ, পৃ. ১২৫-১৪৬।
২৯. হামিদ, পৃ. ১৩৯-১৪০।
৩০. আকা ফজলুল হকের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৩১. হামিদ, পৃ. ১৯০।
৩২. রহমান, নায়েব সুবেদার মাহবুবর, পৃ. ১২৯-১৩০।
৩৩. *The Bangladesh Gazette, Extraordinary*, 8 November 1975, p. 2229-30.
৩৪. আবুল হাসিব খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৩৫. করপোরাল আবদুল মজিদের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৩৬. আমানউল্লাহর সঙ্গে আলাপচারিতা।
৩৭. মোস্তফা সরোয়ার বাদলের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৩৮. Lifschultz, p. 12.
৩৯. সৈয়দ বাহারুল হাসান সবুজের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৪০. কামালউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৪১. সৈয়দ বাহারুল হাসান সবুজের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৪২. কামাল উদ্দিন আহমেদের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৪৩. আহমদ, মহিউদ্দিন (২০০৬), পৃ. ২০৪।
৪৪. শরীফ নুরুল আম্বিয়ার সঙ্গে আলাপচারিতা।
৪৫. রফিকুল ইসলামের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৪৬. আয়েশা পারুলের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৪৭. শরীফ নুরুল আম্বিয়ার সঙ্গে আলাপচারিতা।
৪৮. আবুল হাসিব খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৪৯. বাদল খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।

৫০. আবুল হাসিব খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৫১. 'কেন গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকার', ১৯৭৬, পৃ. ৩।
৫২. রায়হান ফেরদৌস মধুর সঙ্গে আলাপচারিতা।
৫৩. *লড়াই*, ফ্যাসিবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মুখপত্র, ৩ এপ্রিল ১৯৭৬, ঢাকা।
৫৪. *লড়াই*, ৭ জুলাই ১৯৭৬।
৫৫. *সাম্যবাদ*, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১ জুলাই ১৯৭৬।
৫৬. সার্জেন্ট সৈয়দ রফিকুল ইসলামের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৫৭. সার্জেন্ট সৈয়দ রফিকুল ইসলামের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৫৮. করপোরাল আবদুল মজিদের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৫৯. করপোরাল আবদুল মজিদের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৬০. বাদল খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৬১. বাদল খান ও মোশতাক আহমেদের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৬২. বদিউল আলমের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৬৩. সার্জেন্ট সৈয়দ রফিকুল ইসলামের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৬৪. জাসদ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ, বিপ্লবী গণবাহিনী (১৯৭৫), 'সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী ষড়যন্ত্রকে রুখে দাঁড়ান : জঙ্গি জনতার ঐক্য গড়ে তুলুন', ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১৭।
৬৫. করিম, নেহাল ও অন্যান্য, পৃ. ১৫৮।
৬৬. হোসেন, পৃ. ৪৩-৪৫।
৬৭. বাদল খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৬৮. কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির বিশেষ বিজ্ঞপ্তি।
৬৯. খোদা বকশ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপচারিতা।
৭০. করপোরাল আবদুল মজিদের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৭১. করপোরাল আলতাফ স্মৃতি উদ্‌যাপন কমিটি (তারিখ নেই), *মৃত্যুকে দেখ: কুর্নিশ করে হিমালয়*।

পুনরুত্থান

১৯৭৬ সালের ১ জুলাই *সাম্যবাদ*-এর ষষ্ঠ ও শেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় জাসদ রণকৌশল পরিবর্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। পরিপ্রেক্ষিত বর্ণনা করে বলা হয় :

১) পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকল্প কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার ছক বা চিত্র জনগণের সামনে নেই। বরং মুজিববাদী সমাজতন্ত্রের পাল্লায় পড়ে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কিছু বিকৃত ধারণাই তৈরি হয়েছে;

২) দীর্ঘদিনের প্রবঞ্চনার অভিজ্ঞতা জনগণকে সাধারণভাবে রাজনীতি সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ ও অনীহাসম্পন্ন করে তুলেছে;

৩) কোনো রাজনৈতিক দল বা নেতৃত্বের প্রতি ব্যাপক জনগণের দৃঢ় আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি;

৪) বর্তমান সরকারকে জনগণ, বিশেষত জনগণের পেটি বুর্জোয়া অংশ শেখ মুজিব সরকারের তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করছে;

৫) জনগণের ধারণা, এ মুহূর্তে কোনো সংঘাত বাধলে জিনিসপত্রের দাম আবার বেড়ে যাবে এবং ব্যক্তিগত পুঁজি বিকাশের আসন্ন সুযোগটি নস্যাৎ হয়ে যাবে;

৬) জনগণের মধ্যে ভারত সম্পর্কে বিদ্বেষ ও ভীতি এমনই যে জনগণ মনে করছে, অভ্যন্তরীণ সংঘাতের সুযোগে ভারত বাংলাদেশকে সরাসরি আক্রমণ করে বসবে;

৭) ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরবর্তী সময়ে জনজীবনে সীমাহীন দুর্যোগ নেমে আসায় অপর একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম বা আন্দোলনের সম্ভাবনাকে তারা ভীতির চোখে দেখছে।

১৯৭৬ সালের ১৫ আগস্ট থেকে রাজনৈতিক কার্যকলাপ উন্মুক্ত করে দেওয়ার যে অঙ্গীকার সরকার করেছিল, সে সম্পর্কে জাসদের সতর্ক মন্তব্য

ছিল, 'এমতাবস্থায় রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে গায়ে পড়ে কোনোরূপ শক্তি পরীক্ষায় যাওয়া উচিত হবে না।' 'এ মুহূর্তের করণীয়' সম্পর্কে বলা হয়:

১) সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদবিরোধী জাতীয় ঐক্যের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া;
২) সম্ভাব্য ভারতীয় হামলা ও বাকশালীদের চক্রান্ত সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার চালিয়ে এদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করা;
৩) বিশেষ সামরিক আইন আদালতে বিচারের নামে প্রহসনের মাধ্যমে নেতাদের শাস্তি দেওয়ার চক্রান্তের বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসা।

আন্দোলনের স্লোগান হবে: স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা; ভারতীয় হামলা ও ভারতীয় চরদের চক্রান্ত প্রতিহত করা; ফারাক্কা সমস্যার সমাধান করা; নেতাদের বিচারের নামে প্রহসন বন্ধ করা; রাজবন্দীদের অবিলম্বে বিনা শর্তে মুক্তিদান ইত্যাদি।

বক্তব্যে অতীতের রাজনৈতিক কৌশল যে সঠিক ছিল না, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জাসদ উপলব্ধি করে, 'সর্বপ্রকার সন্ত্রাসবাদী ঝোঁক ও বেধড়ক খতম অভিযানের প্রবণতা চূড়ান্ত বিচারে অমার্ক্সবাদী ও বিপ্লবের পক্ষে ক্ষতিকর বিধায় এরূপ ঝোঁক ও প্রবণতা থেকে আমাদের মুক্ত থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, চাপিয়ে দেওয়া হামলাকে মোকাবিলা করা এক কথা, কিন্তু খতম অভিযান, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতা ইত্যাদির মাধ্যমে মোকাবিলাকে ডেকে নিয়ে আসা ভিন্ন কথা। আবেগ আমাদের নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে কিংবা কোনো ঘটনাবিশেষের আকস্মিকতায় অভিভূত হয়ে, দিশাহারা হয়ে বা ক্ষিপ্ত হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া বা কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে বসা কোনোক্রমেই উচিত হবে না।'[১]

সামরিক আদালতে যখন জলিল, তাহের ও অন্যদের বিচার চলছিল, তখন সামরিক সরকারকে আরও গুছিয়ে বসার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার পক্ষে লোকের অভাব ছিল না। 'দেশে স্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি না হওয়া পর্যন্ত' সাম্যবাদী দলের নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা নির্বাচন দুই থেকে তিন বছর পিছিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। তত দিনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা আবদুল হকের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে সাম্যবাদী দল নামে নতুন রাজনৈতিক দল তৈরি করেছেন। ১৯৭৬ সালের ১০ জুলাই শ্রমিক ফেডারেশনের পক্ষে ডাকা এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'আগামী মাসে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে সময় ঘোষণা করা হয়েছে, একটা সুষ্ঠু সাধারণ নির্বাচনের জন্য তা খুবই কম। জনগণ যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দলের চরিত্র ও কর্মসূচি উপলব্ধি করতে পারে, সে জন্য সময় দেওয়া দরকার।'

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'এ মুহূর্ত থেকেই দেশে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরুর অনুমতি দেওয়া উচিত।' তিনি সব দেশপ্রেমিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতীয় কনভেনশন আহ্বানের প্রস্তাব দেন।[২]

ছিয়াত্তরের জুলাই মাসের শেষ দিকে আওয়ামী লীগের ১৪ জন প্রতিনিধি মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি সায়েমের সঙ্গে দেখা করেন। ওই সময় সশস্ত্র বাহিনীর তিন প্রধানও উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার একপর্যায়ে জিয়াউর রহমান উত্তেজিত হয়ে বলেন, 'হু ইজ আ বেটার আওয়ামী লীগার দ্যান মি? আই হ্যাভ ট্রান্সমিটেড দ্য ডিরেক্টিভস অব বঙ্গবন্ধু ফ্রম চিটাগাং রেডিও স্টেশন' (আমার চেয়ে ভালো আওয়ামী লীগার কে? আমি চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশগুলো প্রচার করেছিলাম)।[৩]

জিয়া আওয়ামী লীগের সহানুভূতি ও সমর্থন পেতে চেয়েছিলেন। জাসদের সমর্থনও তিনি চেয়েছিলেন। জলিল-রব-তাহেরদের বিচার চলাকালে জাসদের নেতা এম এ আউয়ালের মাধ্যমে তিনি জাসদের অন্য নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন। জাসদের নেতারা এটাকে একটা ফাঁদ মনে করে তাতে সাড়া দেননি। আউয়ালকে তাঁরা ষড়যন্ত্রকারী মনে করতেন। উল্টো তাঁরা আউয়ালকে দলীয় শৃঙ্খলা ভাঙার অভিযোগে কারণ দর্শানোর জন্য চিঠি দেন। চিঠিটি আউয়ালের কাছে নিয়ে যান আবুল হাসিব খান। আউয়াল হাসিবকে বলেন, 'এসব রাখো, আগে তাহেরকে বাঁচাও।'[৪] পরে জিয়া তাঁর রাজনৈতিক ভিত তৈরি করার জন্য ভাসানীপন্থী ন্যাপ এবং মুসলিম লীগের দিকে হাত বাড়ান।

ছিয়াত্তরের ২৮ জুলাই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এ এস এম সায়েম 'রাজনৈতিক দল বিধি বা প্রবিধান' জারি করেন। এই বিধানে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের বিষয়ে কয়েকটি নিয়ম উল্লেখ করা হয়। বিধিতে বলা হয়, দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সর্বস্তরে এর সাংগঠনিক কাঠামো, এর কর্মকর্তাদের নির্বাচন-পদ্ধতি, তহবিলের উৎস, কার্যকলাপের ব্যয় নির্বাহের পদ্ধতি এবং হিসাবপত্রের বার্ষিক নিরীক্ষা ও নিরীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশের ব্যবস্থা উল্লেখ করে দলের গঠনতন্ত্র জমা দিয়ে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে হবে।[৫] ৪ আগস্ট এক সরকারি প্রেস নোটে রাজনৈতিক দলবিধি-সংক্রান্ত প্রবিধানের ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়, উল্লিখিত দলিলপত্র পাওয়ার পর সরকার জানিয়ে দেবে কোনো রাজনৈতিক দল প্রবিধানের শর্তগুলো পূরণ করেছে কি না। সরকারের কাছ থেকে জবাব না পাওয়া পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দল কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না।[৬]

নিবন্ধনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো নতুন করে আবেদন করে। খন্দকার মোশতাক আহমদ বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক লীগ নামে নতুন একটা রাজনৈতিক দল গঠন করেন। জাসদও নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে। প্রায় সব দলকেই নিবন্ধন দেওয়া হয়। ব্যতিক্রম ছিল জাসদ। জাসদের নেতা-কর্মীরা তখন জেনারেল ওসমানীর সঙ্গে সমঝোতায় আসেন। ওসমানী 'জাতীয় জনতা পার্টি' নামে একটা নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে নিবন্ধন নিয়েছিলেন। জাসদের অনেকে এই দলের সঙ্গে ভিড়ে যান। জাসদের কয়েকজনকে কেন্দ্রীয় কমিটিতেও নেওয়া হয়। স্বাধীনতার পর নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া ইসলাম-পসন্দ দলগুলোর অনেক নেতা একত্র হয়ে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল) নামে একটি নতুন দল তৈরি করেন। এই দলটি সহজেই নিবন্ধন পেয়ে যায়। এই দলের আহ্বায়ক ছিলেন মাওলানা সিদ্দিক আহমেদ। এই দলের সদস্যরা মূলত নিষিদ্ধ জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলাম পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। সবুর খানের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ আবার আত্মপ্রকাশ করে এবং নিবন্ধন পায়।

ছিয়াত্তরের ১২ সেপ্টেম্বর মওলানা ভাসানী লন্ডন থেকে চিকিৎসা শেষে ঢাকায় ফিরে বিমানবন্দরে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের বলেন, 'দেশের জনগণ এ মুহূর্তে নির্বাচন চায় না।' তিনি আরও বলেন, 'জনগণ নির্বাচন চায় কি না, গণভোটের মাধ্যমে তা যাচাই করা দরকার। নির্বাচনের আগে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে।'[৭]

৩০ অক্টোবর সাম্যবাদী দলের পক্ষে মোহাম্মদ তোয়াহা এক সংবাদ সম্মেলনে সংবিধান বাতিলের দাবি জানান। তিনি আওয়ামী লীগ, মণি সিংহের কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ (মোজাফ্ফর) ও জাসদ—এই চারটি দলকে নিষিদ্ধ করে 'দেশপ্রেমিক' দলগুলোকে কাজের সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান।[৮] ৩১ অক্টোবর এক সংবাদ সম্মেলনে ইউপিপির নেতা কাজী জাফর আহমদ তাঁর লিখিত বিবৃতিতে বলেন, 'আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান আমরা বাস্তবসম্মত মনে করি না।'[৯]

২১ নভেম্বর বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারিত এক ভাষণে রাষ্ট্রপতি সায়েম অনির্দিষ্টকালের জন্য সংসদ নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করেন। ভাষণে তিনি বলেন, 'নেতাদের ভাষণ, সংবাদপত্রে প্রকাশিত অন্যান্য বিবৃতি, ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা, বিভিন্ন এলাকার জনগণের অনুভূতি ও অভিব্যক্তি এবং প্রশাসনিক মূল্যায়ন—সবকিছু থেকে নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, জনগণ

আশু নির্বাচনের পক্ষপাতী নন। তাঁরা আশঙ্কা করেন যে, আশু নির্বাচন শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করবে, অর্থনীতি দুর্বল করে দেবে, শত্রুর হাত মজবুত করবে এবং সর্বোপরি দেশের সমূহ অকল্যাণ ডেকে আনবে।'[১০]

নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়াটা সামরিক জান্তার জন্য খুবই জরুরি ছিল। তাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ছিল একটা জুতসই প্ল্যাটফর্ম, একটা রাজনৈতিক দল। এটা তৈরি করা সময়সাপেক্ষ। সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান একটা রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য সচেষ্ট হলেন। তার আগে দরকার রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ক্ষমতা দখলে নেওয়া, কেননা ক্ষমতার কেন্দ্রে থেকে রাজনৈতিক দল বানানো অনেক সহজ। ২৯ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এ এস এম সায়েম একটি সামরিক ফরমান জারি করেন। ফরমানে বলা হয় : '...আমি এখন উপলব্ধি করছি যে, জাতীয় স্বার্থেই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের ক্ষমতা সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান কর্তৃক প্রয়োগ করা উচিত।'[১১] জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধানের দায়িত্ব নিলেন।

এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেছে। জাসদের এম এ আউয়ালের সঙ্গে জিয়াউর রহমানের যোগাযোগ ছিল। বাহাত্তর থেকে তিনি কারাগারে ছিলেন। পঁচাত্তরের ৭ নভেম্বর তিনি সিপাহিদের সহযোগিতায় মুক্তি পান। তিনি জাসদের সঙ্গে জিয়ার একটা সমঝোতার চেষ্টা করে আসছিলেন। তবে দলে তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখা হতো। তিনি জাসদের সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটি তৈরি করলেন। তিনি নিজেই এর আহ্বায়ক। এই কমিটির নেতৃত্বাধীন জাসদ সরকারি নিবন্ধন পায়। পরে অবশ্য সরকার তিনটি দলের নিবন্ধন বাতিল করে দেয়। দলগুলো হলো : বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (মণি সিংহ), বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক লীগ (খন্দকার মোশতাক) এবং জাসদ (এম এ আউয়াল)। আরও পরে এই নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়।

রাষ্ট্রপতি সায়েম ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল তারিখে 'স্বাস্থ্যগত কারণে' পদত্যাগ করেন এবং রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জিয়াউর রহমানের কাছে হস্তান্তর করেন। পরদিন ২২ এপ্রিল জিয়া বেতার ও টেলিভিশনে রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রথম ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি ১৯৭৭ সালের আগস্ট মাসে পৌরসভাগুলোতে, ডিসেম্বর মাসে জেলা পরিষদসমূহে এবং ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন।[১২] একই দিন তিনি কয়েকটি সামরিক বিধি জারি করে সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদ সংশোধন করেন। সংশোধনীগুলোর অন্যতম ছিল :

৬(২) : বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।

সংবিধানের শুরুতে প্রস্তাবনার উপরে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সন্নিবেশিত হইবে।

প্রস্তাবনার প্রথম অনুচ্ছেদে 'জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের' পরিবর্তে 'জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের' প্রতিস্থাপিত হইবে।[১৩]

১৯৭৭ সালের ৩০ এপ্রিল বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে দেওয়া এক ভাষণে জিয়াউর রহমান ১৯ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। জিয়া তাঁর 'নীতি ও কর্মপন্থা এবং তাঁর ওপর জনগণের আস্থা যাচাই করার জন্য' ৩০ মে গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন।[১৪] গণভোট আয়োজনের ঘোষণাকে অভিনন্দন জানিয়ে জাতীয় লীগের সভাপতি আতাউর রহমান খান, জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়নের সভাপতি হাজী মোহাম্মদ দানেশ, ইউনাইটেড পিপলস পার্টির সভাপতি ক্যাপ্টেন (অব.) আবদুল হালিম চৌধুরী এবং কৃষক শ্রমিক পার্টির সভাপতি এ এস এম সোলায়মান ২৪ মে একটি যৌথ বিবৃতি দেন।[১৫] সাতাত্তরের ৩০ মে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সরকারি তথ্য অনুযায়ী ৮৮.৫ শতাংশ ভোটার ভোট দেন এবং প্রদত্ত ভোটের ৯৮.৯ শতাংশ জিয়াউর রহমানের প্রতি আস্থাবাচক অর্থাৎ 'হ্যাঁ' ভোট পড়ে।[১৬] গণভোটে ভোটারদের এই বিপুল উপস্থিতির তথ্যটি কেউ বিশ্বাস করেননি। জিয়া এটা করেছিলেন লোক দেখানোর জন্য। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য 'গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার' একটা ছাপ তাঁর গায়ে লাগানোর দরকার ছিল।[১৭]

পঁচাত্তরের নভেম্বরে 'সিপাহি বিপ্লবের' আপাত-সমাপ্তি ঘটলেও ভেতরে ভেতরে এর রেশ রয়ে গিয়েছিল। যার একটা বিস্ফোরণ ঘটে সাতাত্তরের ২ অক্টোবর।

জাপানের জঙ্গি সংগঠন 'রেড আর্মি'র একটি দল জাপান এয়ারলাইনসের যাত্রীবাহী একটি বিমান ছিনতাই করে এবং জ্বালানি সংগ্রহের জন্য ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে অবতরণ করে। বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ জি মাহমুদ বিমানবন্দরের কন্ট্রোল টাওয়ারে বসে ছিনতাইকারীদের সঙ্গে দেনদরবার করতে থাকেন। ১ অক্টোবর রাতে ঢাকার আর্মি সিগন্যাল ব্যাটালিয়নের সৈন্যরা শেখ আবদুল লতিফের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। একই সময় সার্জেন্ট আফসার ও সার্জেন্ট এ বি সিদ্দিকের নেতৃত্বে কুর্মিটোলা এয়ার বেইজের সৈনিকেরা বিদ্রোহ করেন। এর আগে ৩০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় আজিমপুরের নিউ পল্টন লাইনে ইরাকি গোরস্থানের মাঠে বিদ্রোহের

পরিকল্পনা করা হয়। তাঁরা ঢাকা বেতার কেন্দ্র দখল করে বিপ্লবী সরকার গঠনের ঘোষণা দেন। বিপ্লবের ডামাডোলে বিমানবাহিনীর ১১ জন কর্মকর্তা 'বিপ্লবীদের' হাতে নিহত হন। নিহতদের মধ্যে ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন আনসার চৌধুরী, গ্রুপ ক্যাপ্টেন রাস মাসুদ, উইং কমান্ডার আনোয়ার শেখ, স্কোয়াড্রন লিডার মতিন, ফ্লাইট লে. শওকত জাহান চৌধুরী ও সালাউদ্দিন, ফ্লাইং অফিসার মাহবুব আলম ও আখতারুজ্জামান, পাইলট অফিসার আনসার, নজরুল ও শরীফুল ইসলাম।[১৮]

জেনারেল জিয়াউর রহমানের অনুগত সৈন্যরা অল্প সময়ের মধ্যেই পাল্টা আক্রমণ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বিমানবন্দর এলাকায় অস্ত্র হাতে যাকেই দেখা গেছে, তাকেই জিয়ার অনুগত সৈন্যরা হত্যা করে। এ ছাড়া যাদেরই টারমাকে ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় দেখা গেছে, তাদেরই গ্রেপ্তার করে বিভিন্ন কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এদের মধ্যে ১ হাজার ১৪৩ জনকে বিভিন্ন কারাগারে ফাঁসি দেওয়া হয়।[১৯] ১৯৭৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লা কারাগারে সার্জেন্ট আফসার ও সার্জেন্ট এ বি সিদ্দিককে ফাঁসি দেওয়ার মধ্য দিয়ে এই প্রতিশোধ-প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে।[২০]

২ অক্টোবরের অভ্যুত্থানের সঙ্গে জাসদের কী সম্পর্ক ছিল, এ নিয়ে জাসদ কখনো মুখ খোলেনি। ব্যর্থ অভ্যুত্থানের দায় কেউ নিতে চায় না। জাসদের আনিসুর রহমান খান, মুস্তাফিজ ও আশরাফ অভ্যুত্থানের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁরা তিনজনই ছিলেন প্রকৌশলী। আনিসুর রহমান খান একসময় ঢাকা নগর গণবাহিনীর কমান্ডার ছিলেন।

যাঁদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের ব্যাপারে জিয়াউর রহমানের সরকার কখনোই তার দায় স্বীকার করেনি। তাঁদের প্রত্যেকের বাড়িতে অবিলম্বে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য চিঠি পাঠানো হয়েছিল, যাতে সবাই মনে করে তাঁরা পলাতক। ফাঁসির পর তাঁদের লাশ গুম করে ফেলা হয়েছিল। তাঁদের কোথায় কবর দেওয়া হয়েছিল, কিংবা আদৌ কবর দেওয়া হয়েছিল কি না, তা আজও জানা যায়নি।[২১]

১৯৭৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর জিয়াউর রহমান বেতার ও টেলিভিশনে দেওয়া এক ভাষণে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে' বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিদের নিয়ে একটা ফ্রন্ট গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রী দল (জাগদল) গঠন করেন এবং উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে এর আহ্বায়ক নিযুক্ত করেন। ১৭ এপ্রিল এক সামরিক ফরমান জারি করে জিয়া রাজনৈতিক দলবিধি বাতিল করেন।

ফরমানে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বাতিল এবং রাজবন্দীদের মুক্তির ঘোষণা দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিজেই নিজেকে মেজর জেনারেল থেকে লে. জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দেন। এ অঞ্চলে এ ধরনের ঘটনা এর আগে একবারই ঘটেছিল। ১৯৫৯ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান নিজেকে ফিল্ড মার্শাল হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন।

১৯৭৮ সালের পয়লা মে থেকে দেশে রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়। ওই দিনই জাগদল, ভাসানী ন্যাপ (মশিয়ুর রহমান গ্রুপ), ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (কাজী জাফর গ্রুপ), জাগমুই এবং লেবার পার্টিকে নিয়ে একটি জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠন করা হয়। জিয়া এই ফ্রন্টের চেয়ারম্যান মনোনীত হন। ৩ জুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের প্রার্থী জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য কয়েকটি দলের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের পক্ষে জেনারেল ওসমানী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। জাসদ এই নির্বাচনে অংশ নেয়নি। ১২ মে এক সংবাদ সম্মেলনে জাসদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার কারণ সম্পর্কে বলেন :

> প্রেসিডেন্ট জিয়া প্রথমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। পরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হইল। কিন্তু কার্যত সময় দেওয়া হইল এক মাসেরও কম এবং গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত কালাকানুন বাতিল করা হয় নাই। রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয় নাই। চতুর্থ সংশোধনী বাতিল করা হয় নাই। প্রেসিডেন্ট চিফ অব স্টাফের পদ হইতে সরিয়া আসিয়াছেন কি না, সে সম্পর্কেও কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নাই। তাই জাসদের পক্ষে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব হয় নাই।[২২]

১৯৭৮ সালের ২১ মে জাসদের এক জনসভায় নেতারা বলেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জনগণের গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না; একমাত্র একটি সার্বভৌম পার্লামেন্টই এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সার্বভৌম পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য সব গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার।[২৩]

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় জুনের ৩ তারিখে। মোট ১০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। শতকরা ৫৩.৪৪ ভাগ ভোটার ভোট দিয়েছিলেন। জিয়া প্রদত্ত ভোটের ৭৬.৬৩ শতাংশ পান। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জেনারেল এম এ জি ওসমানী পান ২১.৭০ শতাংশ ভোট।[২৪] বাকি আট প্রার্থী মিলে পান মাত্র ১.৬৭ শতাংশ ভোট।

জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করেন। বিকেলে রমনা রেস্তোরাঁ প্রাঙ্গণে এক সংবাদ সম্মেলনে দলের প্রধান হিসেবে তিনি দলের নাম, গঠনতন্ত্র ও কর্মসূচি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন। 'জাগদল' তাঁরই উদ্যোগে তৈরি হওয়া সত্ত্বেও আরেকটি নতুন দল গঠনের কী প্রয়োজন আছে, এমন এক প্রশ্নের জবাবে জিয়া বলেন, '৩ জুনের নির্বাচনের পর সবাই আমরা একসঙ্গে বসে আলোচনা করে ভেবেছি, এটাই শ্রেয়। দ্রুতগতিতে জাতীয় ঐক্য আরও সুসংগঠিত করা ও জাতীয় কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করতে হলে নতুন ও ব্রড বেইজড-জাতীয় দল গঠন করাই উত্তম।'[২৫]

আটাত্তরের ২৬ সেপ্টেম্বর জিয়া জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। চট্টগ্রামে মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে এক সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি। আশা করি, ফ্রন্টের শরিক দলগুলো এটা মেনে নেবে।'[২৬] কোনো আলোচনা না করে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট বিলুপ্ত করায় শরিক দলগুলো হতাশ হয়।

১৯৭৮ সালের ৩০ নভেম্বর নির্বাচন কমিশন ১৯৭৯ সালের ২৭ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। পরে নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করে ১৮ ফেব্রুয়ারি করা হয়। অবশ্য ৩ জুনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর থেকেই সংসদ নির্বাচনের সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছিল। জাসদ এই সুযোগে নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। দলের বেশির ভাগ নেতা তখন কারাবন্দী। হাজার হাজার কর্মী কারাগারে অথবা পলাতক জীবন যাপন করছেন। উল্লেখযোগ্য নেতাদের মধ্যে শাজাহান সিরাজ, নূরে আলম জিকু, মির্জা সুলতান রাজা ও রুহুল আমীন ভূঁইয়া কারাগার থেকে সদ্য ছাড়া পেয়েছেন। কাজী আরেফ আহমেদ ও মনিরুল ইসলাম কখনো গ্রেপ্তার হননি। তাঁরা জাসদের কমিটিতে না থাকলেও সিরাজুল আলম খানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে দলের নেপথ্যের কান্ডারি ছিলেন।

নূরে আলম জিকু ও শাজাহান সিরাজ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেন। তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন জায়গায় নেতা-কর্মীদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহার করানো। জিকুর উদ্যোগে গণবাহিনীর গোলাম মোস্তফা, আবদুল মতিন মিয়া, হান্নান, লাল্টু ওহাব, আমিরুল, মোমিন, জহির এবং আরও কয়েকজন কর্তৃপক্ষের কাছে 'অস্ত্র সমর্পণ' করেন। ফলে তাঁদের ওপর থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় এবং তাঁরা 'মুক্ত জীবনে' ফিরে আসেন। মতিন প্রথমে অস্ত্র

সমর্পণে রাজি হননি। তাঁর বক্তব্য ছিল: 'কেন আমরা অস্ত্র হাতে নিলাম এবং এখন কেন তা সারেন্ডার করতে হবে, তা আলোচনা হওয়া দরকার।' এ নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। নূরে আলম জিকুর নির্দেশে মতিন শেষ পর্যন্ত আটাত্তরের নভেম্বরে অস্ত্র সমর্পণ করেন। তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে একটি স্টেনগান, দুটি রিভলবার ও গোটা দশেক রাইফেল জমা দিয়েছিলেন। বিনিময়ে তাঁর বিরুদ্ধে স্থানীয় সংসদ সদস্যের বাড়ি পোড়ানোর মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।[২৭]

১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২৯টি রাজনৈতিক দলের ও স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ মোট দুই হাজার ১২৫ জন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৭টি দলের কোনো প্রার্থী একটি আসনেও জিততে পারেননি। বিএনপি ১৯০টি আসনে জয়লাভ করে। আওয়ামী লীগ পায় ৩৯টি আসন। তৃতীয় স্থানে ছিল সবুর খানের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ। তারা ১২টি আসনে জয়ী হয়। আটটি আসনে জয়লাভ করে জাসদ। জাসদের বিজয়ী প্রার্থীরা হলেন: মির্জা আবদুল লতিফ (পাবনা), শাজাহান সিরাজ (টাঙ্গাইল), মো. গোলাম মোস্তফা (যশোর), মো. আবদুল মোতালিব খান পাঠান (ময়মনসিংহ), আবদুল মতিন মিয়া (ফরিদপুর), মাহবুবুর রব সাদী (সিলেট), আবদুর রশীদ ইঞ্জিনিয়ার (কুমিল্লা) এবং উপেন্দ্রলাল চাকমা (পার্বত্য চট্টগ্রাম)। সাম্যবাদী দল ইতিপূর্বে জাসদসহ কয়েকটি দলকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছিল। তারা মাত্র একটি আসনে জয়ী হয়।[২৮] জাসদ শাজাহান সিরাজকে জাতীয় সংসদে সংসদীয় গ্রুপের নেতা নির্বাচিত করে।

১৯৭৯ সালের ৩১ মার্চ মির্জা গোলাম হাফিজ জাতীয় সংসদের স্পিকার নির্বাচিত হন। একই দিন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বিএনপি সংসদীয় দলের নেতা শাহ আজিজুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন। ১৯৭৯ সালের ৪ এপ্রিল জাতীয় সংসদে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের নামে একটি 'শোক প্রস্তাব' গৃহীত হয়। প্রস্তাবের ভূমিকায় বলা হয়, '১৯৭৫ সালের পনেরোই আগস্ট এক রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।' মূল প্রস্তাবে বলা হয়:

> বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ অত্যন্ত দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রস্তাব করছে যে, বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুতে বাংলাদেশ রাজনীতি-জগতে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছে। এই সংসদ তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের নিকট গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।[২৯]

৫ এপ্রিল ১৯৭৯ জাতীয় সংসদে পঞ্চম সংশোধনী বিল উত্থাপন এবং ৬ এপ্রিল থেকে তা কার্যকর হয়। এই সংশোধনী অনুযায়ী ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর জারি করা সব ফরমান, বিধি ও অন্যান্য সামরিক আইন জাতীয় সংসদ দ্বারা বৈধভাবে গৃহীত হয়েছে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। এপ্রিলের ৬ তারিখে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

জাসদের কারাবন্দী নেতাদের মুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকে। আ স ম আবদুর রবকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি চিকিৎসার জন্য পশ্চিম জার্মানি চলে যান। এর আগে জাসদের বেশ কয়েকজন মধ্যম সারির নেতা-কর্মী জার্মানি চলে গিয়েছিলেন।

মেজর জলিল কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঢাকার পিজি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা হচ্ছিল। তাঁর দেখাশোনা করতেন করপোরাল আবদুল মজিদ। মজিদ একই মামলায় সাজা পেয়েছিলেন। তিনি পুরো মেয়াদ জেল খেটে ইতিমধ্যে মুক্তি পেয়েছেন। একদিন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান পিজি হাসপাতালে এলেন চিকিৎসাধীন স্পিকার মির্জা গোলাম হাফিজকে দেখতে। সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান। জিয়া শাহ আজিজকে নিয়ে জলিলের কেবিনে গেলেন। তাঁদের দেখে মজিদ পেছনে ব্যালকনির দিকে সরে গেলেন। জিয়া জলিলকে বললেন, 'ঘর এত অন্ধকার কেন?' তিনি নিজেই সুইচ অন করে বাতি জ্বালালেন। জলিল শুয়ে ছিলেন। বললেন, 'সারা জীবন তো অন্ধকারেই থাকতে হবে।' তিনি তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিষয়ে ইঙ্গিত করেছিলেন। জিয়া শাহ আজিজকে লক্ষ করে বললেন, 'দেখেন দেখেন, ও এখনো কেমন রাগী। সব সময় এরকমই ছিল।' জলিল হঠাৎ জিয়াকে প্রশ্ন করে বসলেন, 'হোয়াই ডিড ইউ হ্যাং তাহের?' জিয়া কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, 'আমার ওপর প্রেশার ছিল। আমার কোনো চয়েস ছিল না, সবাই এটা চেয়েছিল।'[৩০]

১৯৮০ সালের ২৪ মার্চ জলিল জেল থেকে ছাড়া পান। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মুক্তি পাওয়া কারাবন্দীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। আ স ম রবের প্যারোল প্রত্যাহার করে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি ১৭ মে জার্মানি থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন।

সিরাজুল আলম খান ১৯৮০ সালের পয়লা মে ময়মনসিংহ জেল থেকে মুক্তি পান। এই মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে তিনিই সবার শেষে ছাড়া পান। কমলাপুর স্টেশন থেকে তিনি সরাসরি পিজি হাসপাতালে যান এবং সেখানে অনেক দিন চিকিৎসাধীন থাকেন।

জিয়াউর রহমান সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। জিয়ার সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের সাক্ষাতের ব্যবস্থাটি করে দিয়েছিলেন মেজর জলিল। শ্রমিকনেতা রুহুল আমিন ভূঁইয়ার একটা ফক্সওয়াগন গাড়িতে করে করপোরাল মজিদ সিরাজুল আলম খানকে নিয়ে যান। মজিদ গাড়িতেই বসে ছিলেন।[৩১] জিয়ার ক্যান্টনমেন্টের বাসায় সাক্ষাতের সময় ঠিক করা হলো ১৯৮১ সালের ৯ মে, রাত ১২টায়। সিরাজুল আলম খান পাঁচ মিনিট আগেই পৌঁছে গেলেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানান শিল্পমন্ত্রী জামালউদ্দিন আহমদ। জিয়া বঙ্গভবনে কাজে আটকে পড়েছিলেন। একটু পরপর ফোন করে তিনি অতিথির খোঁজ নিচ্ছিলেন। তিনি যখন এলেন, তখন রাত দুইটা। অবশেষে দেখা হলো দুজনের। একজন জাসদের প্রধান কুশীলব। আরেকজন অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ের রাষ্ট্রক্ষমতার নিয়ন্ত্রক।

জিয়া : আরও আগে দেখা হলো না কেন?

সিরাজ : পারহ্যাপস, উই ডিড নট উইশ (হয়তো আমরা চাইনি)।

জিয়া : হয়তো-বা।

জিয়া বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা নিয়ে তাঁর আশাবাদের কথা জানালেন। একপর্যায়ে বললেন, 'একসাথে কাজ করার সুযোগ আছে কি?'

সভা যখন শেষ হলো, রাত তখন সাড়ে তিনটা। এত রাতে তিনি কীভাবে ফিরে যাবেন—এ নিয়ে জামালউদ্দিন একটু উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। জিয়া হেসে বললেন, 'আপনাকে ভাবতে হবে না। উনি এভাবে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত।' জিয়াউর রহমান ও সিরাজুল আলম খানের মধ্যে এটাই প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ।[৩২] এর ২০ দিন পর জিয়া নিহত হন। সেপ্টেম্বরে সিরাজুল আলম খান লন্ডনে চলে যান। ফিরে আসেন ১১ মাস পর। তত দিনে দেশে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। ক্ষমতার কেন্দ্রে তখন জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ।

তাঁর গোটা মেয়াদকালে জিয়া বাইরের রাজনৈতিক শক্তির চেয়ে সেনাবাহিনীর লোকদের কাছ থেকে অনেক বেশি বিরোধিতার মোকাবিলা করেছেন। তাঁকে ১৭-১৮টি অভ্যুত্থান-প্রচেষ্টা সামাল দিতে হয়েছিল। এসবের মধ্যে শেষটিতে তিনি নিহত হন। অভ্যুত্থান দমনে জিয়া ছিলেন 'সুকঠোর, ক্ষমাহীন এবং নির্দয়।'[৩৩]

১৯৮১ সালের ৩০ মে জিয়াউর রহমান নিহত হন। উপরাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন। ওই বছরের ১৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি

১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন উপলক্ষে জাসদের একটি মিছিল

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সাত্তার বিএনপির পক্ষে প্রার্থী হন। বিরোধী দলের পক্ষে একক প্রার্থী দেওয়া নিয়ে মতানৈক্য হয়। আওয়ামী লীগের প্রার্থী হন ড. কামাল হোসেন। অন্য দলের প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন ন্যাপের অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ এবং জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের যৌথ প্রার্থী মেজর এম এ জলিল। এ ছাড়াও ৩৫ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন। এম এ জি ওসমানী স্বতন্ত্র প্রার্থী হলেও 'নাগরিক কমিটি'র ব্যানার ব্যবহার করেন।

জলিলের আলাদা প্রার্থী হওয়া নিয়ে জাসদে ভিন্নমত ছিল। জাসদের অনেকেই ওসমানীকে সমর্থনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু ওসমানী কোনো দলের হয়ে নির্বাচন করতে রাজি না হওয়ায় জাসদ নিজেদের প্রার্থিতা ঘোষণা করে। জাসদ নির্বাচন উপলক্ষে একটা 'ত্রিদলীয় ঐক্যজোট' গড়তে সক্ষম হয়। তবে তা ভোটারদের নজর কাড়তে পারেনি।

নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রা পূর্ববর্তী সাধারণ নির্বাচনের অনুরূপ ছিল। ভোটারদের ৫৪ দশমিক ৩ শতাংশ ভোট প্রদান করেন। জলিল মাত্র ১.১ শতাংশ ভোট পান (পরিশিষ্ট ৫)।

তথ্যনির্দেশ

১. *সাম্যবাদ*, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১ জুলাই ১৯৭৬, পৃ. ৫-১৬।
২. *দৈনিক বাংলা*, ১১ জুলাই ১৯৭৬।
৩. চৌধুরী, মিজানুর রহমান, পৃ. ১৭৯।
৪. আবুল হাসিব খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৫. *The Bangladesh Gazette, Extraordinary*, 29 July 1976. p. 2507-92.
৬. *দৈনিক বাংলা*, ৫ আগস্ট ১৯৭৬।
৭. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬।
৮. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ৩১ অক্টোবর ১৯৭৬।
৯. *সংবাদ*, ১ নভেম্বর ১৯৭৬।
১০. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ২২ নভেম্বর ১৯৭৬।
১১. *The Bangladesh Gazette, Extraordinary*, 24 December 1976, p. 3493-4.
১২. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ এপ্রিল ১৯৭৭।
১৩. *The Bangladesh Gazette, Extraordinary*, 23 April 1977, p. 5397-403.
১৪. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ১ মে ১৯৭৭।
১৫. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ২৫ মে ১৯৭৭।
১৬. *The Bangladesh Gazette, Extraordinary*, 17 April 1978, p. 1041.
১৭. Milam, p. 55.
১৮. হামিদ পৃ. ১৭১।
১৯. হামিদ, পৃ. ১৭২।
২০. করপোরাল আবদুল মজিদের সঙ্গে আলাপচারিতা।
২১. ওই।
২২. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ১২ মে ১৯৭৮।
২৩. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ২২ মে ১৯৭৮।
২৪. মিয়া, পৃ. ২৯১।
২৫. *সংবাদ*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮।
২৬. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮।
২৭. আবদুল মতিন মিয়ার সঙ্গে আলাপচারিতা।
২৮. হাবিব, পৃ. ৬৫-৭৫।
২৯. হাবিব, পৃ. ১১০-১১৬।
৩০. করপোরাল আবদুল মজিদের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৩১. ওই।
৩২. সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৩৩. আহমদ, মওদুদ (২০১০), *চলমান ইতিহাস—জীবনের কিছু সময় কিছু কথা*, ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ৪৮৬।

ভাঙন

১৯৭৬ সালের ৩১ অক্টোবর জাসদের ওই সময়ের কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়, বিলুপ্ত হয় গণবাহিনীসহ বিপ্লবী পার্টি গঠনের সাংগঠনিক প্রক্রিয়া। গণসংগঠনগুলোকে কার্যকর করে নতুন একটি সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নেতারা জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি নতুন সমন্বয় কমিটির জন্ম ও যাত্রা শুরু হয়। এতে ছিলেন প্রতিটি গণসংগঠন থেকে দুজন করে—পদাধিকারবলে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। তাঁরা হলেন জাসদের এম এ জলিল এবং আ স ম আবদুর রব, শ্রমিক লীগের মোহাম্মদ শাজাহান ও রুহুল আমিন ভূঁইয়া, কৃষক লীগের খন্দকার আবদুল মালেক ও হাসানুল হক ইনু এবং ছাত্রলীগের মুনির উদ্দিন আহমদ ও আবুল হাসিব খান। আলোচনা ও মতবিনিময়ের জন্য প্রয়োজন মনে করায় আরও চারজন 'দায়িত্বশীল ও অভিজ্ঞ সাথিকে' সমন্বয় কমিটিতে রাখা হয়। তাঁরা হচ্ছেন সিরাজুল আলম খান, নূরে আলম জিকু, মির্জা সুলতান রাজা ও শাজাহান সিরাজ। ১২ জনের এই সমন্বয় কমিটি কর্মসূচি, সংগঠন ও আন্দোলন প্রসঙ্গে একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তৈরি করে। বিশ্লেষণে তত্ত্বকথার ছড়াছড়ি ছিল আগের মতোই। প্রচুর শব্দ ছিল, যেগুলো স্রেফ বলার জন্যই বলা। দলে তখন ভাঙনের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। তার সুর প্রচ্ছন্নভাবে উঠে এসেছিল এই বিশ্লেষণের ভূমিকায়।

> আমাদের মধ্যে বহু বিষয়ে অনৈক্য বিরাজ করছিল। অনৈক্য যে বিরাজ করছে, তা উপলব্ধি করলেও আমাদের ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি প্রসঙ্গে মোটেই ঐকমত্য পোষণ করি না। অর্থাৎ, আমাদের অনৈক্যের রূপ ও চরিত্র নির্ধারণ করার প্রশ্নে আমাদের চিন্তায় উল্লেখযোগ্য অনৈক্য বিদ্যমান। তাই বিগত

সমন্বয় কমিটির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-সংবলিত পুস্তিকার প্রচ্ছদ

আন্দোলনের অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের ত্রুটিগুলোকে চিহ্নিত করার প্রশ্নে এবং ভবিষ্যৎ আন্দোলন রচনার ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল বিতর্ক। সেই বিতর্কের ঝড়ের ঝাপটায় আন্দোলন ও সংগঠনের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলো পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিই যদি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, মৌলিক দিকগুলো যদি অস্বীকার করা হয়, তবে বিতর্কের মধ্য থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট সঠিক চিন্তা আর গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। তাই বিতর্কের বেড়াজালে আটকে পড়ে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সন্দেহ প্রকাশ অথবা মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে অস্বীকার করার কোনোরূপ চেষ্টা থেকে আমাদের অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। বিতর্কের মাঝে সেরূপ কোনো ঝোঁককে রুখতে হবে। বিতর্কের অবসান করতে হলে আমাদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সবার সুষ্ঠু ধারণা অর্জন করতে হবে এবং এই আলোকে জনগণকে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার সর্বাত্মক

উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সে জন্য ১৮ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে ব্যাপক জনতার আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।[১]

অতীত আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে সমন্বয় কমিটির বিশ্লেষণে বলা হয় :

অনেকের কাছে অতীত একটা হাস্যরসের বিষয় হলেও একেকটা বাস্তবতায় থাকে একেকটা জনগোষ্ঠীর সম্ভাব্য উন্নত আচরণ। ইতিহাসের কোনো ব্যর্থতাকে সেই ইতিহাসের উত্তরসূরিদের তা ব্যর্থ বলার আগে প্রয়োজন এর সফলতার ইতিহাস রচনা করা। পূর্বসূরিদের খাটো করে দেখার মধ্যে আনন্দ নেই, আনন্দ আছে পূর্বসূরিদের ব্যর্থতার কারণ ও ত্রুটিগুলোকে বড় করে না দেখে আমাদের সফলতার পথে ত্রুটিগুলোর অনুপস্থিতি ঘটানোতে।...ব্যর্থ মানসিকতা দিয়ে সংগঠনের অতীতকে না দেখে বিজয়ের গর্বে দীপ্ত মানসিকতা দিয়েই অতীতকে দেখতে হবে।[২]

জিয়াউর রহমান এ সময় নিজস্ব রাজনৈতিক দল বানানোর উদ্যোগ নিলে অনেক রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে যাদের নির্বাচন করে রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার সক্ষমতা ছিল না, তাদের অনেকেই জিয়ার দলে ভিড়তে শুরু করে। এ সময় জাসদ-ছাত্রলীগের অনেক নেতা-কর্মী জিয়ার দলে যোগ দেন। ছাত্রলীগের ঢাকা নগর শাখার অনেক নেতা জাতীয়তাবাদী যুবদলের ভিত্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। দলত্যাগীদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগের একসময়ের সভাপতি ও জগন্নাথ কলেজ ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সহসভাপতি সাইফুর রহমান, ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি শেখ আতাউর, ঢাকা মহানগর কমিটির সদস্য জাহাঙ্গীর আমীর এবং কাজী মনির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল শাখার সাধারণ সম্পাদক গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সহসভাপতি জিয়াউল হক ফারুক, ছাত্রলীগ ঢাকা মহানগর কমিটির সহসভাপতি আ ফ ম রুহুল আমিন, ঢাকার সোহরাওয়ার্দী কলেজ ছাত্র সংসদের সহসভাপতি জামাল উদ্দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রেদোয়ান আহমেদ প্রমুখ। জাসদের নেতাদের কেউ কেউ সরাসরি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জাসদের সহসভাপতি এহসান আলী খান, একসময়ের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশীদ, খুলনা জেলা জাসদের সভাপতি শেখ রাজ্জাক আলী, ঢাকার কালীগঞ্জের এমদাদ হোসেন ইমদু, কুমিল্লার আবুল কাশেম, সাতক্ষীরার শেখ আনসার আলী এবং বরিশালের রুহুল আমিন হাওলাদার।

যাঁরা জিয়াউর রহমানের শাসনামলে বিএনপির ট্রেনে ওঠেননি বা উঠতে পারেননি, জেনারেল এরশাদ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাঁদের অনেকেই পরে জেনারেল এরশাদের দলে ভেড়েন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জাতীয়

শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন ভূঁইয়া, উত্তরাঞ্চলের গণবাহিনীর কমান্ডার এ বি এম শাহজাহান, ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সদস্য ঝিনাইদহের গোলাম মোস্তফা ও পাংশার আবদুল মতিন মিয়া, পটুয়াখালীর সরদার আবদুর রশীদ, বরিশালের আবদুল বারেক, সিলেটের মকসুদ আজিজ ইবনে লামা, ঢাকা মহানগরের আবদুস সালাম এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হুমায়ুন কবির। এ ছাড়া ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু মাঝখানে কিছুদিন বাসদের সঙ্গে ঘরকন্না করে এরশাদের পক্ষপুটে আশ্রয় নেন। রুহুল আমিন হাওলাদার বিএনপি ছেড়ে এরশাদের দলে যোগ দেন। ১৯৯১ সালে নির্বাচিত সরকার-পদ্ধতি চালু হলে জাসদের একসময়ের সভাপতি শাজাহান সিরাজ ও কেন্দ্রীয় নেতা গৌতম চক্রবর্তী বিএনপিতে যোগ দেন। জাসদ ছেড়ে পরে সরাসরি আওয়ামী লীগে যোগদানকারীদের মধ্যে ছিলেন মেজর জিয়াউদ্দিন, রওশন জাহান সাথী ও ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল। এ ছাড়া মাদারীপুর জেলা গণবাহিনীর কমান্ডার শাজাহান খান, টাঙ্গাইল জেলা গণবাহিনীর কমান্ডার খন্দকার আবদুল বাতেন, খুলনা অঞ্চলের গণবাহিনীর কমান্ডার কামরুজ্জামান টুকু এবং জাসদের প্রথম জাতীয় কমিটির সহসভাপতি এবং পরে এক অংশের সভাপতির দায়িত্বে থাকা মির্জা সুলতান রাজাও যোগ দেন আওয়ামী লীগে। জাসদ ছাত্রলীগের নেতা এবং পরে পর্যায়ক্রমে ডাকসুর নির্বাচিত সহসভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না এবং আখতারুজ্জামান কিছুদিন বাসদে কাটিয়ে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। মাঈনউদ্দিন খান বাদল প্রথমে জাসদ ছেড়ে বাসদে যান। বাসদ ভেঙে দুই টুকরা হলে তিনি আ ফ ম মাহবুবুল হকের গ্রুপের সঙ্গে থাকেন কয়েক বছর। পরে আবার জাসদে ফিরে আসেন।

১৯৮০ সালের ২৯-৩০ মার্চ ঢাকায় জাসদের কাউন্সিল অধিবেশন হয়। এর আগে হাসানুল হক ইনুকে আহ্বায়ক করে ১৯৭২ সালে লেখা জাসদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। '৮০ সালের কাউন্সিলে নতুন খসড়া গঠনতন্ত্র উপস্থাপন করা হয়। সিদ্ধান্ত হয়, ছয় মাসের মধ্যে বিশেষ কাউন্সিল ডেকে গঠনতন্ত্র সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বিশেষ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮১ সালের ২৮-২৯ মার্চ।

জাসদের সমন্বয় কমিটির বিশ্লেষণের একটা পটভূমি আছে। ১৯৮০ সালে যখন জাসদ পুনর্গঠিত হচ্ছিল, তখন অনেকের মনেই নানা প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। অতীত আন্দোলনের নীতি ও কৌশল নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হচ্ছিল। গণতান্ত্রিক ও সশস্ত্র আন্দোলন, নির্যাতন, কারাবাস এবং অসংখ্য সহকর্মীর

রক্তের পথ পাড়ি দিয়ে আসার মধ্য দিয়ে পোড়খাওয়া মানুষগুলো বদলে যাচ্ছিলেন। এটাই স্বাভাবিক ছিল। ফলে নেতাদের 'কাল্ট' ভেঙে পড়ছিল। এ ধরনের প্রশ্ন ও বিতর্কে অভ্যস্ত ছিলেন না অনেকেই। 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা'র পর্দা ক্রমেই ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছিল অনুসন্ধিৎসু মন। প্রশ্ন উঠেছিল সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া নিয়ে। এ ধরনের প্রশ্ন উঠলে সচরাচর প্রশ্নকারীদের ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে ব্র্যাকেটবন্দী করার একটা সহজাত প্রবণতা আছে এ দেশের রাজনীতিতে। অবশ্য ভিন্ন মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগও ছিল।

নেতাদের অনেকেই যখন জেলে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিন তখন হয়ে উঠেছিল একটা সমান্তরাল কেন্দ্র। সেখানে বসেই অনেক আলাপ-আলোচনা হতো। মধুর ক্যানটিন তখন 'সামরিক গোয়েন্দাদের একটা ডিম পাড়ার জায়গা'। গোয়েন্দারা আসেন সহানুভূতির চাদর জড়িয়ে। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে জাসদ ও ছাত্রলীগের অনেকের। যোগাযোগটা সব সময় দল ও সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী তথা সামরিক সরকারের সঙ্গে ছিল না। এটা ছিল ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যোগাযোগ। প্রত্যেকেই মনে করতেন, তিনিই দলের মুখপাত্র এবং তাঁর সঙ্গেই বুঝি সরকারের যোগাযোগ হচ্ছে।[৩]

সামরিক জান্তা, অর্থাৎ জিয়াউর রহমানের সরকারের সঙ্গে কোনো রকম আপস নয়—এরকম একটা দলীয় নীতি থাকা সত্ত্বেও জেলের বাইরে থাকা নেতাদের অনেকেই প্রকাশ্য রাজনীতিতে দৃশ্যমান হতে চাইছিলেন। মির্জা সুলতান রাজা ও শাজাহান সিরাজ তখন জাসদের হাল ধরেন। তাঁরা জিয়া সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আওয়ামী লীগ প্রথমে এই নির্বাচনে অংশ নিতে চায়নি। জাসদের অবস্থান দেখে এবং গণবিচ্ছিন্নতা এড়াতে তারাও পরে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়।[৪]

আ স ম রব ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি তখনো বন্দী। শাজাহান সিরাজ ও সুলতান রাজা নির্বাচন নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে গেলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে 'ওরা আমাদের জেলে রেখে নির্বাচনে যেতে চায়' বলে তাঁদের হাসপাতালের কেবিন থেকে বের করে দেন। জাসদ পরে নির্বাচনে অংশ নেয়। নির্বাচনের পর প্যারোলে মুক্তি পেয়ে রব জার্মানিতে চলে যান।

১৯৮০ সালের মাঝামাঝি যখন দলের সবাই অতীতের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করছিলেন, তখন মান্না-আখতারের বিরুদ্ধে 'সমান্তরাল কেন্দ্র'

প্রতিষ্ঠা করার অভিযোগ ওঠে। এ সময় মির্জা সুলতান রাজা, শাজাহান সিরাজ, রুহুল আমিন ভূঁইয়া প্রমুখ 'গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকার' প্রতিষ্ঠার স্লোগান উত্থাপন করেন। তাঁরা জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে সমস্ত রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন। পক্ষান্তরে জাসদের একটি অংশ এর বিরোধিতা করছিল। আওয়ামী লীগকে আন্দোলনের জোটে শরিক হিসেবে নেওয়ার ব্যাপারে তাঁদের ঘোরতর আপত্তি ছিল। এই উপদলের অন্যতম মুখপাত্র ছিলেন মাহমুদুর রহমান মান্না। তিনি নতুন একটা স্লোগান উদ্ভাবন করেন : 'রুখো বাকশাল, হটাও জিয়া/ টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া'। মান্না-আখতারকে একপর্যায়ে দল থেকে বহিষ্কার করার প্রস্তাব হয়। তাঁরা তখন যথাক্রমে ডাকসুর নির্বাচিত সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। ব্যাপারটা সহজেই মেটানো যেত। কিন্তু জনপ্রিয় প্রাক্তন ছাত্রনেতা আ ফ ম মাহবুবুল হক মান্না-আখতারের পক্ষে দাঁড়ান। এদিকে মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এবং খালেকুজ্জামান ভূঁইয়াও মান্না-আখতারের পক্ষ নেন। দলে তাঁরা এসইউসিআইয়ের মতাদর্শের প্রতিনিধি ছিলেন এবং এই সুযোগে জাসদের মধ্যে তাঁরা একটা মেরুকরণ তৈরির চেষ্টা করেন। ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বরে মান্না-আখতার ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কৃত হন। জাসদ জাতীয় কমিটি থেকে মুবিনুল হায়দার, খালেকুজ্জামান ভূঁইয়া, আ ফ ম মাহবুবুল হক, হাবিবুল্লাহ চৌধুরী ও ইকরামুল হককে বহিষ্কার করা হয়। ৭ নভেম্বর তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) নামে নতুন দল ঘোষণা করেন। খালেকুজ্জামান ভূঁইয়া নতুন দলের আহ্বায়ক নিযুক্ত হন। মাহবুবুল হক ও মান্না ছাত্রদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ছিলেন। ফলে জাসদ-সমর্থিত ছাত্রলীগের বেশির ভাগ কর্মী বাসদের পক্ষে চলে যান। এ ভাঙন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে জাসদের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায় ১৯৮১ সালের ২৮ জুন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত জাসদের বিশেষ কাউন্সিলে দেওয়া সাধারণ সম্পাদকের ভাষণ থেকে :

> অপ্রকাশ্য আন্দোলনের ভেতর দিয়ে এক সুদৃঢ় শক্তির জন্ম হলেও আন্দোলনের ব্যাপ্তি বহুলাংশে কমে যাওয়ায় কিছু ব্যক্তির মধ্যে জন্ম নেয় হতাশা। সংগঠনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ও নিজেদের আকাঙ্ক্ষার প্রশ্নে দেখা দেয় সন্দেহ। ফলে কিছু কূট-উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হয় সংগঠনকে বহিষ্কারের মাধ্যমে। আবার কিছু ব্যক্তি অপ্রকাশ্য আন্দোলনের তীক্ষ্ণতা ও প্রচণ্ডতার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হওয়ায় সংগঠনে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। ফলে

> বুলিসর্বস্ব তত্ত্ব দিয়ে আন্দোলনে ভ্রান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সৃষ্টি করেন কিছু তাত্ত্বিক জগাখিচুড়ির। আদর্শগত সংগ্রামের নামে সংগঠনের অভ্যন্তরে গোপন ফোরাম তৈরি করেন এবং সর্বস্তরের কর্মীদের বিভ্রান্ত করতে শুরু করেন।...এ অবস্থায় সংগঠন তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় এবং বহিষ্কার করে।[৫]

১৯৭৯-৮০ সালে নতুন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। এত দিন জাসদ ছিল 'অপ্রকাশ্য'। শত শত কর্মী গণবাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁদের কাছে অস্ত্র ছিল। তাঁদের রাজনীতির ভাষা ছিল ভিন্ন। ১৯৭৮ সালে অনেকেই অস্ত্র সমর্পণ করে প্রকাশ্য রাজনীতিতে ফিরে আসার সুযোগ করে নেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় সংসদের সদস্যও নির্বাচিত হন। কিন্তু তরুণদের অনেকের মধ্যে গতানুগতিক রাজনীতির প্রতি আগ্রহ ছিল না। সরকারি বাহিনীগুলোর আঘাতে গণবাহিনী তখন পুরোপুরি পর্যুদস্ত, নিঃশেষিত। এ অবস্থায় তাঁরা কোথায় যাবেন?

জাসদ-গণবাহিনীর বেশির ভাগ সদস্য ও কর্মী ছিলেন নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান। বিপ্লবের নেশায় এবং নেতাদের প্ররোচনায় তাঁরা অনেকেই পড়াশোনা ছেড়ে অনিশ্চিত পথের যাত্রী হয়েছিলেন। জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় পাকাপাকিভাবে বসে যাওয়ায় জাসদের কর্মীরা তখন চূড়ান্তভাবে হতাশাগ্রস্ত। এ অবস্থায় তাঁদের অনেকের মধ্যে দেশত্যাগের একটা প্রবণতা দেখা দেয়। অধিকাংশের গন্তব্য পশ্চিম জার্মানি। তখন জার্মানি যেতে বাংলাদেশিদের ভিসা লাগত না। সাতাত্তর সাল থেকেই জাসদের কর্মীরা জার্মানি যাওয়া শুরু করেন। যাওয়ার একটি রুট ছিল ইস্তাম্বুল হয়ে। সেখানে বাংলাদেশি পাসপোর্ট বিক্রি হতো। অনেক ভারতীয় এবং পাকিস্তানি নাগরিকও বাংলাদেশি পাসপোর্ট কিনে জার্মানিতে ঢুকতেন। ইস্তাম্বুলের সুলতান আহমেদ মসজিদের কাছে অবস্থিত 'অনুর' নামের একটি হোটেলে কর্নেল নুর এবং প্রকাশ সিং নামের দুজন ভারতীয় পাসপোর্ট বিক্রির ব্যবসা করতেন। একটি পাসপোর্টের জন্য তাঁরা সর্বোচ্চ পাঁচ শ ডলার নিতেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন দূতাবাস থেকে তাঁরা এসব পাসপোর্ট সংগ্রহ করতেন।[৬]

আ স ম আবদুর রব প্যারোলে মুক্তি পেয়ে চিকিৎসার জন্য জার্মানি যান ১৯৭৯ সালে। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে মেজর জলিল ১৯৮০ সালে এবং সিরাজুল আলম খান ১৯৮২ সালে জার্মানি যান। বাংলাদেশ থেকে জাসদের কয়েক হাজার কর্মী ইতিমধ্যে জার্মানির বিভিন্ন শহরে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। তাঁদের অনেকেই জাসদের প্যাড-সিল বানিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয়ের

জন্য আবেদন করেন। আবেদনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গৃহীত হয় এবং এর ফলে তাঁরা বিভিন্ন পেশায় কাজকর্ম জুটিয়ে নিতে সক্ষম হন। এ সময় আওয়ামী লীগ ও জামায়াতপন্থী লোকজনও অনেকে জাসদের নাম ভাঙিয়ে জার্মানিতে 'রাজনৈতিক আশ্রয়' পেয়ে যান। 'জাসদ' নামটি ব্যবহার করলেই এই সুবিধাটি পাওয়া যেত। বিভিন্ন কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তাঁরা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ জারি রাখেন।

জার্মানির অনেক শহরে জাসদের কমিটি করা হয়। বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটিকে থানা কমিটির মর্যাদা দেওয়া হয়। পশ্চিম বার্লিনের কমিটি ছিল বেশ শক্তিশালী। এর অন্যতম সংগঠক ছিলেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ ও পরে দেবীদ্বার কলেজের ছাত্রলীগের কর্মী মুন্সি ফারুক আহমেদ। আরেকজন সংগঠক ছিলেন গাজী মাজহারুল হক পেয়ারু। তাঁরা দুজন একসঙ্গেই ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে জার্মানি গিয়েছিলেন। জাসদের জার্মান জাতীয় কমিটিকে জেলা কমিটি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর প্রধান সমন্বয়ক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের নেতা গোলাম কিবরিয়া। অন্যান্য সংগঠকের মধ্যে ছিলেন জঙ্গি মাহতাব, মাহবুবুর রহমান, ফজলুল হক সরকার প্রমুখ। জার্মানি যাওয়ার আগে ফজলুল হক ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন।

জাসদ কমিটিগুলোর প্রচারণার ফলে জার্মানদের মনে একটা ধারণা ভালোভাবেই গেড়ে বসে যে, বাংলাদেশে সামরিক স্বৈরশাসন চলছে এবং জাসদের কর্মীরা জেল-জুলুম-হয়রানির শিকার। ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়া সস্ত্রীক জার্মানি সফরে যান। জাসদের কর্মীরা তখন জিয়াবিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। তাঁরা বন শহরে বাংলাদেশের দূতাবাস ঘেরাও করে রাখেন। ফলে রাষ্ট্রদূত ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়ে জিয়াকে স্বাগত জানাতে পারেননি। জিয়াকে জার্মান সরকারের পক্ষ থেকে স্বাগত জানান রাষ্ট্রপতি কার্ল কারস্টেনস ও তাঁর স্ত্রী ভেরোনিকা। রাষ্ট্রপতি জিয়ার স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার গায়ে শীতের পোশাক ছিল না। ফ্রাঙ্কফুর্টে তখন বেশ ঠান্ডা। ভেরোনিকা তাঁর জ্যাকেটটি খুলে খালেদাকে পরিয়ে দেন। জনপ্রিয় দৈনিক *বার্লিনার সাইতুং*-এ খালেদাকে জ্যাকেট পরানোর ছবিসহ ছোট্ট একটি সংবাদ ভেতরের পাতায় ছাপা হয়। শিরোনাম ছিল: 'অরমালান্ড প্রেসিডেন্ট শোয়েনেজ ফ্রাউ অনেমান্টেল', অর্থাৎ গরিব দেশের রাষ্ট্রপতির জ্যাকেটবিহীন সুন্দরী স্ত্রী।' এর কিছুদিন আগে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ফ্রাঙ্কফুর্টে একটা সভা আয়োজনের পরিকল্পনা হয়েছিল। শেখ হাসিনা সে সভায় যোগ দিতে এসেছিলেন। জাসদের কর্মীরা ওই সভা হতে দেননি।[৭]

১৯৮১ সালের ১০ অক্টোবর বন শহরে মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রবিরোধী শান্তি মিছিলে জাসদের বার্লিন কমিটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। মার্কিন নাগরিক অধিকার আন্দোলনের নেতা প্রয়াত মার্টিন লুথার কিংয়ের স্ত্রী কোরেটা স্কট কিং এই মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন।

রুটি-রুজির সন্ধানে জাসদের কর্মীদের অনেকেই ইউরোপের অন্যান্য দেশে যেতে চেয়েছিলেন। অনেকের আগ্রহ ছিল ফ্রান্সে যাওয়ার। কিন্তু ভিসার কড়াকড়ি থাকায় তা সম্ভব হচ্ছিল না। ফ্রান্সে রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়া ছিল খুবই কঠিন। ১৯৮২ সালে সিরাজুল আলম খান প্যারিসে গেলে জাসদের কর্মীরা এ বিষয়ে একটা উদ্যোগ নেন। সিরাজুল আলম খান ফ্রান্সের বিচার বিভাগ-সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবীর এক সমাবেশে খোলামেলা কথাবার্তা বলেন। কেউ কেউ জানতে চান, দেশ ছেড়ে বাঙালিরা ইউরোপে আসতে চায় কেন। সিরাজুল আলম খান উত্তরে বলেছিলেন, 'তোমাদের দেশে একটা শিশু হাসপাতালের নিরাপদ শয্যায় জন্ম নেয় এবং তার পর থেকেই সে আনন্দময় জীবনের সবগুলো উপকরণ পেয়ে যায়। আমাদের দেশে শিশু জন্ম নেয় কলাপাতায়, তার নাড়ি কাটা হয় বাঁশের তৈরি ব্লেড দিয়ে। তারপর যদি সে বেঁচে যায়, সারাটা জীবন সে শুধু অভাব আর বঞ্চনা দেখে। পত্রিকা পড়ে আর টেলিভিশন দেখে সে যখন তোমাদের ঐশ্বর্য আর প্রাচুর্যের খোঁজ পায়, সে তখন তার অবস্থা পরিবর্তনের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। এ জন্যই আমাদের দেশের তরুণেরা তোমাদের

১৯৮১ সালের ১০ অক্টোবর বনে যুদ্ধবিরোধী এক সমাবেশে জাসদের বার্লিন শাখার নেতৃবৃন্দ

দেশগুলোতে ভিড় করে।' সিরাজুল আলম খানের কথা শুনে উপস্থিত অনেকেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। এরপর কয়েকজন ফরাসি নাগরিক বাংলাদেশিদের রাজনৈতিক আশ্রয়ের বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। অবস্থার পরিবর্তনও হয়েছিল কিছুটা।[৮]

জেল থেকে জলিল যখন ছাড়া পান, তখন ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার (পিএলও) প্রধান ইয়াসির আরাফাত ঢাকায়। ঢাকা মেডিকেল কলেজে তখন বেশ কয়েকজন ফিলিস্তিনি ছাত্র ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আল ফাত্তাহর প্রতিনিধি ছিলেন জাহেদ। ফিলিস্তিনে জর্জ হাবাশের নেতৃত্বাধীন 'পপুলার ফ্রন্ট ফর লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন' (পিএফএলপি) ছিল একটি মার্ক্সবাদী দল। ঢাকায় এর প্রতিনিধি ছিলেন ফিলিস্তিনি মেডিকেল ছাত্র আবদুল্লাহ। লেখক আহমদ ছফার সঙ্গে ফিলিস্তিনি ছাত্রদের যোগাযোগ ছিল। ছফার সঙ্গে জলিলের ছিল ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক।

আরাফাত রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে বঙ্গভবনে ছিলেন। জলিল জাহেদের মাধ্যমে আরাফাতের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি ফিলিস্তিনের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সংহতি জানান এবং যথাসাধ্য সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। আরাফাতের সঙ্গে তাঁর একটা চমৎকার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

আহমেদ আবদুর রাজ্জাক ছিলেন ঢাকায় পিএলওর আবাসিক প্রতিনিধি। তিনি জলিলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। ওই সময় ইরাকের সঙ্গে ফিলিস্তিনের একটা বিরোধ বাধে। ঢাকায় বসবাসরত ফিলিস্তিনি ছাত্ররা ইরাক দূতাবাসে হামলার পরিকল্পনা করেন। পিএফএলপির প্রতিনিধি আবদুল্লাহকে গণবাহিনীর ভাওয়াল ইউনিটের সদস্য ওহাব কিছু অস্ত্র দেন। পরে ইরাক দূতাবাসে হামলার পরিকল্পনা বাতিল করা হয়।[৯]

মেজর জলিল পিএলওর প্রতিনিধি আহমেদ আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে আলোচনা করে ফিলিস্তিনে একটা স্বেচ্ছাসেবী মিশন পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৮১ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি গণবাহিনীর প্রাক্তন সদস্যদের একটা দল বাছাই করা হয়। দলে ছিলেন বেলাল, বাদল, সবুজ, হাবিলদার আবদুল হাই, মানিকলাল সমাদ্দার, দেলোয়ার হোসেন ও শফিকুর রহমান বাবুল। তাঁদের কারও পাসপোর্ট ছিল না। ঢাকার পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কাজী বাহাউদ্দিন এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের পাসপোর্ট তৈরি করিয়ে দেন। পাসপোর্টের ফি দেওয়ার মতো অবস্থাও তাঁদের ছিল না। বাহাউদ্দিন সব খরচ দেন। দলটি ব্যাংকক ও করাচি হয়ে বৈরুতে যায়। সেখান থেকে তাঁদের ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী বুর্জনেল বারাজনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের বলা হয় যুদ্ধ করতে। তাঁরা

বেঁকে বসেন। বলেন, তাঁরা যুদ্ধ করতে আসেননি, এটা তাঁরা দেশেই করেছেন। এখানে তাঁরা এসেছেন উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিতে। পরে তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ওই প্রশিক্ষণকেন্দ্রে অন্যান্য দেশের লোকজনও ছিল। এদের মধ্যে ছিল মাফিয়া ডন জুয়ান কার্লোসের কয়েকজন অনুগামী, তুর্কি কমিউনিস্ট পার্টি (টিকেপি) এবং ফিলিপাইনের মোরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের কয়েকজন সদস্য। প্রশিক্ষণ চলে প্রায় দেড় মাস। জুনে তাঁরা ঢাকায় ফিরে আসেন। ফিলিস্তিনে থাকতেই তাঁরা খবর পেয়েছিলেন যে, রাষ্ট্রপতি জিয়া নিহত হয়েছেন। তাঁদের ধারণা হলো, 'জেনারেল মঞ্জুর এখন ক্ষমতায়। তিনি সিরাজুল আলম খানের কাজিন। সুতরাং ক্ষমতা এসে গেছে, বিদেশে পড়ে থাকার কী দরকার?' ঢাকায় ফিরে দেখলেন, ক্ষমতার ধারেকাছেও তাঁরা নেই।[১০]

জলিল পরে শতাধিক লোককে ফিলিস্তিনে পাঠান 'স্বেচ্ছাসেবক' হিসেবে। তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিনজন ছিলেন। তাঁরা হলেন জেলা গণবাহিনীর

ফিলিস্তিন যাওয়ার পথে দামেস্কে। বাঁ থেকে (দাঁড়ানো) সৈয়দ বাহারুল হাসান সবুজ, বাদল খান, ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল, (বসা) মো. আশরাফ, শফিকুর রহমান বাবু ও দেলোয়ার হোসেন

ফিলিস্তিনে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী বাদল খানের পরিচয়পত্র

কমান্ডার ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজ ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সহসভাপতি জিয়াউল হক সরকার, সদর থানা গণবাহিনীর কমান্ডার মোহাম্মদ আবদুল হামিদ এবং মহসিন মাস্টার। জিয়াউল ও হামিদ ১৯৭৬ সালে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ১৯৮২ সালে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তাঁরা মেজর জলিলের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফিলিস্তিনে যান। ওই দলে তাঁরা জনা দশেক ছিলেন। জলিল প্রত্যেককে পঞ্চাশ ডলার করে হাতখরচ দেন। কথা ছিল, মাসে তাঁরা প্রত্যেকে দশ হাজার টাকা পাবেন (তখনকার মূল্যমান অনুযায়ী প্রায় পাঁচ শ ডলার)। কিন্তু তাঁরা কোনো টাকাপয়সা পাননি। তাঁরা অভাব-অনটনের মধ্যে মানবেতর জীবন যাপন করেছেন। চা আর শুকনো রুটি খেয়ে কোনোমতে জীবনধারণ করতে হয়েছে তাঁদের। তিন মাস পর তাঁরা কপর্দকহীন অবস্থায় দেশে ফিরে আসেন।[১১]

মাথায় যুদ্ধের পোকাটা তখনো কিলবিল করছে। ১৯৮২ সালের মার্চের এক সন্ধ্যায় মোহাম্মদপুরে কর্নেল আবু তাহেরের পরিবার যে বাসায় থাকত, সেখানে তাহেরের বড় ভাই আবু ইউসুফের সঙ্গে প্রাক্তন গণবাহিনীর কয়েকজন সদস্যের একটা সভা হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বাদল, বেলাল, মুশতাক, সবুজ, বাবুল, দুলাল, আনোয়ার হোসেন ও মশিয়ুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। আবু ইউসুফ বললেন, 'আমাদের লিবিয়া যেতে হবে। গাদ্দাফির ডান হাত ক্যাপ্টেন সালেম ঢাকায় জলিলের সঙ্গে মিটিং করেছেন।' বাদল ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেলেন। বললেন, 'কর্নেল ফারুকের মিশনে কেন আমরা

লিবিয়া যাব?' সন্ধ্যায় বাদল জাসদের নেতা মনিরুল ইসলামের বাসায় গিয়ে পরামর্শ করলেন। অন্যদের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখলেন না। এক সপ্তাহের মধ্যেই ৪০-৫০ জনের একটা দল লিবিয়া রওনা হয়ে যায়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শমশের আলম নশু, মাইনু, মজনু, খোকন, পিন্টু, বুলু, আসিফ, স্বপন প্রমুখ। যাওয়ার আগে প্রত্যেককেই কিছু ডলার দেওয়া হয়। অনেকে টাকা দিয়ে ডলার কেনেন। যাওয়ার পথে ব্যাংককের হোটেলে টাকাপয়সা নিয়ে একটা বচসা, এমনকি হাতাহাতি পর্যন্ত হয়। নশু ও মজনু বিদ্রোহ করেন। অতঃপর তাঁরা লিবিয়া যান এবং একটা 'ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পে' যোগ দেন। কিছুদিন পর ক্যাম্প থেকে অনেকে ফেরত আসেন।[১২]

কয়েকটি ব্যাচে জাসদের কয়েক শ তরুণকে লিবিয়া পাঠানো হয়। রিক্রুটমেন্টের দায়িত্ব পান প্রধানত আবু ইউসুফ। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এবং জাসদ-ছাত্রলীগের কর্মী ডাক্তার শফিক ও ডাক্তার রেজোয়ান তখন লিবিয়ায় কাজ করতেন। তাঁরাও এই প্রক্রিয়ায় সাহায্য করেন। যাঁদের যাওয়ার কথা ছিল, তাঁরা জানতেন যে তাঁরা লিবিয়ায় সামরিক প্রশিক্ষণ নেবেন এবং তাঁদের ভাতা দেওয়া হবে। লিবিয়ায় প্রশিক্ষণের জন্য একটা 'আন্তর্জাতিক ক্যাম্প' ছিল। সেখানে কর্নেল ফারুক, কর্নেল রশিদ ও মেজর বজলুল হুদা ট্রেনিং দিতেন। লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফির ডান হাত বলে পরিচিত ক্যাপ্টেন সালেমও আসতেন মাঝেমধ্যে। ঝটিকা আক্রমণের পদ্ধতি থেকে শুরু করে বিমান ছিনতাই, এসবের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। এসবের পাশাপাশি চলত রাজনৈতিক ক্লাস। গাদ্দাফির 'গ্রিন বুক' পড়ানো হতো। একটা ধারণা দেওয়া হয়েছিল যে, শিগগিরই তাঁরা বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে কর্নেল ফারুক বললেন, '১৫ আগস্টের ব্যাপারে আপনাদের মন্তব্য কী?' নশু পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা শেখ মুজিবকে মারলেন কেন, এটা আগে বোঝান।' ফারুক হুমকি দিয়ে বললেন, 'কথামতো না চললে চাদে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।' লিবিয়ার পাশের দেশ 'চাদ'-এ তখন গৃহযুদ্ধ চলছিল।[১৩] পরে দশ জনের একটা দলের সঙ্গে করপোরাল আবদুল মজিদ লিবিয়া যান। তাঁরা ত্রিপোলির একটা তিনতলা বাড়িতে থাকতেন। এটাকে একটা অতিথিশালা বানানো হয়েছিল। সেখান থেকে কর্নেল ফারুক করপোরাল মজিদকে 'আন্তর্জাতিক ক্যাম্পে' নিয়ে যান। মজিদ দুই সপ্তাহ পর ঢাকায় চলে আসেন।

লিবিয়া থেকে ফিরে এসে কেউ কেউ ফারুক-রশিদের ফ্রিডম পার্টিতে যোগ দেন। তাঁদের অন্যতম ছিলেন হান্নান চৌধুরী। তাঁর ভাই মো. ফারুক

পরে *মিল্লাত* পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। ফ্রিডম পার্টি এই পত্রিকাটি চালাত। মেজর জলিল নিজেও লিবিয়া গিয়েছিলেন। তিনি ১৯৮২ সালে ত্রিপোলিতে অনুষ্ঠিত ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য আন্তর্জাতিক সংহতি সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশ নেন। একই সম্মেলনে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিত্ব করেন আবদুল মালেক উকিল।[১৪]

মেজর জলিলের সঙ্গে লিবীয় কর্তৃপক্ষের ভালো যোগাযোগ ছিল। ১৯৮১ সালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জলিল প্রার্থী হয়েছিলেন। এ সময় তিনি লিবিয়া থেকে কিছু আর্থিক সাহায্য পান। ১৯৮০ সালে *গণকণ্ঠ* পত্রিকা নতুন করে প্রকাশিত হতে থাকলে জলিল এ জন্য বেশ কিছু অর্থ জোগাড় করে দেন। এ সময় প্রাক্তন তথ্যসচিব বাহাউদ্দিন চৌধুরী এবং ছায়ানটের ওয়াহিদুল হক যথাক্রমে সম্পাদক ও নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে *গণকণ্ঠ* পত্রিকায় যোগ দেন। জাসদের নেতাদের কেউ কেউ এমন অভিযোগও করেন যে, জলিল লিবিয়া থেকে অনেক টাকা আনেন, কিন্তু *গণকণ্ঠ* এবং দলের তহবিলে তার সবটা দেননি। একপর্যায়ে জলিল বিরক্ত হয়ে শাজাহান সিরাজ ও হাসানুল হক ইনুকে ঢাকার লিবীয় দূতাবাসে নিয়ে যান এবং দূতাবাসের সেক্রেটারির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। ঢাকার লিবীয় দূতাবাসে কোনো আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রদূত ছিলেন না। মূল প্রতিনিধি 'সেক্রেটারি' নামে পরিচিত ছিলেন। জলিল সেক্রেটারিকে বলেন, 'এখন থেকে এঁরাই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।' সেক্রেটারি মনঃক্ষুণ্ন হয়ে জলিলকে বলেন, 'তোমার লোকেরা তোমাকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু আমরা তোমাকেই বিশ্বাস করি, এদের নয়। সুতরাং ক্লিন দিস চ্যাপ্টার।' এরপর টাকাপয়সা দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। জলিলের মাধ্যমে ঢাকায় লিবীয় দূতাবাসের সঙ্গে লেখক আহমদ ছফার যোগাযোগ ঘটে। পরে জলিলকে এড়িয়ে ছফা নিজেই লিবীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকেন।[১৫] ছফা কিছু আর্থিক অনুদান পান গাদ্দাফির *গ্রিনবুক* বাংলায় অনুবাদ করার জন্য।[১৬]

মেজর জলিল সরল-সোজা মানুষ ছিলেন। তাঁর মধ্যে ছিল প্রচণ্ড আবেগ। তিনি 'হিরোইজমে' আচ্ছন্ন ছিলেন। সব সময় কিছু একটা করতে চাইতেন। দলের মধ্যে জলিলের কার্যকলাপ নিয়ে সমালোচনা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে ফিলিস্তিন ও লিবিয়ায় স্বেচ্ছাসেবী পাঠানোর নামে 'আদম ব্যবসার' অভিযোগ আনা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ ছিল, দলীয় সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু বা জাতির পিতা হিসেবে ঘোষণা দেওয়া।[১৭]

মেজর জলিলের বিরুদ্ধে পিএলও এবং লিবিয়ায় লোক পাঠিয়ে চাঁদা আদায় করার অভিযোগ উঠলে জলিল নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেন, তিনি

লেখক আহমদ ছফা

যা কিছু করেছেন, দলের স্বার্থেই করেছেন। জাসদের জাতীয় কমিটির সদস্যদের উদ্দেশে লিখিত এক বক্তব্যে তিনি তাঁর যুক্তিগুলো তুলে ধরেন।

> আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে পিএলওতে লোক পাঠানো ও সে কারণে অর্থ গ্রহণের বিষয়ে।...বছর কয়েক আগে পিএলওর নেতা ইয়াসির আরাফাত ঢাকা এলে বঙ্গভবনে এক অনুষ্ঠানে তার সাথে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ আসে। আলোচনার একপর্যায়ে আরাফাত আমার কাছে তাঁর সক্রিয় যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য কিছু দলীয় যোদ্ধাকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে প্রেরণ করার জন্য আবেদন করেন। জনাব আরাফাতও আমাদের দেশের ও দলের বিভিন্ন অবস্থা গভীর মনোযোগের সাথে শুনে প্রেরিতব্য স্বেচ্ছাসেবকদের সেখানে যে হাতখরচের জন্য অর্থ প্রদান করা হবে, তার একটা অংশ চাঁদা হিসেবে দলের কাছে আসতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন। সেদিন আমরা আলোচনার মধ্য দিয়ে পিএলওতে স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণের জন্য একমত হই। দলের সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক ও জনাব সিরাজুল আলম খানের কাছে এ বিষয় নিয়ে বহু আলোচনা করেছি।...এই সময় দলীয় কার্যাবলি পরিচালনা, বড় বড় জনসভা অনুষ্ঠান, *গণকণ্ঠ* পত্রিকার জন্য টাকা ইত্যাদির

প্রয়োজনে আমার ওপর অর্থ সংগ্রহের চাপ আসে। এসব অর্থের চাপদাতা সিরাজ ভাই, শাজাহান সিরাজ ও জিকু ভাইদের আমি আমার অপারগতার কথা জানাই এবং বলি, দেখুন, আমি কোনো সময় চাঁদা সংগ্রহ করিনি। এটা বরাবর রব করে এসেছে এবং সেই পারবে।...তার পরও চাপ অব্যাহত থেকেছে। অর্থের জন্য চাপদানকারী এই ব্যক্তিরা এ ধরনের একটা কার্যক্রমকে অন্যায় বলে চিহ্নিত না করে যেখান থেকে পারি সেখান থেকেই যেন তাদের প্রয়োজনীয় টাকা সংগ্রহ করে দেই, তার জন্য চাপ দিতে থাকে।...যখন যা পেরেছি তা *গণকণ্ঠ* পত্রিকার জন্য সিরাজ ভাই বা রাজা ভাই, দলীয় কার্যক্রমের জন্য শাজাহান সিরাজ এবং জনসভার জন্য জিকু ভাইয়ের হাতে তুলে দিয়েছি।

...লিবিয়ার সাথে সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে একটু খোলামেলা আলোচনা করে নেই।...এ দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের পক্ষ থেকে সৌদি আরব-বিরোধী পেট্রোডলারের রাজ্যে প্রগতিশীল দেশের সন্ধান ছিল খুবই স্বাভাবিক বিষয়। সে ব্যাপারে অতি সহজেই লিবিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাদের দলও সবকিছু বিবেচনা করে লিবিয়ার সাথে একটা ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করে। এ উদ্যোগের সূচনা করি আমি, রব ও শাজাহান সিরাজ।...এ নিয়েও আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। কিন্তু আপনারাই তো ধারাবাহিকভাবে দলীয়ভাবে পরিচালিত *গণকণ্ঠ* পত্রিকায় গাদ্দাফির *গ্রিনবুক* পর্যন্ত ছাপিয়েছেন।...

এরপর সাথীরা, আসুন, লিবিয়ায় ট্রেনিং গ্রহণের জন্য লোক প্রেরণের প্রশ্নটিতে। এ ধরনের ট্রেনিংয়ের সাথে কারা জড়িত এবং কারা লোক প্রেরণ করে, আপনাদের মতো বিষয়টি আমিও জেনেছি। এ ব্যাপারে আমি আপনাদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে এ ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক কোনো বিষয়ের সাথে আমার মতো একজন রাজনীতির সাথে জড়িত ব্যক্তি কোনো অবস্থাতেই জড়িত থাকতে পারে না। এর সাথে পনেরোই আগস্ট ১৯৭৫ সালের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিবর্গ যে জড়িত, সে তথ্য আপনি-আমি যেমনি জানি, তেমনি আমাদের দেশবাসী তাদের ভালোভাবেই জানে।[১৮]

জলিলের বিরুদ্ধে দলের মধ্যে আর্থিক অস্বচ্ছতার অভিযোগ ছিল। জলিল এতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। তিনি অভিযোগকারীদের নীতি-নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। রাজনীতির মঞ্চে নট-নটীদের যে উজ্জ্বল চেহারা দেখা যায়, জলিল তাদের গ্রিনরুমের সত্যিকার চেহারা উন্মোচন করার চেষ্টা করেন তাঁর প্রশ্নবাণে। লিখিত বক্তব্যে তিনি আরও বলেন :

আপনারা আমার বিরুদ্ধে দলীয় অর্থ আত্মসাৎ ও সরকারি আনুকূল্যের অভিযোগ আনতে পারেন। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলুন, দলের চাঁদা তুলে

আমি গ্রহণ করেছি না তা আপনারা করেন। আর সরকার থেকে আর্থিক সহযোগিতা কখনো কি আমার হাত দিয়ে এসেছে না আপনারাই এনেছেন এবং খরচও করেছেন। হয়তো বলবেন, আপনার নির্দেশে করা হয়েছে; তাহলে আমি কি জেলে থেকেও '৭৯ সংসদ নির্বাচনের সময় সরকারের অর্থ আনতে নির্দেশ দিয়েছিলাম? একের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন। আসুন, আমরা দলের স্বার্থে এখনো সংযত হই। আমার বিরুদ্ধে জনশক্তি রপ্তানির সাথে জড়িত থাকার মিথ্যা অপবাদ এনে বলা হচ্ছে, আমাদের রাজনীতি এ অনুমোদন করে কি না? অবশ্যই আমাদের রাজনীতি জনগণের সাথে প্রতারণামূলক কাজকে অনুমোদন করে না। মাননীয় বিচারকমণ্ডলী, আজ আপনাদের রায় দিতে হবে আমাদের রাজনীতি বিদেশের ব্যাংকে টাকা রাখা অনুমোদন করে কি না? যখন-তখন বিদেশে যাওয়া, বিশেষত, ভারতে যাওয়া অনুমোদন করে কি না? চাঁদার অর্থ দিয়ে বিলাসবহুল জীবনযাপন সমর্থন করে কি না? বিষয়গুলো অত্যন্ত কদর্য ঠেকলেও আজ প্রয়োজন এসেছে এগুলোর ওপরও সিদ্ধান্ত নেওয়ার।[১৯]

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের
জাতীয় কমিটির সদস্যদের প্রতি

সভাপতি
মেজর (অবঃ) এম, এ, জলিল

১৯৮৩ সালে জাতীয় কমিটির সদস্যদের কাছে দেওয়া মেজর জলিলের বক্তব্যসংবলিত পুস্তিকার প্রচ্ছদ

জলিলের বক্তব্যে অনেক কিছুর মধ্যে এটা মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য জাসদ সরকারের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল। এর পরই জাসদ ও গণবাহিনীর নেতারা একে একে জেলখানা থেকে ছাড়া পেতে থাকেন।

জলিলের ওপর দল থেকে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। ১৯৮৩ সালে তিনি নিজেই পদত্যাগ করেন এবং 'জাতীয় মুক্তি আন্দোলন' নামে নতুন একটা দল গঠনের ঘোষণা দেন। পরে হাফেজ্জি হুজুরের নেতৃত্বে ১১টি ইসলামি দলের একটা জোট তৈরি হলে 'জাতীয় মুক্তি আন্দোলন' ওই জোটে যোগ দেয়।

জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখলের পর থেকেই তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ছাত্রসংগঠন আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে থাকে। এ সময় পনেরো-দলীয় রাজনৈতিক জোট ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) সংগঠিত হয়। ১৯৮৩ সালের শুরু থেকেই এরশাদবিরোধী আন্দোলন নতুন মাত্রা পায়। এ সময় সিরাজুল আলম খান আন্দোলন বেগবান করার জন্য নানা রকম পরামর্শ দিতেন এবং কর্মসূচিও লিখে দিতেন।[২০] জানুয়ারিতে ঢাকার শ্রমিক নেতাদের একটি গ্রুপ ইস্কাটনে তাঁর বাসায় দেখা করতে গেলে তিনি বলেন, 'আমরা সমাজতন্ত্রী। সমাজতন্ত্রীরাই হলো সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রী। এখন আমাদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা।' যাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মেজবাহউদ্দিন, বাদল খান, সোলেমান, মাসুদ, মনোয়ার প্রমুখ।[২১]

১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৩-১৪ তারিখ এরশাদবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বেশ কয়েকজন নিহত হন। ঢাকা শহরে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে তখন একুশের বইমেলা চলছিল। মেলা বন্ধ হয়ে যায়। সিরাজুল আলম খান আত্মগোপনে চলে যান। পরে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। তিনি এরশাদের সঙ্গে সহযোগিতার কৌশল নেন। তাঁর যুক্তি ছিল, 'এরশাদ যে উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন, তাতে স্থানীয় সরকার-ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এটা একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ এবং তা সমর্থন করা উচিত।'[২২] তাঁর এই অবস্থানের ফলে জাসদের মধ্যে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

১৯৮৪ সালে উপজেলা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জাসদ আবার ভাঙে। সিরাজুল আলম খান এবং আ স ম রব নির্বাচনের পক্ষে মত দেন। কাজী

আরেফ, মির্জা সুলতান রাজা, শাজাহান সিরাজ, মনিরুল ইসলাম, হাসানুল হক ইনু, শরীফ নুরুল আম্বিয়া প্রমুখ নির্বাচন বর্জনের প্রস্তাব করেন। দলের একটি অংশ নিয়ে রব বেরিয়ে আসেন। এর আগে সবাই মিলে এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। পরে সিরাজুল আলম খান, আ স ম আবদুর রব, নূরে আলম জিকু প্রমুখ এরশাদের সঙ্গে সহযোগিতার কৌশল নেন। মির্জা সুলতান রাজা ও শাজাহান সিরাজ ১৯৮৫ সালে আরেকটি জাসদ গঠন করেন। অন্যরা এরশাদবিরোধী অবস্থান বজায় রাখেন।

দলের ভেতরে কয়েকটি বিষয় নিয়ে শুধু বিতর্কই ছিল না, একধরনের ঠান্ডা লড়াই চলে আসছিল। চুয়াত্তরের ১৭ মার্চ এবং পঁচাত্তরের ৭ নভেম্বর নিয়ে প্রশ্ন ছিল অনেক। এই ঠান্ডা লড়াইয়ের একদিকে ছিলেন গণসম্পৃক্ত নেতৃত্ব, বিশেষ করে জলিল, রব, মির্জা সুলতান রাজা, শাজাহান সিরাজ প্রমুখ। তাঁদের অভিযোগ ছিল, ১৭ মার্চের ঘটনাটির ব্যাপারে তাঁরা কিছুই জানতেন না। ওই ঘটনাটি দলের রাজনীতিকে কোনো সুবিধা দেওয়া তো দূরের কথা, দুর্যোগের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। অন্যপক্ষে ছিলেন গণসংগঠনকে স্থবির করে দিয়ে 'বিপ্লবী পার্টি' গড়ে তোলার প্রবক্তা কাজী আরেফ আহমেদ, মনিরুল ইসলাম, হাসানুল হক ইনু ও শরীফ নুরুল আম্বিয়া। আড়ালে-আবডালে তাঁদের অনেকে 'গ্যাং অব ফোর' (চার কুচক্রী) বলে ডাকতেন। দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতার সম্ভাবনা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছিল। একপর্যায়ে দলের মধ্যে বিভাজন-প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

৭ নভেম্বরের ব্যর্থ বিপ্লবের ধাক্কা জাসদ আর সামলে উঠতে পারেনি। কর্নেল তাহেরের ফাঁসি জাসদের তরুণ সদস্যদের আবেগকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছিল। তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য তৈরি করা হয়েছিল তাহের সংসদ। নেপথ্যে থেকে এই সংসদ পরিচালনা করতেন তাহেরের ছোট ভাই আনোয়ার হোসেন। এ ব্যাপারে সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক আহমদ শরীফের অভিজ্ঞতা সুখকর ছিল না। ১৯৯৭ সালের ২০ জুলাই তিনি তাঁর ডায়েরিতে লেখেন :

> আজ কর্নেল আবু তাহেরের ফাঁসির স্মারকদিন। কর্নেল তাহের সংসদ গঠনের সভায় আমিই ছিলাম সভাপতি। পরে কয়েক বছর তাহের সংসদের সভাপতিও ছিলাম। তাহেরের ভাই মহা-উদ্যোগী ও উদ্যমী ডক্টর আনোয়ার হোসেন একাধারে ও যুগপৎ উচ্চাশী ক্ষমতালিপ্সু, সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানী, আবার গোঁয়ারও। তিনি হঠাৎ আওয়ামী লীগের সমর্থক হয়ে উঠলেন। ফলে আমি তাহের সংসদ ছেড়ে স্বস্থ হলাম।[২৩]

জলিল পদত্যাগ করার সময় বলেছিলেন, 'একটা নিষ্ফল প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকার কোনো মানে হয় না।' সিরাজুল আলম খানের পরামর্শে জেনারেল এরশাদের সঙ্গে সহযোগিতার কৌশল নিলেন রব। অপর পক্ষের প্রক্রিয়াটিও মসৃণ ছিল না। কাজী আরেফ ও মনিরুল ইসলাম গণসংগঠনের নেতা হতে চাইলেন। মনিরুল ইসলামকে জাতীয় শ্রমিক জোটের (শ্রমিক লীগের পরবর্তিত নাম) সভাপতি বানানোর চেষ্টা হলো। ফলে, শ্রমিক জোট ভাঙল। কাজী আরেফ জাসদের সভাপতি হতে চাইলেন। তিনি যাতে সভাপতি হতে না পারেন, সে জন্য তাঁর পক্ষের অন্য নেতারা আরেকটি কৌশল নেন। ১৯৮৭ সালে সভাপতির পদই বিলুপ্ত হয়। পরিবর্তে আসে 'প্রেসিডিয়াম' বা সভাপতিমণ্ডলী। কাজী আরেফ প্রেসিডিয়ামের ১ নম্বর সদস্য হন। ইনু হন সাধারণ সম্পাদক। এভাবেই দলের মধ্যে ইনুর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯৯৭ সালে এক ঐক্য প্রক্রিয়ায় আ স ম রবকে সভাপতি ও ইনুকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কমিটি হয়। ২০০১ সালে রব আবার 'দলত্যাগ' করলে ইনু জাসদের সভাপতি নির্বাচিত হন। সাধারণ সম্পাদক হন জাফর সাজ্জাদ খিচ্চু। ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত জাসদের কাউন্সিল সভায় ইনু পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হন। সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন শরীফ নুরুল আম্বিয়া।

১৯৮৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাসদের দুই গ্রুপই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। আ স ম আবদুর রবের নেতৃত্বাধীন জাসদ (রব) চারটি এবং জাসদ (সিরাজ) ৩টি আসন পায়। রব প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৮ সালের নির্বাচন আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ অনেকগুলো রাজনৈতিক দল বর্জন করে। রবের নেতৃত্বে একটি জোট নির্বাচনে অংশ নিয়ে ১৯টি এবং জাসদ (সিরাজ) ৩টি আসন পায়। আ স ম আবদুর রব সম্মিলিত বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে জাসদ (সিরাজ) থেকে একমাত্র শাজাহান সিরাজ জয়ী হন।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনের পর আ স ম আবদুর রব আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার সদস্য হন। '৯৭ সালে জাসদ আবার একীভূত হয়। ২০০১ সালের নির্বাচনের পরপর রব আবার আলাদা হয়ে যান। দলের মূল ধারাটি তখন থেকে ইনুর নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪-দলীয় জোটের শরিক হিসেবে ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে নবম সংসদে তিনটি আসনে জয়ী হয়ে এই দলটি জাতীয় সংসদে আসনসংখ্যার দিক দিয়ে চতুর্থ বৃহত্তম দল হয়েছিল। আ স ম আবদুর রবের

নেতৃত্বে জাসদ এখন জেএসডি নামে পরিচিত। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির সাধারণ নির্বাচনে জাসদ পাঁচটি আসন পায়। রবের নেতৃত্বাধীন জেএসডি নির্বাচন বর্জন করে।

তথ্যনির্দেশ

১. জাসদ (তারিখ নেই), সমন্বয় কমিটির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, পৃ. ৫-৬।
২. ওই, পৃ. ৬৩-৬৫।
৩. মনিরুল ইসলামের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৪. ওই।
৫. জাসদ, বিশেষ কাউন্সিল—'৮১: সাধারণ সম্পাদকের ভাষণ, ঢাকা, পৃ. ১৭-১৮।
৬. মুন্সি ফারুক আহমেদের সঙ্গে আলাপচারিতা।
৭. ওই।
৮. ওই।
৯. করপোরাল আবদুল মজিদের সঙ্গে আলাপচারিতা।
১০. বাদল খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
১১. মোহাম্মদ আবদুল হামিদের সঙ্গে আলাপচারিতা।
১২. শমশের আলম নণ্ড ও বাদল খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
১৩. শমশের আলম নণ্ডর সঙ্গে আলাপচারিতা।
১৪. করপোরাল আবদুল মজিদের সঙ্গে আলাপচারিতা।
১৫. ওই।
১৬. আহমদ ছফার সঙ্গে আলাপচারিতা।
১৭. জলিল, মেজর এম এ, 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের জাতীয় কমিটির সদস্যদের প্রতি', পৃ. ৮-১৩।
১৮. ওই।
১৯. ওই, পৃ. ২৬।
২০. সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
২১. বাদল খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
২২. সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আলাপচারিতা।
২৩. করিম, নেহাল ও অন্যান্য, পৃ. ১৫৮।

শেষ কথা

সত্তরের দশকে বাংলাদেশে জাসদ ছিল সবচেয়ে আলোচিত ও সমালোচিত রাজনৈতিক দল। জাসদ প্রথাগত রাজনীতির বাইরে পা বাড়িয়েছিল। আর এখানেই তার তাৎপর্য ও বিপত্তি।

জাসদ শুধু একটা রাজনৈতিক দল ছিল না। এটা ছিল মুক্তিযুদ্ধের একাত্তর-পরবর্তী একটা প্রবণতা। তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কোনো বায়বীয় বিষয় ছিল না। এটা এমন একটা আকাঙ্ক্ষা, যা মুক্তিযুদ্ধ করতে প্রেরণা জোগায়। এই দলের অধিকাংশ নেতা-কর্মী মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছিলেন। অন্যরা যুদ্ধটা একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর শেষ করে দিলেও তাঁরা এটাকে তাঁদের মতো করে একটা 'যৌক্তিক পরিণতি'র দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান তৈরি হলো। আমজনতা এই নতুন রাষ্ট্রের পক্ষে ছিল। মুসলিম লীগ এই নতুন রাষ্ট্রকে তাদের ক্ষমতার অবাধ বিচরণ ও লুণ্ঠনের ক্ষেত্র মনে করেছিল। দুই বছর যেতে না যেতেই এ দেশের মানুষের কাছে মুসলিম লীগ পরিণত হয়েছিল একটি প্রতিক্রিয়ার দুর্গে, যা তছনছ হয়ে যায় ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে।

আওয়ামী লীগও একই ভুল করেছিল। একাত্তরের ডিসেম্বরে দলটি নতুন রাষ্ট্রের হাল ধরল এবং মনে করল দেশটা কেবল তাদের। আওয়ামী লীগের সমালোচনা মানেই দেশদ্রোহ, ষড়যন্ত্র। মুসলিম লীগের বানানো জুতায় আওয়ামী লীগ পা রাখল। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হলো। জন্ম নিল জাসদ।

জাসদের একটা প্রধান সমালোচনা ছিল, এই দলটি হঠকারী ও বিভ্রান্ত। অনেকেই মনে করেন, জাসদ না থাকলে আওয়ামী লীগ অনেক বছর সুখে-

স্বাচ্ছন্দ্যে ক্ষমতাসীন থাকতে পারত। সে জন্য আওয়ামী লীগের অনেকেই জাসদকে কোনো দিন ক্ষমা করবে না। ১৯৭১ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের বাইরে সবচেয়ে সংগঠিত ও শক্তিশালী রাজনৈতিক দল ছিল ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি। এই দল দুটো বাহাত্তরে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা নিতে পারত। কিন্তু তারা আওয়ামী লীগের সহযাত্রী হয়ে দেশে আওয়ামী লীগকে একতরফা রাজনীতি করার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল। জাসদের উদ্ভব ঠিক এই সময়ে। তাদের জন্য জমি প্রায় তৈরিই ছিল। জাসদের রাজনীতির খোলনলচে পাল্টে যায় দুটো ঘটনার মধ্য দিয়ে। একটি হলো চুয়াত্তরের ১৭ মার্চে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও এবং অন্যটি হলো পঁচাত্তরের ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান। দুটো ঘটনাই প্রমাণ করে, উদার গণতান্ত্রিক রাজনীতির ব্যাপারে জাসদের আগ্রহ ছিল না। একাত্তরে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর এ ধরনের রাজনীতির পুনরাবৃত্তির তেমন সুযোগ হয়তো ছিল না।

জাসদের নেতৃত্ব, বিশেষ করে সিরাজুল আলম খানের উত্থান ঘটেছিল ষাটের দশকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষকে জাতীয়তাবাদী ধারণায় উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে। এ ক্ষেত্রে তিনি নেতা হিসেবে পেয়েছিলেন শেখ মুজিবকে। যত দিন শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিল, তত দিন তাঁকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। বাহাত্তরে তাঁদের সম্পর্কে ফাটল ধরার পর থেকেই উভয়ের পায়ের তলা থেকে ধীরে ধীরে মাটি সরে যেতে থাকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রথাগত রাজনীতির বাইরে যেতে পারেননি। তাঁর সংগঠন আওয়ামী লীগের সেই প্রস্তুতি বা ক্ষমতা ছিল না। সিরাজুল আলম খানও বুঝতে অক্ষম ছিলেন, উনসত্তর কিংবা একাত্তরের আন্দোলনের মডেলের আর পুনরাবৃত্তি হবে না। ফলে, যা হওয়ার তা-ই হলো। তেমন কোনো সামাজিক উপযোগিতা না থাকা সত্ত্বেও অনেকটা জোর করে আন্দোলন তৈরির চেষ্টা হলো। ফলে রাজনীতিতে এল সর্বব্যাপী নৈরাজ্য। আদর্শবাদী তরুণদের একটা প্রজন্ম দ্রোহের দহনে দগ্ধ হলো এবং রাজনীতির চোরাগলিতে হারিয়ে গেল। এর দায় কে নেবে?

বাহাত্তর সালটা ছিল জাসদের উত্থানপর্ব, তেহাত্তর-চুয়াত্তরে ভরা যৌবন। পঁচাত্তরে ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই দলটি সংকটে পড়ে। কেননা, পরিপ্রেক্ষিত পাল্টে যায় পুরোপুরি। ছিয়াত্তর থেকে শুরু হয় ভাটার টান। একদিকে অস্তিত্বের সংকট, অন্যদিকে ভাঙনপর্ব।

দলে থেকে কিংবা দল বদল করে কারও কারও অবস্থার পরিবর্তন হয়। রাজনীতিতে তৈরি হয় নিত্যনতুন সমীকরণ। কেউ কেউ পাদপ্রদীপের

আলোয় চলে আসেন নানা প্রাপ্তিযোগের মাধ্যমে। অন্যদিকে অনেকেই পড়ে থাকেন অন্ধকারে। যাঁরা বিপ্লবের নেশায় এবং নেতাদের নির্দেশে 'বুর্জোয়া ডিগ্রি'র পেছনে না ঘুরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছেড়ে পথে বের হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই এখন ভবঘুরের মতো জীবন কাটাচ্ছেন। বীর ও শহীদের তালিকায় গুটিকয়েক তারকাখ্যাতিসম্পন্ন নেতার জায়গা হয়। পেছনে পড়ে থাকে সিদ্দিক মাস্টার, বাদল, রোকন, নিখিল, হাদী, কাইয়ুম, তপন, মন্টু, হেলাল এবং এমনতর অনেক তরুণের লাশ। তাঁদের জন্য কোনো জন্মদিন কিংবা মৃত্যুবার্ষিকী নেই, নেই কোনো স্মৃতির মিনার। এ প্রসঙ্গে লিও ট্রটস্কির *মাই লাইফ* গ্রন্থ থেকে একটা উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে: 'বিপ্লব হলো এক বিশাল পেটুক। গোগ্রাসে গিলে খায় মানুষকে এবং তার চরিত্রও। দুঃসাহসী মানুষকে নিয়ে যায় সর্বনাশের দিকে এবং ভীরুকে করে বরবাদ।'

রাজনৈতিক কৌশল ঠিক না ভুল, তাৎক্ষণিকভাবে তা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। একটা ঘটনা ঘটার বিশ-ত্রিশ বছর পর একজন বিশ্লেষক খুব সহজেই হয়তো বলে দিতে পারেন, এটা ঠিক ছিল কিংবা ওটা ভুল ছিল। ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষেরা কিন্তু বিষয়টা সেভাবে দেখেন না। অনেক সময় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ঘটনা ঘটানো যায় না।

এটা ঠিক যে, জাসদ অনেক ভুল করেছিল। মার্কিন রাষ্ট্রপতি থিয়োডর রুজভেল্ট বলেছেন, 'দ্য ওনলি ম্যান হু নেভার মেকস মিসটেকস ইজ দ্য ম্যান হু নেভার ডাজ অ্যানিথিং' (যে কিছুই করেনি, তার কখনো ভুল হয় না)। জাসদ ছিল সবচেয়ে সক্রিয় রাজনৈতিক দল, যাদের কিছুটা হলেও জনসম্পৃক্ততা ছিল। বিরোধীদলীয় অন্যরা মাঠে সক্রিয় ছিল না। এ জন্য তাদের ভুল করার তেমন সুযোগও ছিল না। জাসদকে একাই লড়ে যেতে হয়েছিল তার নিজস্ব মতাদর্শ নিয়ে।

রাজনীতিতে শুদ্ধতাবাদীরা 'জাসদ' নামটি শুনলেই নাক সিটকান। বাম রাজনীতিতে যাঁরা দীর্ঘদিন অবস্থান করেছেন, জাসদ তাঁদের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল। তার পরও জাসদ যুদ্ধ-পরবর্তী সবচেয়ে বড় ঘটনাটির অনুঘটক হতে পেরেছিল, যার প্রকাশ ঘটে পঁচাত্তরের ৭ নভেম্বর। জাসদ রাজনীতির জমিতে চাষ দিয়েছে, বীজ বুনেছে, মই দিয়েছে, কিন্তু ফসল তুলতে পারেনি। ফসল চলে গেছে অন্যের ঘরে। এটাকেই অনেকে জাসদের ব্যর্থতার উদাহরণ বলে মনে করেন।

জাসদে সংকট তৈরি হয়েছিল অন্য কারণেও। ষাটের দশকের গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী ধারার সঙ্গে পরবর্তী সময়ে এসইউসিআইয়ের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব এবং যুগপৎ সর্বহারা পার্টির সন্ত্রাসবাদী প্রবণতা এক মোহনায় মিশে গিয়েছিল। ত্রিমাত্রিক রাজনীতির এই মিশেল অদ্ভুত রকমের এক মনস্তত্ত্ব তৈরি করেছিল, যার শিকার হয়েছিল জাসদ নিজেই। জাসদের রাজনীতি যাঁরা শুরু করেছিলেন, নিয়ন্ত্রণটা শেষ পর্যন্ত তাঁদের হাতে আর থাকেনি। অনেকেই মনে করেন, জিয়া-খালেদের মধ্যকার ক্ষমতার লড়াইয়ে জিয়ার পক্ষ নিয়ে তাহের জাসদকে বলি দিয়েছেন। এর মূল্য শুধু জাসদ দেয়নি, দিতে হয়েছে সমগ্র জাতিকে।

পঁচাত্তরের নভেম্বরে রাজনীতিতে নতুন সামাজিক শক্তি হিসেবে সামরিক বাহিনীর আবির্ভাব ঘটে। এ জন্য অনেকে জাসদকে দায়ী করেন। যদি জাসদের জন্ম না হতো, তাহলে কী হতো? এই 'যদি' নিয়ে আলোচনা করলে তার খেই পাওয়া যাবে না। বাস্তবতা হলো, দেশে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, নতুন নতুন কুশীলবের আবির্ভাব ঘটেছে। ১০-১৫ বছর আগেও 'নাগরিক সমাজ' নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। এখন এটা বাস্তব।

শুদ্ধতাবাদীরা যেমন 'ব্লু-প্রিন্ট খোঁজেন', লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে সনাতনী ধাঁচের প্রপঞ্চ হাতড়ে বেড়ান, জাসদ সেখানে তাঁদের হতাশ করবে। কেননা, সবকিছু ঠিকঠাক করে, আটঘাট বেঁধে, ছক এঁটে তাঁরা রাজনীতির মাঠে নামেননি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নিজেদের বদলানোর চেষ্টা করেছেন, তৈরি করতে চেয়েছেন নিজেদের। তাঁদের একটা লক্ষ্য ছিল সুস্পষ্ট। পাকিস্তান থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া রাজনীতি, প্রশাসন, আইনকানুন—এসব ঝেড়ে-মুছে ফেলে দিতে হবে। তাঁরা পারেননি। তবে চাওয়াটাই বা কম কী?

জাসদকে মূল্য দিতে হয়েছে খুব বেশি। তাদের অনেক সদস্য ক্ষমতাসীন দলের লোকদের হাতে মারা পড়েছেন, নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর সদস্যদের হাতে খুন হয়েছেন, এমনকি একপর্যায়ে নিজ দলের অন্য সদস্যদের হাতেও নিহত হয়েছেন অনেকে। যখন রাজনীতি থাকে না, তখন দলের মধ্যে খুনখারাবি চলে। জাসদও এর ব্যতিক্রম নয়। কতজন নিহত হয়েছেন, তার হিসাব কেউ করে দেখেননি, এমনকি জাসদও করেনি। একটা খণ্ডিত হিসাবে দেখা গেছে, একমাত্র কুষ্টিয়া জেলাতেই নিহত হয়েছেন জাসদের পঞ্চাশের বেশি নেতা-কর্মী। এর শেষ বলি জাসদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কাজী আরেফ আহমেদ। ১৯৯৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি এক জনসভায় ভাষণ দিতে গেলে দলের এক অংশের হাতে কাজী আরেফ চারজন সঙ্গীসহ নির্মমভাবে নিহত হন।

এ দেশে নিহত ব্যক্তিদের কেউ কেউ তারকাখ্যাতি পেয়ে যান। কেননা, তাঁরা উঁচু পর্যায়ের নেতা, তাঁদের সামাজিক যোগাযোগ আছে এবং গণমাধ্যমে তাঁদের প্রচার বেশি। কিন্তু মাঠপর্যায়ে যাঁরা, তাঁরা চিরদিনের জন্য হারিয়ে যান, ইতিহাসে অনুল্লেখিতই থাকেন। এই প্রবণতা ডান-বাম-মধ্য সব শিবিরেই বিদ্যমান। অথচ তাঁরাই শ্রম, ঘাম, মেধা, সাহস ও রক্ত দিয়ে তৈরি করেন ইতিহাস।

রাজনীতির একটা পর্ব এখন গত হয়েছে। অপ্রকাশ্য বাম রাজনীতি এখন আর নেই। প্রকাশ্য বাম রাজনীতির নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি গোষ্ঠী এখনো পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের তত্ত্বের জাবর কেটে যাচ্ছে। সময় যে বদলে গেছে, পরিপ্রেক্ষিত যে পাল্টে গেছে, তা তারা বুঝতে অক্ষম। এ ছাড়া দলগুলোর মধ্যে নতুন নতুন সমীকরণ হচ্ছে। একদা যাঁরা পরস্পরের পরম শত্রু ছিলেন, তাঁদের অনেকেই এখন জোটবদ্ধ হচ্ছেন। এর পেছনেও আছে হাজারো যুক্তি। কে কোন পন্থী ছিলেন বা আছেন, তা এখানে গৌণ। মুখ্য বিষয় হলো রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়া। এর ওপর চড়ানো হয় আদর্শের চাদর। সে জন্যই সমীকরণ তৈরি হয়। ক্ষমতার রাজনীতিতে কে কাকে কতটুকু সফলতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারে, সেটাই মৌলিক প্রশ্ন। জাসদের 'ব্যর্থতা'র প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে এখানেই। তবু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। এত প্রাণ যে ঝরে গেল, তার কি কোনো প্রয়োজন ছিল? নাকি এটা ছিল অনিবার্য? হয়তো একদিন এর উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে। আর কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর হয়তো কোনো দিনই পাওয়া যাবে না।

পরিশিষ্ট ১

(স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের প্রচারপত্র)
জয় বাংলা

সাধারণ নির্বাচন অত্যাসন্ন।

এই নির্বাচন ক্ষমতা দখলের জন্য নয়, বরং বাংলার মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের একমাত্র পরীক্ষা। আর সে পরীক্ষার ভিত্তি হলো ঐতিহাসিক ৬ দফা ও ১১ দফা।

এই নির্বাচনকে গণভোট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। গণভোটের অর্থ কেবল ক্ষমতাসীন পরিষদের ৩০০ জনের মধ্যে ১৫০ জনের অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠতাই নয়, তার সঙ্গে সারা দেশের মোট ভোটের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতাও বটে। তাহলেই সে সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে জাতির পক্ষ থেকে রায় বলে গণ্য করা হবে। এ ক্ষেত্রে ছাত্রসমাজ তথা যুবসমাজের দায়িত্ব সবচেয়ে অধিক, কারণ আমাদের মতো অনুন্নত দেশে ছাত্ররাই সবচেয়ে বেশি প্রগতিবাদী ও সংগ্রামী। সে জন্যই সাধারণ মানুষের কাছে ছাত্ররা শ্রদ্ধার পাত্র।

প্রত্যেক ছাত্রকে নিজ দায়িত্বে অত্যন্ত স্পষ্ট ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে।

প্রত্যেক ছাত্রের কর্তব্য নিম্নরূপ :

ক. প্রত্যেককে নিজ নিজ থানা কার্যক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিতে হবে।

খ. সমকক্ষ একাধিক ছাত্র এক থানার অধিবাসী হলে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে একই থানায় কাজ করতে হবে।

গ. প্রতিটি সভা-সমিতি ও কর্মিসভায় যোগ দিয়ে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করতে হবে।

ঘ. কেবল বক্তৃতা বা বিবৃতির মধ্যে কাজকে সীমাবদ্ধ না রেখে আন্দোলন-উৎসাহী কর্মী সৃষ্টি করতে হবে।

ঙ. উৎসাহী কর্মীদের নিয়ে রীতিমতো রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা, আন্দোলনের গতিধারা আপসমূলক মনোভাব সৃষ্টির পরিবর্তে সংগ্রামী

মনোভাবের অনুপ্রেরণা, সর্বোপরি ভবিষ্যৎ আন্দোলন সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য থানাভিত্তিক ও গ্রামভিত্তিক কর্মীদের নিয়ে একটি সাংগঠনিক রূপ দিতে হবে। এই সংগঠন কেবল আন্দোলন পরিচালনার জন্যই গঠন করতে হবে।

চ. এই সংগঠন সর্বদা ঢাকা থেকে ঘোষিত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

এই সংগঠনের দায়িত্ব নিম্নরূপ

ক. ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক তৎপরতার দ্বারা আদর্শ ও আন্দোলনের প্রতি ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করবে।

খ. গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা, কৃষকদের সমস্যাভিত্তিক আলোচনা ও সমাধানের রূপরেখা নির্ধারণ করে এবং কৃষকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করবে।

গ. শ্রমিকদের মধ্যে অনুরূপভাবে আলোচনা করবে ও শ্রমিকদের সংগঠিত করবে।

ঘ. শিক্ষিত সমাজের মধ্যে, অর্থাৎ শিক্ষক, বিভিন্ন অফিসের কর্মচারী, উকিল-মোক্তারদের মধ্যেও রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা করবে।

ঙ. প্রতিটি স্কুলের কমপক্ষে একজন শিক্ষককে আদর্শে অনুপ্রাণিত করে সে অঞ্চলের দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে।

চ. বেকার যুবকদের সংগঠিত করতে হবে।

ছ. প্রয়োজনীয় প্রচারপত্র ও প্রাচীরপত্র বিলি করবে।

সংগঠন নিম্নরূপভাবে গড়তে হবে

ক. প্রতিটি থানায় ৫, ৭ বা ৯ সদস্যবিশিষ্ট যুবকদের নিয়ে কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটি সমগ্র থানার দায়িত্বভার পালন করবে।

খ. থানা কমিটির তত্ত্বাবধানে প্রতিটি ইউনিয়নে ৩, ৫ বা ৭ সদস্যের কমিটি গঠন করতে হবে।

গ. থানা ও ইউনিয়ন কমিটির তত্ত্বাবধানে প্রতিটি গ্রামে এক বা একাধিক যুবককে গ্রামের দায়িত্ব দিতে হবে।

ঘ. এই কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের, অর্থাৎ ৭ ডিসেম্বরের আগে অবশ্যই গঠিত হতে হবে।

ওপরে গঠিত কমিটির প্রতি নির্দেশ

ক. জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও যেকোনো কারণে ৬ দফা ও ১১ দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণীত না হলে বাঙালির মুক্তি আন্দোলনই হবে পরবর্তী কর্মসূচি এবং পশ্চিমা শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর সঙ্গে সেখানেই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু।

খ. সে সংগ্রাম নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও পরবর্তীকালে অসহযোগ, ট্যাক্স বন্ধ, পণ্য বর্জন ইত্যাদি আন্দোলনে পরিণত হবে এবং আরও পরে রক্ত দেওয়া ও রক্ত নেওয়ার পর্যায়ে উপনীত হবে। সে জন্য প্রত্যেককে মানসিক ও দৈহিক দিক থেকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

গ. ৬ দফা ও ১১ দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণীত হলেও বাংলা ও বাঙালির স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরূপভাবে এগিয়ে যেতে হবে।

ঘ. পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জিত না হলে বাংলা ও বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম ঘোষণা করা ছাড়া অন্য কোনো পথ থাকবে না।

কেন নির্বাচন চাই

ক. জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা প্রমাণ করতে হবে, বাংলার মানুষ একবাক্যে ৬ দফা ও ১১ দফার পক্ষে।

খ. সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও ৬ দফা ও ১১ দফা পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী স্বীকার না করলে দেশবাসী জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট হবে যে পশ্চিমারা বাঙালিকে গোলাম হিসেবে শাসন করতে চায় এবং দেশবাসী বুঝবে যে সে ক্ষেত্রে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামই একমাত্র খোলা পথ।

গ. বিশ্বের মানুষ ও বিদেশি রাষ্ট্রগুলো বুঝবে যে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় না মানার অর্থ বাংলার সাত কোটি মানুষকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখা। এবং সে ক্ষেত্রে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সমর্থনদান করতে বিদেশি রাষ্ট্রগুলো নীতিগতভাবে বাধ্য। বর্তমান বিশ্বে বিশ্বজনমতের সমর্থন ছাড়া মুক্তিসংগ্রাম প্রায় অসম্ভব।

ঘ. নির্বাচন অর্থ, জনমত অর্থ, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থ হলে অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করা যায়। এ ক্ষেত্রে অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি দেশবাসীর যে সমর্থন তা স্বপ্রমাণিত। আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে লিপ্ত, অর্থাৎ বাংলা ও বাঙালির সার্বিক মুক্তি আন্দোলন—এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল বক্তব্য চারটি :

১. বিশ্বের মানচিত্রে ৫৬ হাজার বর্গমাইলবিশিষ্ট একটি আবাসভূমির স্বীকৃতি।

২. সাত কোটি মানুষের বাঙালি জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা এবং বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশ।

৩. সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির রূপরেখা নির্ণয়।

৪. প্রতিটি মানুষের জাগ্রত গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

ওপরে বর্ণিত আদর্শ কর্মসূচি ও সংগঠন মোতাবেক সারা দেশে আগামী দিনের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে এবং এ দেশে বর্তমানে প্রতিটি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক সংগঠন, ছাত্রসংগঠন ও শ্রমিক সংগঠনের নির্দেশে আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে।

জাতীয় নেতার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, সর্বোপরি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রত্যেক কর্মীকে 'মুক্তিযোদ্ধা' হিসেবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে।

শত প্রতিবন্ধকতা, লোভ-লালসা, আত্মকলহ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করে এগিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে, 'জয় বাংলা' আমাদের ধ্যানধারণা, 'জয় বাংলা' কেবল একটি শ্লোগান নয়, 'জয় বাংলা' একটি আদর্শ। 'জয় বাংলা' আমাদের মূল উৎস। 'জয় বাংলা' আমাদের চলার পথের শেষ প্রান্ত। জয় বাংলা।

(অক্টোবর ১৯৭০)

পরিশিষ্ট ২

ইশতেহার নম্বর এক

জয় বাংলা

(স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচি)

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করা হয়েছে।

গত ২৩ বছরের শোষণ, কুশাসন ও নির্যাতন এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে যে, সাত কোটি বাঙালিকে গোলামে পরিণত করার জন্য বিদেশি পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র, তা থেকে বাঙালির মুক্তির একমাত্র পথ স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিক হয়ে বেঁচে থাকা। গত নির্বাচনের গণরায়কে বানচাল করে শেষবারের মতো বিদেশি পশ্চিমা শোষকেরা সে কথার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে প্রমাণ করেছে।

৫৪ হাজার ৫০৬ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকার সাত কোটি মানুষের জন্য আবাসিক ভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ রাষ্ট্রের নাম 'বাংলাদেশ'। স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

১. স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালি জাতি সৃষ্টি ও বাঙালির ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।
২. স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসনকল্পে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক শ্রমিকরাজ কায়েম করতে হবে।
৩. স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে ব্যক্তি, বাক্ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে।

বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে।

ক) বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, থানা, মহকুমা, শহর ও জেলায় 'স্বাধীনতাসংগ্রাম কমিটি' গঠন করতে হবে।

খ) সব শ্রেণির জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা ও তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

গ) শ্রমিক এলাকায় শ্রমিক ও গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সুসংগঠিত করে গ্রামে গ্রামে, এলাকায় এলাকায় 'মুক্তিবাহিনী' গঠন করতে হবে।

ঘ) হিন্দু-মুসলমান ও বাঙালি-অবাঙালি সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে।

ঙ) স্বাধীনতাসংগ্রামকে সুশৃঙ্খলতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এবং লুটতরাজসহ সব ধরনের সমাজবিরোধী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে। স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা নিম্নরূপ হবে।

অ) বর্তমান সরকারকে বিদেশি উপনিবেশবাদী শোষক সরকার গণ্য করে এ বিদেশি সরকারের ঘোষিত সব আইনকে বেআইনি বিবেচনা করতে হবে।

আ) তথাকথিত পাকিস্তানের স্বার্থের তল্পিবাহী পশ্চিমা অবাঙালি মিলিটারিকে বিদেশি ও হামলাকারী শত্রুসৈন্য হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং এ হামলাকারী শত্রুসৈন্যকে খতম করতে হবে।

ই) বর্তমান বিদেশি উপনিবেশবাদী শোষক সরকারকে সব ধরনের ট্যাক্স-খাজনা দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

ঈ) স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের ওপর আক্রমণরত যেকোনো শক্তিকে প্রতিরোধ, প্রতিহত, পাল্টা আক্রমণ ও খতম করার জন্য সব ধরনের সশস্ত্র প্রস্তুতি নিতে হবে।

উ) বৈজ্ঞানিক ও গণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সব ধরনের সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

ঊ) স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি...' সংগীতটি ব্যবহৃত হবে।

ঋ) শোষক রাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্তানি দ্রব্য বর্জন করতে হবে এবং সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

এ) উপনিবেশবাদী পাকিস্তানি পতাকা পুড়ে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ব্যবহার করতে হবে।

ঐ) স্বাধীনতাসংগ্রামে রত বীর সেনানীদের সব ধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে বাংলার স্বাধীনতাসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশের' সর্বাধিনায়ক। স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন আন্দোলনের এ পর্যায়ে নিম্নলিখিত জয়ধ্বনি ব্যবহৃত হবে—

স্বাধীন-সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' দীর্ঘজীবী হোক।
স্বাধীন কর স্বাধীন কর—বাংলাদেশ স্বাধীন কর।
স্বাধীন বাংলার মহান নেতা—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।
গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড়—মুক্তিবাহিনী গঠন কর।
বীর বাঙালি অস্ত্র ধর—বাংলাদেশ স্বাধীন কর।
মুক্তি যদি পেতে চাও—বাঙালিরা এক হও।

বাংলা ও বাঙালির জয় হোক
জয় বাংলা

স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ
(৩ মার্চ ১৯৭১)

পরিশিষ্ট ৩

সাধারণ নির্বাচন ১৯৭৩

দল	প্রার্থীর সংখ্যা*	প্রাপ্ত ভোট (%)**
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৯৯	৭৩.৬৬
ন্যাপ (মোজাফ্‌ফর)	২৩১	৮.২৯
জাসদ	২৩৪	৬.৪৪
ন্যাপ (ভাসানী)	১৬৩	৫.২০
স্বতন্ত্র	১১৮	৫.০০
বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	২০	০.৬০
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	৪	০.২৫
শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দল	৩	০.২০
লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি	২	০.১০
বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন	৩	০.০৯
বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস	১	০.০২
জাতীয় গণতন্ত্রী দল	১	০.০১

* একটি আসনে নির্বাচন স্থগিত ছিল

** দশমিকের পর দুই সংখ্যা রাখা হয়েছে। প্রাপ্ত ভোটের হিসাবে শুধু যেসব আসনে প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, সেই আসনগুলোর মোট ভোটারের শতাংশ হিসাবে দেখানো হয়েছে।

তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

পরিশিষ্ট ৪

বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার ১২ দফা দাবি

১. আমাদের বিপ্লব নেতা বদলানোর জন্য নয়। এই বিপ্লব গরিব স্বার্থের জন্য। এত দিন আমরা ছিলাম ধনীদের বাহিনী। ধনীরা তাদের স্বার্থে আমাদের ব্যবহার করেছে। ১৫ আগস্ট তার প্রমাণ। তাই এবার আমরা ধনীদের দ্বারা ধনীদের স্বার্থে অভ্যুত্থান করিনি। আমরা বিপ্লব করেছি। আমরা জনতার সঙ্গে এক হয়ে বিপ্লবে নেমেছি। আমরা জনতার সঙ্গে থাকতে চাই। আজ থেকে বাংলাদেশে সেনাবাহিনী হবে গরিবশ্রেণির স্বার্থরক্ষার একটি গণবাহিনী।

২. অবিলম্বে রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে।

৩. রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা না করে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না।

৪. অফিসার ও জওয়ানদের ভেদাভেদ দূর করতে হবে, অফিসারদের আলাদাভাবে নিযুক্ত না করে সামরিক শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুযায়ী নির্ণয় করতে হবে।

৫. অফিসার ও জওয়ানদের একই রেশন ও একই রকম থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. অফিসারদের জন্য আর্মির কোনো জওয়ানকে ব্যাটম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা চলবে না।

৭. মুক্তিযুদ্ধ, গত অভ্যুত্থান ও আজকের বিপ্লবে যেসব দেশপ্রেমিক ভাই শহীদ হয়েছেন, তাঁদের পরিবারের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. ব্রিটিশ আমলের আইনকানুন বদলাতে হবে।

৯. সব দুর্নীতিবাজের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে। বিদেশে যারা টাকা জমিয়েছে, তাদের টাকা বাংলাদেশে ফেরত আনতে হবে।

১০. যেসব সামরিক অফিসার ও জওয়ানকে বিদেশে পাঠানো হয়েছে, তাঁদের দেশে ফেরত আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. জওয়ানদের বেতন সপ্তম গ্রেড হতে হবে এবং ফ্যামিলি অ্যাকমডেশন ফ্রি হতে হবে।

১২. পাকিস্তান-ফেরত সামরিক বাহিনীর লোকদের ১৮ মাসের বেতন দিতে হবে।

নিবেদক
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিপ্লবী সৈনিকবৃন্দ
(নভেম্বর ১৯৭৫)

পরিশিষ্ট ৫

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ১৫ নভেম্বর ১৯৮১

প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট (%)
আবদুস সাত্তার	বিএনপি	৬৫.৫
কামাল হোসেন	আওয়ামী লীগ	২৬.০
মওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ	স্বতন্ত্র	১.৮
এম এ জি ওসমানী	স্বতন্ত্র	১.৪
এম এ জলিল	জাসদ	১.১
মোজাফ্‌ফর আহমদ	ন্যাপ	১.০
অন্যান্য ৩৩ জন	স্বতন্ত্র	৩.২

সূত্র : wikipedia.org

পরিশিষ্ট ৬
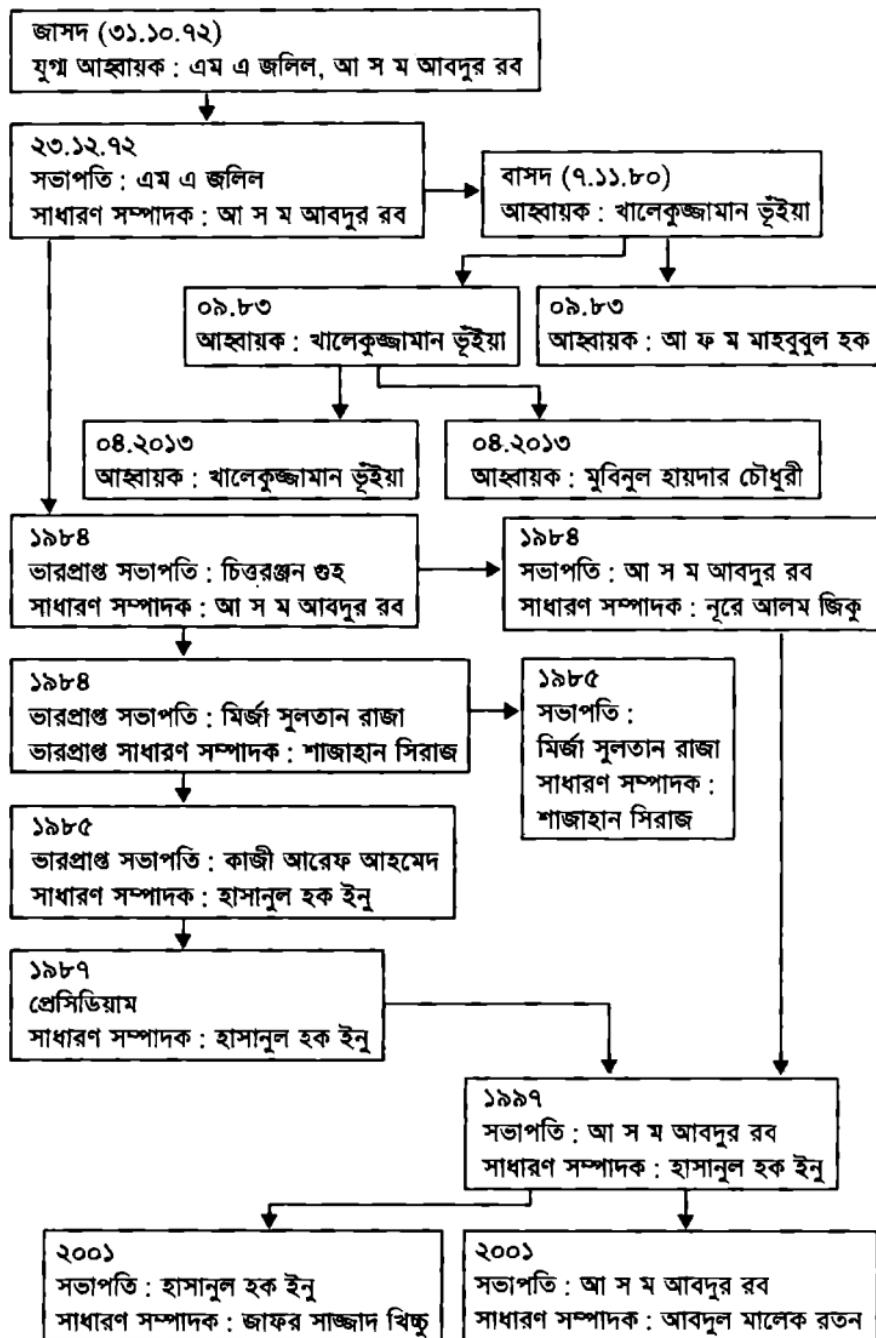
জাসদের ইতিহাস : পটভূমি, বিকাশ ও ভাঙন

১৯৬২	স্বাধীন বাংলার নিউক্লিয়াস গঠন
নভেম্বর ১৯৬৩	স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ গঠন
নভেম্বর ১৯৬৮	'বঙ্গবন্ধু' শব্দটির প্রথম ব্যবহার
১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯	'জয় বাংলা' স্লোগানের জন্ম
৬ জুন ১৯৭০	বাংলাদেশের পতাকা তৈরি
৭ জুন ১৯৭০	বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে প্রথম প্রকাশ্য র‍্যালি
অক্টোবর ১৯৭০	বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্সের (বিএলএফ) অনানুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু
২ মার্চ ১৯৭১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন
৩ মার্চ ১৯৭১	'স্বাধীনতার ইশতেহার' জনসমক্ষে উপস্থাপন
অক্টোবর ১৯৭১	বিএলএফের মুজিব বাহিনী নামকরণ
১৯-২২ মার্চ ১৯৭২	ছাত্রলীগের বর্ধিত সভায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটনের প্রত্যয় ঘোষণা
২১-২৩ জুলাই ১৯৭২	ছাত্রলীগের আনুষ্ঠানিক বিভক্তি, সমাজতন্ত্রপন্থী ছাত্রলীগের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু
৩১ অক্টোবর ১৯৭২	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা
২৩ ডিসেম্বর ১৯৭২	জাসদের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা
৭ মার্চ ১৯৭৩	জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাসদের অংশগ্রহণ
১১-১৩ মে ১৯৭৩	প্রথম জাতীয় কাউন্সিল
২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৩	জাসদের ২৯ দফা আন্দোলন-কর্মসূচি ঘোষণা
১৭ মার্চ ১৯৭৪	স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও, নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ, গোপন রাজনৈতিক কার্যক্রম ও বিপ্লবী গণবাহিনী গঠনের প্রক্রিয়া শুরু

মে ১৯৭৪	রাজনৈতিক থিসিস লেখার জন্য সমন্বয় কমিটি তৈরি
২৭ জুন ১৯৭৪	খসড়া থিসিস প্রকাশ
জুলাই ১৯৭৪	কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি বিলুপ্ত; প্রস্তাবিত বিপ্লবী পার্টির কেন্দ্রীয় ফোরাম গঠন
১০ অক্টোবর ১৯৭৪	জাতীয় কৃষক লীগের সমাজতান্ত্রিক কৃষি বিপ্লবের কর্মসূচি প্রকাশ
নভেম্বর ১৯৭৪	বিপ্লবী গণবাহিনীর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু
১৫ আগস্ট ১৯৭৫	সামরিক অভ্যুত্থানে সপরিবারে শেখ মুজিব নিহত
৭ নভেম্বর ১৯৭৫	সিপাহি অভ্যুত্থান
জানুয়ারি ১৯৭৬	কেন্দ্রীয় ফোরামের বিলুপ্তি, কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি গঠন; পরিমার্জিত খসড়া থিসিস প্রকাশ
২১ জুন ১৯৭৬	বিশেষ ট্রাইব্যুনালে 'রাষ্ট্র বনাম মেজর জলিল ও অন্যান্য' মামলার বিচার শুরু
১৭ জুলাই ১৯৭৬	বিচারে আবু তাহেরের ফাঁসি ও অন্য নেতাদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজার আদেশ
২১ জুলাই ১৯৭৬	আবু তাহেরের ফাঁসির রায় কার্যকর
২৬-৩১ অক্টোবর ১৯৭৬	কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সভায় বিপ্লবী পার্টি গঠন-প্রক্রিয়ার বিলুপ্তি ঘোষণা; গণসংগঠনগুলোর পুনর্গঠনের কাজ শুরু
নভেম্বর ১৯৭৮	বিভিন্ন স্থানে অস্ত্রসমর্পণের মধ্য দিয়ে গণবাহিনীর সদস্যদের প্রকাশ্য রাজনীতিতে ফিরে আসার প্রক্রিয়া শুরু
১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯	জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ফিরে আসা
৭ নভেম্বর ১৯৮০	ভাঙনপর্বের শুরু; বাসদের জন্ম

পরিশিষ্ট ৭

জাসদের বিবর্তন

বিভিন্ন সময়ে যাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা হয়েছে

অধীর কুমার বিশ্বাস : কুষ্টিয়া জেলা গণবাহিনীর সদস্য, কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক। আগস্ট ২০১৩

আফতাব উদ্দিন আহমদ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্য সেন হল ছাত্রলীগের নেতা, *গণকণ্ঠ* পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক, চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বরে অজ্ঞাতনামা আততায়ীর হাতে নিহত। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫

আকা ফজলুল হক : পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন ও পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। জানুয়ারি-আগস্ট ২০১৪

আ ফ ম মাহবুবুল হক : ছাত্রলীগের একসময়ের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি, বাসদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও এর একটি অংশের আহ্বায়ক। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫

আবদুল মতিন মিয়া : রাজবাড়ী জেলার গণবাহিনীর কমান্ডার, ১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাসদের টিকিটে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত। আগস্ট ২০১৩

আবদুল মজিদ (অব. করপোরাল) : বিমানবাহিনীর সাবেক সদস্য, মুক্তিযুদ্ধে ৯ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সংগঠক, ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়ার অভিযোগে দণ্ডিত। জুলাই-আগস্ট ২০১৩, আগস্ট ২০১৪

আবদুল বাতেন চৌধুরী : ছাত্রলীগ ও জাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য। বর্তমানে 'সামাজিক আন্দোলন'-এর যুগ্ম আহ্বায়ক। আগস্ট ২০১৩

আবদুর রাজ্জাক : ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সাংগঠনিক সম্পাদক, স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের সংগঠক। অক্টোবর ১৯৮৩

আবুল বারাকাত দুলাল : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণবাহিনীর কমান্ডার, ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সহসভাপতি এবং জাসদের প্রাক্তন অর্থবিষয়ক সম্পাদক। কমলনগর উপজেলার ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান। জুলাই-আগস্ট ২০১৩

আবুল হাসিব খান : ঢাকা নগর গণবাহিনীর সহকারী কমান্ডার, ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক। জুলাই-আগস্ট ২০১৩

আবু সাঈদ : কর্নেল তাহেরের অনুজ, পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির এক সময়ের সদস্য। সেপ্টেম্বর ২০১৩

আব্বাসউদ্দিন আফসারী : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র। মুহসীন হলে ৭ খুনের মামলায় দণ্ডিত। পরবর্তী সময়ে *ইত্তেফাক*-এ কাজ করেছেন। মে ২০০৩

আমানউল্লাহ: প্রবীণ সাংবাদিক, ইউপিআই, ভয়েস অব আমেরিকা এবং *ডেইলি টেলিগ্রাফ*-এর সংবাদদাতা ছিলেন। পরে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক এবং বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। জুলাই-আগস্ট ২০১৩

আ স ম আবদুর রব: ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, ডাকসুর প্রাক্তন সহসভাপতি, জাসদের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। বর্তমানে জেএসডির সভাপতি। আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৪

আহমদ ছফা: *গণকণ্ঠ*-এর প্রাক্তন সহকারী সম্পাদক, লেখক। অক্টোবর ১৯৮৪

আয়েশা পারুল: একদা গণবাহিনীর সদস্য, সাংস্কৃতিক কর্মী ও শিক্ষক। আগস্ট ২০১৩

এম এ করীম: বিএলএফ ও জাসদের সংগঠক। পরমাণু চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান। বর্তমানে জাসদের উপদেষ্টা। জুন-আগস্ট ২০১৪

কাজী আরেফ আহমেদ: স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের অন্যতম সদস্য, পরবর্তী সময়ে *গণকণ্ঠ*-এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক এবং ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির সংগঠক। জাসদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। অক্টোবর ১৯৮৩, জুন ১৯৮৪

কামরুল আলম খান খসরু: একসময়ের 'মিস্টার ইস্ট পাকিস্তান' এবং কুস্তিগীর। ষাটের দশকে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শেখ মুজিব ও ছাত্রলীগের নেতাদের সুরক্ষা দেওয়ার কাজে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। বিএলএফের একটি দলের দলনেতা। মে ২০১৪

কামাল উদ্দিন আহমেদ: তিতুমীর কলেজ ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সহসভাপতি। বর্তমানে ব্যবসায়ী। জুলাই-আগস্ট ২০১৩

খায়ের এজাজ মাসুদ: জাসদের পার্টি ফোরামের ইমার্জেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য। বর্তমানে আইন পেশায় যুক্ত। ফেব্রুয়ারি ২০১৪

খোদা বখশ চৌধুরী: মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্রলীগ কর্মী। পরবর্তীকালে পুলিশের মহাপরিদর্শক। অক্টোবর ২০১৩

খন্দকার আবদুল মালেক: প্রাক্তন গণপরিষদ সদস্য, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য, জাতীয় কৃষক লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। জুন ২০১২

গোলাম মহিউদ্দিন খান: ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন) সংগঠক। সাংবাদিকতা করেন। একসময় দৈনিক *জনপদের* সহকারী সম্পাদক ছিলেন। সেপ্টেম্বর ২০১৪

নঈম জাহাঙ্গীর: ছাত্রনেতা, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক। ডিসেম্বর ২০১৩

ফজলুর রহমান বাবুল : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের কর্মী। বর্তমানে ক্রীড়া সংগঠক। আগস্ট ২০১৩

বদিউল আলম : ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাংগঠনিক সম্পাদক। বর্তমানে সাংবাদিকতা করেন। ডিসেম্বর ২০০৫, এপ্রিল ২০১৪

বাদল খান : ঢাকা নগর গণবাহিনীর অন্যতম সংগঠক। ছাত্রলীগ ও জাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় শ্রমিক জোটের সাধারণ সম্পাদক। জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৩

বাহাউদ্দিন চৌধুরী : বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন তথ্যসচিব। একসময় *গণকণ্ঠ* পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন (১৯৮০-৮১)। সেপ্টেম্বর ১৯৮০

মাঈনউদ্দিন খান বাদল : চট্টগ্রাম জেলা গণবাহিনীর কমান্ডার, গণবাহিনীর সংগঠক, জাসদের কার্যকরী সভাপতি, বর্তমানে জাতীয় সংসদ সদস্য। ২০০৫, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৪

মাহবুবুর রহমান : বিএলএফের সদস্য। ঢাকা বেতারে অনুষ্ঠান প্রযোজকের দায়িত্ব পালন করেছেন। সেপ্টেম্বর ২০১৪

মনিরুল ইসলাম : ছাত্রলীগের প্রাক্তন সহসভাপতি, বিএলএফের সংগঠক। পরবর্তী সময়ে গণবাহিনীর কেন্দ্রীয় ফোরামের সদস্য। জাতীয় শ্রমিক জোটের সভাপতি ছিলেন। 'মার্শাল' নামে পরিচিত। জুলাই-আগস্ট ২০১৩, মে-জুন ২০১৪

মুন্সি ফারুক আহমেদ : কুমিল্লার ছাত্রলীগের কর্মী, পশ্চিম জার্মানিতে ছিলেন ১৯৭৯-৮৪ সাল পর্যন্ত। বর্তমানে ব্যবসায়ী। মার্চ ২০১৪

মুবিনুল হায়দার চৌধুরী : ভারতের এসইউসিআইয়ের সদস্য ছিলেন। ১৯৭২ সাল থেকে জাসদের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৮০ সালে বাসদে যোগ দেন। অক্টোবর ১৯৮৩

মুহাম্মদ হিলাল উদ্দিন : ছাত্র ইউনিয়ন ও যুব ইউনিয়নের ভূতপূর্ব সংগঠক, ছাত্র ইউনিয়ন, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি সদস্যদের জন্য আয়োজিত সামরিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী। জানুয়ারি ২০১৪

মোশতাক আহমেদ : ছাত্রলীগ ও গণবাহিনীর সংগঠক। বর্তমানে গণফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক। আগস্ট ২০১৪

মোহাম্মদ আবদুল হামিদ : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছাত্রলীগ ও জাসদের সংগঠক। ডিসেম্বর ২০১৩

মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্য সেন হলের আবাসিক ছাত্র ও ছাত্রলীগ নেতা। পরে এম এ আউয়ালের নেতৃত্বে জাসদ নিবন্ধনের জন্য যে আবেদন করেছিল, তিনি এর আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ছিলেন। দলে তিনি 'লড়াই শফিক' নামে পরিচিত ছিলেন। আগস্ট ২০১২

মোস্তফা মহসীন মন্টু : ছাত্রলীগের একসময়ের সংগঠক, বিএলএফের একটি দলের অধিনায়ক। বর্তমানে গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক। এপ্রিল ২০১৩

মোস্তফা সরোয়ার বাদল : একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের লেকচারার ছিলেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব নিউ অর্লিন্সে জিওফিজিকস, আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সের অধ্যাপক। আগস্ট ২০১৪

রায়হান ফেরদৌস মধু : ১৯৭০-৭১ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সেক্রেটারি আমিনুল হক বাদশার সহকারী ছিলেন। ছাত্রলীগ ও জাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য। দৈনিক *গণকণ্ঠ*-এর প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। সেপ্টেম্বর ২০১৪

রফিকুল ইসলাম : ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য, গণবাহিনীর ঢাকা নগর শাখার রাজনৈতিক কমিসার, জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য। এপ্রিল ২০০৯, আগস্ট ২০১৪

রেজাউল হক মোশতাক : ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের প্রাক্তন দপ্তর সম্পাদক। বর্তমানে ব্যবসায়ী। অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৩

শমশের আলম নশু : ছাত্রলীগ ও গণবাহিনীর প্রাক্তন সংগঠক। মার্চ ২০১৪

শাজাহান সিরাজ : ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, জাসদের প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক এবং পরে সভাপতি। পরে বিএনপিতে যোগ দেন এবং পরিবেশ ও বনমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ২১ মে ২০১১

শরীফ নুরুল আম্বিয়া : ছাত্রলীগের প্রাক্তন সভাপতি। বর্তমানে জাসদের সাধারণ সম্পাদক। জানুয়ারি-জুলাই ২০১৪

সিরাজুল আলম খান : স্বাধীনতার নিউক্লিয়াসের উদ্যোক্তা, ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক (১৯৬৩-৬৫), বিএলএফের প্রধান সংগঠক। জাসদের প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে লেখালেখি করেন। নভেম্বর ২০১৩-মে ২০১৪

সুভাষচন্দ্র সাহা : ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও জাতীয় শ্রমিক লীগের ঢাকা নগর কমিটির প্রাক্তন সভাপতি এবং জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন তথ্য ও গণযোগাযোগ সম্পাদক। বর্তমানে সাংবাদিকতা করেন। আগস্ট ২০১৩

সৈয়দ বাহারুল হাসান সবুজ : ঢাকা নগর গণবাহিনীর সদস্য, ১৯৭৫ সালে ভারতীয় হাইকমিশনে অভিযানে অংশ নিতে গিয়ে আহত হন। বর্তমানে একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। আগস্ট ২০১৩

সৈয়দ রফিকুল ইসলাম (অব. সার্জেন্ট, বীর প্রতীক) : বিমানবাহিনীর প্রাক্তন সদস্য। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সংগঠক। বর্তমানে জাসদের উপদেষ্টা। জুলাই-আগস্ট ২০১৩, সেপ্টেম্বর ২০১৪

হাবিবুল্লাহ চৌধুরী : জাসদের প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির কৃষি সম্পাদক। ডিসেম্বর ২০১৩, জুন ২০১৪

গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র

আকন্দ, মো. আবদুল গনি (২০১৪), *স্মৃতি সতত বিরাজে*। পড়ুয়া, ঢাকা।

আরিফ, রইসউদ্দিন (২০১০), *বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিকথা,* পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

আলী, সৈয়দ মোদাচ্ছের (১৯৯১), *স্মৃতিতে অম্লান ষাট দশকের ছাত্ররাজনীতি,* নাজমুন্নেছা পাবলিকেশনস, ঢাকা।

আহমদ, আবুল মনসুর (২০০২), *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,* খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা।

আহমদ, মওদুদ (২০১০), *চলমান ইতিহাস—জীবনের কিছু সময় কিছু কথা,* ইউপিএল, ঢাকা।

আহমদ, মহিউদ্দিন (২০০৬), *এই দেশে একদিন যুদ্ধ হয়েছিল,* গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ঢাকা।

আহমদ, মহিউদ্দিন সম্পাদিত (২০০৬), *আমাদের একাত্তর,* গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ঢাকা।

আহমেদ, কাজী আরেফ (২০১৪), *বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র,* ইন্টারন্যাশনাল হিস্টোরিক্যাল নেটওয়ার্ক, ঢাকা।

ইসলাম, মনিরুল (২০১৩), *জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সমাজতন্ত্র,* জ্যা পাবলিকেশনস, ঢাকা।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৭৪), সম্পাদক, *সংস্কৃতি,* ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা।

করিম, নেহাল ও অন্যান্য সম্পাদিত (২০০১), *আহমদ শরীফের ডায়েরি : ভাব-বুদ্বুদ,* জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা।

কেন্দ্রীয় ফোরাম (১৯৭৪), 'গণ-আন্দোলনকে কীভাবে বিপ্লবী আন্দোলনে উন্নীত করা হবে', জুন ১৯৭৪।

খসড়া থিসিস—পরিমার্জিত (১৯৭৬)।

চৌধুরী, মিজানুর রহমান (২০০১), *রাজনীতির তিনকাল,* হাফেজ মাহমুদা ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

চৌধুরী, মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন (অব.), *এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য—স্বাধীনতার প্রথম দশক,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

ছফা, আহমদ (১৯৮৮), *যদ্যপি আমার গুরু*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (১৯৭২) কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির বক্তব্য, ২৩ ডিসেম্বর ১৯৭২।
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (১৯৭৩), ঘোষণাপত্র, ১৪ জানুয়ারি ১৯৭৩।
জলিল, মেজর (অব.) এম এ (১৯৮৩), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের জাতীয় কমিটির সদস্যদের প্রতি, প্রচারপত্র।
জাতীয় কৃষক লীগ (১৯৭৪), সমাজতান্ত্রিক কৃষি বিপ্লবের কর্মসূচি।
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (১৯৭৩), *মশাল*, বুলেটিন নম্বর ১, ৩১ অক্টোবর ১৯৭৩।
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (১৯৭৪), ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলনের ভিত্তি ও কর্মসূচি।
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, সমন্বয় কমিটির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (১৯৮১), বিশেষ জাতীয় কাউন্সিল—সভাপতির ভাষণ, ২৮-২৯ জুন ১৯৮১।
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (১৯৮১), ঘোষণাপত্র (প্রস্তাবিত)।
বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (১৯৭২), সাধারণ সভা ও বর্ধিত সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী প্রস্তাবাবলি, ৫-৭ এবং ১৯-২৩ মার্চ, ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি, ঢাকা।
বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (১৯৭২), সাধারণ সম্পাদকের কার্যবিবরণী, ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি, ঢাকা।
বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (১৯৭৩), বার্ষিক কার্যবিবরণী ১৯৭২-৭৩, ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি।
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (১৯৮০), ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারিতে তৃতীয় কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক রিপোর্ট।
বিটু, ইজাজ আহমেদ (২০১৩), *হতভাগা জনগণ—প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, রাঢ়বঙ্গ, রাজশাহী।
বেগম, সাহিদা (২০০০), *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা—প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
মিয়া, এম এ ওয়াজেদ (১৯৯৩), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ*, ইউপিএল, ঢাকা।
মোশাররফ, খালেদ (২০১৩), *মুক্তিযুদ্ধে ২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্স*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।
রহমান, আখলাকুর (১৯৭৪), *বাংলাদেশের কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ*, ঢাকা।
রহমান, নায়েব সুবেদার মাহবুবুর (তারিখ নেই), *সৈনিকের হাতে কলম*, সংলাপ, জার্মানি।
রহমান, ড. সাঈদ-উর (২০০৪), *১৯৭২-১৯৭৫ কয়েকটি দলিল*, মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা।
সাম্যবাদ—বিপ্লবীদের মুখপত্র, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৭৪।

সাম্যবাদ—বিপ্লবীদের মুখপত্র, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৭৬।

হাবিব, খালেদা (১৯৯১), *বাংলাদেশ : নির্বাচন, জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিসভা*, ঢাকা।

হামিদ, লে. কর্নেল এম এ (২০১৩), *তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা।

হোসেন, ড. মো. আনোয়ার (২০১১), *তাহেরের স্বপ্ন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

Ahmed, Aftab Uddin (1983), *The Mujib Regime in Bangladesh 1972-75; An Analysis of its problems and performance*, PhD thesis submitted to Institute of Commonwealth Studies, University of London, October 1983.

Arens, Venneke and Benden, Jos Van (1980), *Jhagrapur: Poor Peasants and Women in a Village in Bangladesh,* Orient Longman, New Delhi.

Blood, Archer K. (2006), *The cruel Birth of Bangladesh–Memoirs of an American Diplomat*. UPL, Dhaka.

Chowdhury, G. W (1994). *The Last Days of United Pakistan*. UPL, Dhaka.

Gandhi, Indira (1972), *India and Bangladesh Selected Speeches and Statements: March to December 1971*, Orient Longman, New Delhi.

Karim, S.A. (2004). *Sheikh Mujib–Triumph and Tragedy*. UPL, Dhaka.

Khasru, B. Z. (2014). *The Bangladesh Military Coup and the CIA Link*, Rupa Publication India Pvt. Ltd., New Delhi.

Lenin, V.I. (1964), *Collected Works*, Vol 26. Moscow.

Lenin, V.I. (1964), *Collected Works*, Vol. 8. Moscow.

Milam, William B (2009), *Bangladesh and Pakistan–Flirting with Failure in South Asia*, Hurst Publishers Ltd., London.

Lifschultz, Lawrence (1979), *Bangladesh: The unfinished Revolution*, Zed Press, London.

Raina, Asoka (1981), *Inside RAW–The story of India's Secret Service*, Vikas Publishing House, New Delhi.

Sen, Amartya (1981), *Poverty and Famine: Eassqy on Entittlements and Deprivation*, Clarenton Press, Oxford.

জাসদ একসময় বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঝড়
তুলেছিল। ইতিহাসের এই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সময়ের অন্তরঙ্গ
বর্ণনা পাওয়া যাবে মহিউদ্দিন আহমদের এ বইয়ে।
এখানে আছে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন,
মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তী সময়ের উথালপাতাল
রাজনীতির বিস্তার : পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ড,
অভ্যুত্থান, পাল্টা-অভ্যুত্থান, জাসদের ভেঙে যাওয়া;
আছে বিপ্লব, সন্ত্রাস ও স্বপ্নভঙ্গের কথা। এ বইয়ে
ইতিহাসের একটি অজানা পর্ব প্রথমবারের
মতো উন্মোচিত হলো ।